পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা

সম্পাদনায়
সেলিনা হোসেন | সালমা আখতার | মাসুদুজ্জামান

পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা

www.pathagar.com

পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা

সম্পাদনা
সেলিনা হোসেন
সালমা আখতার
মাসুদুজ্জামান

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

জেন্ডার গ্রন্থমালা ৪
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

গবেষণা ও পরিকল্পনা
ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন

গবেষণা সহকারী
সাঈদ মঈনুদ্দিন

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 570 6

PURUSHTANTRO NARI O SHIKKHA : (Patriarchy, Women and Education) Compliled by Selina Hossain, Salma Akhtar & Masuduzzaman, Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Three Hundred only. US $ 9.95

www.pathagar.com

উৎসর্গ

লীলা রায়
যিনি আলো জ্বালেন
তিনি আলো হয়ে থাকেন

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত জেন্ডার বিষয়ক গ্রন্থ

নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন ২০০৩
বাংলাদেশের নারী ও সমাজ ২০০৪
জেন্ডার বিশ্বকোষ ২০০৬
জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ২০০৭
সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর ২০০৭
জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি ২০০৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা আমাদের পরিকল্পিত জেন্ডার গ্রন্থমালার চতুর্থ সংকলন। এই সিরিজের প্রথম সংকলনটির শিরোনাম ছিল নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন, দ্বিতীয়টির বাংলাদেশের নারী ও সমাজ। প্রথম সংকলনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিসর সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংকলনে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে নারীকে 'নরেতর' বা 'মেয়েলি' করে তুলে তাকে 'অন্য' বা 'প্রান্তিক' করে ফেলে, সংকলটি ছিল সেই লক্ষ্যে প্রণীত। তৃতীয় সংকলনে আলোকপাত করা হয়েছে নারী ও শিক্ষার উপর। বলাবাহুল্য, শিক্ষা যাদুর কাঠি না হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে যে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে তা আজ সর্বজনবিদিত। মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা আজ স্বীকৃত। কিন্তু এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের শিকার। শিক্ষার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থা বোঝার লক্ষ্যেই জেন্ডার গ্রন্থমালার অংশ হিসেবে এই সংকলনটি প্রণীত হয়েছে।

বিষয়ের দিক থেকে সংকলনটিতে মূলত চার ধরনের লেখা স্থান পেয়েছে। প্রাথমিকভাবে এতে সংকলিত প্রবন্ধগুলো শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতির দিক থেকে লেখা। শিক্ষাদর্শন, বলাবাহুল্য, শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষানীতির সঙ্গেই এর গভীর সম্পর্ক। শিক্ষাদর্শনের আলোকেই প্রণীত হয় শিক্ষানীতি। এই সংকলনের দ্বিতীয় ভাগে তাই শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দার্শনিক উৎস সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো সংকলনের পর এতে সেইসব প্রবন্ধই সংকলিত হয়েছে যেসব প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে শিক্ষানীতি। শিক্ষাকমিশনের প্রতিবেদনগুলোরও মূল বিষয় এটাই। নারীশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে এই প্রতিবেদনগুলো কী ভূমিকা রেখেছে, এই অংশের প্রবন্ধগুলোতে রয়েছে তার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ। সংকলনের তৃতীয় ভাগে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কী অবদান রাখে, আদৌ তা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে ওঠে কিনা, নারীর প্রতি বৈষম্যের হার ও মাত্রা কেমন—এসব দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন বিভিন্ন

www.pathagar.com

প্রাবন্ধিক তাদের প্রবন্ধে। প্রবন্ধগুলোতে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার প্রসারে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশ্লেষিত হয়েছে।

শিক্ষার প্রেক্ষাপটে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, সিডো, হাজার বছরের অভিলক্ষ্য (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল), দারিদ্র্যহ্রাস কৌশলপত্র, জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ সংবিধানের প্রেক্ষাপটে নারীশিক্ষার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। নারী শিক্ষার বিকাশ, প্রসার ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে নারীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরে বাংলাদেশের বাজেট ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিকগুলোও বিশ্লেষিত হয়েছে।

দেখা যায়, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রয়াসের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নারী সাক্ষরতার অবস্থা বর্ণনা করা হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। বর্তমান সংকলনে নারীশিক্ষার এই দিকটির উপরও গুরুত্বারোপ করে নারী অধস্তনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাবন্ধিকেরা লক্ষ করেছেন, অন্যান্য বৈষম্যের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলাদেশের নারীরা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এখনও তা চলছে। সামাজিক ও পারিবারিক অনাগ্রহ আর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাবেই বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তবে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে যতটা পিছিয়ে ছিল, এখন আর তা নেই। স্বাধীনতার পর থেকেই ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ থেকে বাস্তবায়নের স্তর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীপ্রগতির অংশ হিসেবে নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নারীরাও আত্মসচেতন হওয়ার ফলে শিক্ষাগ্রহণে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এই অগ্রগতি প্রয়োজনের তুলনায় এখনও অপ্রতুল। এক্ষেত্রে পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তাই আরও সুপরিকল্পিত ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। এসব উদ্যোগ পূর্বের তুলনায় যদিও বেড়েছে, তবু নারীশিক্ষার হার আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী এখনও পুরুষতন্ত্রের শিকার। নারীর জীবন থেকে গেছে পুরুষের অধস্তন, তার জীবন-পরিসরও তেমন একটা বাড়েনি। নারী বৈষম্যের শিকার হয়ে ক্ষতায়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। সংকলিত প্রবন্ধগুলো থেকে পাঠকেরা এসব বিষয়েই গভীরভাবে জানতে পারবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। জেন্ডারবান্ধব করার ক্ষেত্রে এই সংকলন কিছুটা ভূমিকা পালন করলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে আমরা মনে করি।

জেন্ডার সম্পর্কিত এই ধরনের সংকলন বিষয়ের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা খুব সহজ নয়। কিন্তু প্রাবন্ধিকেরা যেভাবে আমাদের প্রতি তাদের বৌদ্ধিক সহায়তার হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন, সেজন্যে আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে পাঠকদের সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়াই জেন্ডার গ্রন্থমালা প্রকাশের প্রধান প্রেরণা। তাদের সুচিন্তিত মতামত আর লেখকদের সহযোগিতা পেলে আমাদের পরবর্তী সংকলনগুলো আরও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সেলিনা হোসেন
সালমা আখতার
মাসুদুজ্জামান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ক

শহিদুল ইসলাম : বাংলাদেশে নারী শিক্ষার পশ্চাদভূমি ১১
শরিফা খাতুন : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীশিক্ষার স্থান : সমকালীন প্রেক্ষাপট ৩৩
আবদুল মালেক : বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম ৪৪
নুসরাত সুলতানা : বেগম রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন : স্বরূপসন্ধান ৬২

খ

মাসুদুল হক : পাকিস্তান শিক্ষা কমিশনে নারীশিক্ষা ৭৮
সেলিনা হোসেন : বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনে নারীশিক্ষা ৯০

গ

মোঃ আবুল বাশার : শিক্ষাক্ষেত্রে পারিবারিক বিনিয়োগ ও লিঙ্গবৈষম্য ১০৮
অজয় রায় : নারী শিক্ষায় উন্নয়ন : আমরা কি লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট তৈরি করব? ১২৩
প্রতিমা পাল-মজুমদার : বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন ১৪৭
সালমা আখতার : শিক্ষা পরিকল্পনা ও নারী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ১৬৯
কামরুন্নেসা বেগম : সাক্ষরতা ও নারী ১৭৪

ঘ

আবুল মোমেন : বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা পটভূমি, বর্তমান চিত্র ও নারীর অবস্থান ১৮৪
শফি আহমেদ : নারীশিক্ষা উপবৃত্তি নারীমুক্তি ২১৪
মাসুদুজ্জামান : বাংলাদেশে নারীশিক্ষা : মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে একটি সমীক্ষণ ২২৩
রীতা ভৌমিক : বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় নারী ২৪১
মানিক মাহমুদ : স্বশিক্ষায় নারীর ভূমিকা ২৫৬
সাইদুস সাকলায়েন : মেয়েদের স্কুলযাত্রা ও ঝরে পড়া ২৬৭
সাইফুজ্জামান রানা শিক্ষা সম্প্রসারণে নারীর শক্তি : কাজলী মডেলের অভিজ্ঞতা ২৭৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার পশ্চাদভূমি

শহিদুল ইসলাম

একথা ঠিক যে, এদেশে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার আন্দোলন-প্রচলনের সঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা চালু না হলে নারীশিক্ষার বিষয়টি এদেশের সমাজপতিদের মাথায় আসত না। আরো একটু গভীরে দৃষ্টি দিলে অর্থাৎ অর্থনীতির মূল অবকাঠামোর দিকে মনোযোগ দিলে বোঝা যায় যে, আসলে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মূলগত পরিবর্তনই এদেশে যুগপৎ আধুনিক বুর্জোয়া শিক্ষা ও নারীশিক্ষার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। দীর্ঘদিনের সামন্তবাদী অর্থনীতি যদি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পরিবর্তিত না হত, তাহলে আধুনিক বুর্জোয়া শিক্ষা এবং নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হত না। কাজেই শেষ বিচারে সামন্তবাদী অর্থনীতির ধ্বংস এবং এক ধরনের পুঁজিবাদের প্রচলনই এদেশে আধুনিক শিক্ষার অবকাঠামোটি গড়ে তোলে। তারই অংশ হিসেবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য নানা জন ও নানা সংস্থা বিভিন্নভাবে নারীশিক্ষা বিস্তারে ভাবনাচিন্তা শুরু করে এবং নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এদেশে নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হয়, একথা ঠিক।

কিন্তু তাই বলে একথা ঠিক নয় যে, এদেশে আধুনিক বুর্জোয়া শিক্ষা কাঠামো প্রচলনের জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা একটি অপরিহার্য শর্ত ছিল। আরো একটু গভীরে তাকালে ও বিশ্লেষণ করলে এটাও সত্য বলে মনে হবে না যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন স্থাপিত না হলে এদেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোটি গড়ে উঠত না; বরং সত্য এটাই যে, ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনের জন্যই এদেশে স্বাধীনভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারেনি; তার পরিবর্তে এক পরনির্ভরশীল বিকৃত পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে। সেই বিকৃত পুঁজিবাদের পক্ষপুটে এদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এটাই স্বাভাবিক যে, তার সবগুলোই বিকৃতির শিকারে পরিণত হবে। যেমন জমির মালিকানা, শিক্ষা, আইন, প্রশাসন ইত্যাদি—আমরা যাদের আগে

www.pathagar.com

'ঔপনিবেশিক' বিশেষণটি প্রয়োগ করে থাকি। কাজেই ব্রিটিশরা না এলে এদেশে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা হত না, এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা না হলে এদেশে আধুনিক শিক্ষা ও সেইসঙ্গে নারীশিক্ষার অবকাঠামোটি গড়ে উঠত না, এটা অবশ্য ঠিক। বলা চলে, যদি ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা না হত, তাহলে এদেশে স্বাধীনভাবে এক স্বাস্থ্যবন্ত পুঁজিবাদ এবং তার শাখা প্রশাখা হিসেবে জমির মালিকানা, শিক্ষা, আইন ও প্রশাসন গড়ে উঠত, যার লক্ষণ মোগল আমলের শেষের দিকে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[১]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে ১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মোঘলরা বাংলা জয় করে। কিন্তু সতের শতকের শেষ দিকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে মোঘল শক্তির দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন বাংলার জমিদার-ভূস্বামী শ্রেণী মোঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পুরো আঠার শতক জুড়ে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস এক অস্থিরতার যুগ। রাজনৈতিক পালাবদলের সব চিহ্ন ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রান্তিকালের সেই অস্থিরতা ও রাজনৈতিক হানাহানির সুযোগ গ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে মীরজাফর, ঘসেটি বেগম, জগৎশেঠ প্রমুখের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে বাংলা জয় করে। এই ইতিহাস মোটামুটি সবারই জানা। কিন্তু প্রাক ঔপনিবেশিক আমলেই বাংলা তথা ভারতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অবকাঠামোর চিহ্ন লক্ষ্য করা গেছে।[২] তাই বলছিলাম, ব্রিটিশরা যদি এদেশ দখল না করত তাহলে ভারতবর্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিজস্ব ধাঁচের এক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠার সব রকমের সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। বিকৃতিহীন আধুনিক ভারতীয় বুর্জোয়া সভ্যতা গড়ে ওঠার পথ খোলা ছিল বৈকি। তাহলে বিকৃত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা, আইন, প্রশাসন তৈরি হতে পারত না। পুঁজিবাদ আজ বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। ইচ্ছা করলেই কোন দেশ আজ আর একে অস্বীকার করতে পারে না। আগে-পিছে আমাদের দেশেও পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারতো। মাঝখানে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি ঢুকে পড়ে দেশীয় পুঁজিতন্ত্রের উত্থানকে বিপর্যস্ত করেছে এবং এক বিকৃত পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে।

ভূমিকায় এ ক'টি কথা বললাম এজন্যে যে, নইলে পাঠকের মনে হতে পারে যে, ইংরেজরাই এদেশে আধুনিক শিক্ষার বীজটি রোপণ করেছে, তারা না এলে ঐ কাজটি সম্ভব হত না। হ্যাঁ, এ কথা সত্যি যে, আধুনিক শিক্ষার সিদ্ধান্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা তারাই গ্রহণ করেছিল। তার কারণ আর কিছুই নয়, কারণ তারাই ১৯০ বছর এদেশ শাসন ও শোষণ করেছে। নিজেদের সেই শাসন-শোষণ নিষ্কণ্টক করার জন্য আরো অনেক পদক্ষেপের সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কেও তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

এদেশে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতি চালুর সঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধর্মশাসিত সামন্তবাদী মধ্যযুগে নারীশিক্ষা ছিল নিষিদ্ধ। বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনিশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত নারীশিক্ষার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি

www.pathagar.com

ছিল।[৩] উনিশ শতক বাংলা তথা ভারতবর্ষের জন্য এক ব্যতিক্রমী শতক। এই শতকে হাজার বছরের পুরনো সামন্ত অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং ইংরেজ শাসকদের হাত ধরে সে-ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। সে-সময় ধ্বংসোন্মুখ সামন্ত অর্থনীতির তুলনায় পুঁজিবাদ ছিল একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো। সেই প্রগতিশীল অর্থনীতির ভিত্তির ওপরেই ইংরেজের ঔপনিবেশিক তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে শিক্ষার বর্তমান কাঠামোটি। কিন্তু তখনও সে-প্রচেষ্টাকে এদেশের রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বাধা অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হয়েছিল। বিশেষ করে নারীশিক্ষার বিষয়টিতে।

আগে এদেশে প্রচলিত ছিল টোল-চতুষ্পাঠীভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা। সংস্কৃত ভাষায় সে-শিক্ষা দেওয়া হত। মুসলমান শাসকবৃন্দ এসে ঐ-পথ অনুসরণ করে মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপন করে ইসলামী শিক্ষার কাঠামোটি গড়ে তোলেন। সেখানে আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে মূলত কোরান শিক্ষা দেওয়া হতো। সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষার প্রবেশাধিকার ছিল না। তার পাশে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ পাঠশালা, যেখানে মাতৃভাষার অক্ষরজ্ঞান এবং কিছু অংক শেখানো হত। তবে স্বদেশী ভাষার এ বিদ্যালয়গুলোতে কদাচিৎ মুসলমানগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[৪] ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয় এদেশে ইংরেজ বণিক শ্রেণীর হাতে রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করে। তারও আগে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শুজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্যে যে ফরমান জারি করেন, তার মাধ্যমেই বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক আধিপত্যের সূচনা হয়; ইংরেজি ভাষা ব্যবহারেরও সূত্রপাত ঘটে তখনই।[৫] মধ্যযুগে বাংলায় যে সনাতন হিন্দু ও ইসলাম ধর্মভিত্তিক শিক্ষা চালু ছিল, ইংরেজ বিজয়ের পর ধীরে ধীরে তা বিলুপ্ত হতে শুরু করে এবং তার জায়গায় বর্তমানে-চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ারের (১৭৭৫-১৮৪২) নাম ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তিনি মনে করতেন সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। ইংরেজ মিশনারিবৃন্দও এমত পোষণ করতেন; সেই সঙ্গে তাঁরা খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া এবং ধর্মান্তরকরণে এ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা কর্তব্য বলে মনে করতেন। কিন্তু ডেভিড হেয়ার এ-ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতেন। তিনি ছিলেন প্রায়-অশিক্ষিত একজন ঘড়ি মেরামতকারী। ১৮০০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং পনের বছরের মধ্যে প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হন। তাঁর সে-সম্পদ তিনি এদেশে ইংরেজি ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কলকাতার হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর সাহায্যে হিন্দু কলেজ নামে উপমহাদেশের প্রথম সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

রামমোহন রায়সহ আরো অনেকে তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। নামে হিন্দু হলেও সেখানে হিন্দু ধর্ম নয়, আধুনিক জ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া হত। তবে হিন্দু নামটি আগে থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে কলেজটি হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের ভ্রূকুটি থেকে রক্ষা

www.pathagar.com

পেয়েছিল। কিন্তু সেই কলেজ থেকে যাঁরা বেরিয়ে আসেন তাঁরা সরাসরি হিন্দু ধর্মের প্রচলিত অনেক আচার-অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করে গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিরাগভাজন ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। হিন্দু কলেজ থেকে পাস-করা বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত। হিন্দু কলেজ ও ডেভিড হেয়ারের সাথে আরও একটি নাম জড়িত। তিনি হলেন ডিরোজিও। ১৮০৯ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম। ত্রিশ বছর বয়সে না পৌছাতেই তিনি এতটা খ্যাতি অর্জন করেন যে, হিন্দু কলেজের উঁচু ক্লাসের ছেলেদের পড়ানোর জন্য তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কলেজের ছাত্ররা তাঁর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের প্রতি চুম্বকের মতো আকর্ষিত হতেন। তিনি ও ডেভিড হেয়ার উভয়েই ছিলেন 'অনাধ্যাত্মিক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী।'[৬] তাঁরা এদেশে যে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন, ইংরেজ শাসনামলে সে-ধারাটি অব্যাহত ছিল।

তবে হিন্দু কলেজে কোনো মুসলমান ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। কারণ ঐ কলেজটি কলকাতানিবাসী হিন্দু ধনিক ও অভিজাত বর্ণহিন্দু পরিবারের ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডেভিড হেয়ারের পাশে এসে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু এবং কলেজটির জন্য অনেকেই বড় অঙ্কের চাঁদা দিয়েছিলেন। তাছাড়া মুসলিম ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত থাকলেও সে সময় কোন মুসলিম পরিবার যে তাঁদের সন্তানদের সেখানে পাঠাতে চাইতেন, ইতিহাস তেমন সাক্ষ্য দেয় না। কারণ তখন ইংরেজি ও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকে মুসলমানদের জন্য 'হারাম' ঘোষণা করেছিলেন এদেশের আলেম সম্প্রদায়। এই হিন্দু কলেজই ১৮৫৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতেন। তাঁদের মতে ঈশ্বর নারী-পুরুষকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন। সেই সময় বাঙালি মেয়েদের অবস্থা ছিল সমাজের নীচু তলায়। ১৮১৯ সালে রামমোহন রায় তাঁর সতীদাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রস্তাব লেখেন। তখনকার দিনে মেয়েদের উপকারী প্রাণী ছাড়া আর কিছু ভাবা হত না। সেই সময়ের পুরুষেরা মনে করতো, মেয়েরা জন্মগতভাবে মেধা ও মননহীন। সমাজে এ রকম বিশ্বাস চালু ছিল যে, মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করলে অকালবৈধব্য ডেকে আনবে। স্বামীর মঙ্গলার্থে মেয়েরাও সভয়ে শিক্ষার পথ থেকে দূরে থাকত। তাছাড়া বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথা মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল মস্ত বাধা। তবে প্রধান বাধা ছিল পুরুষতন্ত্র। পুরুষরা মনে করত মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা অসম্ভব। মেয়েদের সম্পর্কে এ রকম ধারণা শুধু যে এদেশে প্রচলিত ছিল তা নয়, সমগ্র বিশ্বেই বিভিন্ন সময়ে মেয়েদের এভাবেই দেখা হত। এমনকি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সভ্যতার কেন্দ্র বলে খ্যাত খোদ ইংল্যান্ডেও। ফরাসি বিপ্লবের পরে ১৭৯২ সালে প্রকাশিত ম্যারি উলস্টোনক্রাফ্টের বিখ্যাত Vindication of the Rights of Women বইটি তখনকার অবস্থার এক অসাধারণ চিত্র এবং এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ।

সামন্তবাদ-বিরোধী ও বুর্জোয়া আদর্শে বিশ্বাসী রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম এদেশে মেয়েদের এই অবস্থা জনসম্মুখে তুলে ধরেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, এমনকি সংস্কারবদ্ধ হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর মুখপাত্র রাজা রাধাকান্ত দেবও নারীকে কিছু

www.pathagar.com

পরিমাণে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২২ সালে প্রধানত রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে গৌরমোহন তর্কালঙ্কার *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* নামে একটি বই লেখেন। এর পরে নারীশিক্ষার ওপর লেখালেখি শুরু হয়। "উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই 'নারী' শব্দটি ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে এবং প্রভাবশালী ব্রিটিশ লেখকগণ ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজকে নিকৃষ্টতর বলে রায় দিতে গিয়ে নারীদের প্রতি যে আচরণ করা হয় সে-বিষয়টি উল্লেখ করেন।"[৭] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এদেশের মানুষ এবং তার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন শাসকদের সেই অপপ্রচারের মুখে সমগ্র মুসলিম সমাজ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং নিজেদের গুটিয়ে নেন। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ হিন্দু ধর্মের অনেক প্রচলিত বিশ্বাস ও আচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন এবং সেসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন, যেমন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের আন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হিন্দু বিধবাবিবাহ প্রচলনের আন্দোলন। তাঁদের আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে ইংরেজ শাসক সতীদাহ প্রথাকে বেআইনী বলে ঘোষণা দেয় এবং ১৮৫৬ সালে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রসর মানুষেরা মেয়েদের আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার বিকল্প কিছু দেখেননি।

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য এই যে, সেই সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ এরকমটা চিন্তা করেননি; উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের তাগিদ অনুভূত হয় এবং বিংশ শতকের শুরুতেই বেগম রোকেয়া তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনী দিয়ে স্ত্রীজাতির অবনতির কারণ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মুসলিম সমাজকে সজাগ করেন।

বাংলায় নারীশিক্ষার প্রথম অধ্যায় শুরু হয় যখন রবার্ট মে নামক লন্ডন মিশনারি সোসাইটির জনৈক সদস্য ১৮১৮ সালে কলকাতার কাছে চুঁচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরের বছর কলকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশন আর একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এরপর চার্চ মিশনারি সোসাইটি মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসে। চার্চ মিশনারি সোসাইটির সহায়তায় মিস মেরি এ্যান কুক ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে কলকাতা ও তার আশপাশে প্রায় ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারীশিক্ষার এটাই প্রথম পর্যায়। এটিকে মিশনারি পর্যায় বলা যায়।

নারীশিক্ষার প্রতি রামমোহন ও রাধাকান্তদের সমর্থন থাকলেও এই প্রথম পর্যায়টি কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কলকাতার উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণী ঐসব মিশনারি স্কুলে মেয়েদের পাঠাতে রাজি হননি। তখনও চার দেয়ালের বাইরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে শিক্ষাগ্রহণকে সমাজ ভাল চোখে দেখত না। তাই রামমোহন-রাধাকান্ত-গৌরমোহন নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও মেয়েদের বাইরে আনার সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমনকি যাঁরা নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁরাও মিস্ কুকের স্কুলগুলোতে তাঁদের মেয়েদের পাঠাতে রাজি হননি। মেয়েরা প্রকৃতির আলো-

www.pathagar.com

বাতাসে ঘুরে বেড়াবে, এটা তখন পরিবারের জন্য ছিল অপমানকর। দ্বিতীয় কারণ ছিল মিশনারিরা মূলত খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যেই স্কুলগুলো স্থাপন করেছিল। ধর্মান্তরের ভয়ে অভিজাত শ্রেণী মেয়েদের সেইসব স্কুলে পাঠাননি। বিশেষ করে ১৮২০-এর দশকের শেষ ও ত্রিশের দশকের প্রথমে হিন্দু কলেজ থেকে পাস-করা ইয়ং বেঙ্গলদের হিন্দুধর্মবিরোধী প্রচারণা ও আচার-আচরণ তাঁদের মনে আরো ভয় ঢুকিয়ে দেয়। মিশনারি স্কুলে প্রধানত নীচুতলার হিন্দু মেয়েরা পড়তে যেত। ফলে ১৮৩০-এর দশকের শুরুতেই স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই প্রাথমিক আন্দোলন নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে-সচেতনতা সৃষ্টি করে, তা ধ্বংস হয় না; বরং নারীশিক্ষার দাবি দিন দিন বাড়তে থাকে। 'ভারতপথিক' রামমোহন রায় স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে তুললেও তিনি নিজে তাঁর দুই স্ত্রীর কাউকেই সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বেড়া ভেঙে শিক্ষা দিতে পারেননি। বিদ্যাসাগরও পারেননি তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তুলতে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিজেদের এই স্ববিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে বাড়ির মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে বাড়ির মধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেবও মেয়েদের বিচ্ছিন্নতা ভাঙতে সাহসী হননি; তিনিও তাঁর বাড়িতেই একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে পরিবারের মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্তরোত্তর ইংরেজি ভাষার চল বৃদ্ধি পাওয়ায় অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় তড়িৎগতিতে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, দেশের নতুন প্রভুর ভাষা ইংরেজি শেখার মধ্যেই জাগতিক সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। তাঁরা বুঝতে পারেন, 'ইংরেজি শিক্ষা যে কেবল সম্ভাবনাময় চাকরি জুগিয়ে দেয় তাই নয়, এর ভেতর দিয়েই বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত আবিষ্কার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক নতুন জগতে প্রবেশ করারও সুযোগ আছে।'[৮] এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক শিক্ষা প্রচলনের ফলে শিক্ষা আর কেবল সমাজের উচ্চকোটি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, তা সমাজের নীচুতলার মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে, একসময় যাদের জন্য শিক্ষার দ্বার বন্ধ ছিল।

সঙ্গত কারণেই আমরা এতক্ষণ কলকাতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। এবারে ঢাকার দিকে তাকানো যাক। ঢাকাতেও ইংরেজ মিশনারিরাই প্রথম পর্বে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষার চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসে। '১৮১৫ সালে মূলত গরীব ইউরোপিয়ান ও ইউরেশিয়ানদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য' ক্যালকাটা বেনেভোলেন্ট ইন্সটিটিউশনের একটি শাখা খোলার জন্য রেভারেন্ড শি ওয়েন লেনার্দো নামের একজন আয়ারল্যান্ডবাসীকে ঢাকাতে পাঠানো হয়। ১৮১৬ সালের এপ্রিল মাসে চক বাজারের কাছে ছোট কাটরায় ঢাকার প্রথম ইংরেজি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।'[৯] গ্রিক ও আরমেনীয়সহ ৩৯ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্কুলটি যাত্রা শুরু করে। কলকাতার মতো ঢাকাতেও মিশনারিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। সম্ভবত লেনার্দোর স্কুলটিই সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম সহশিক্ষার

www.pathagar.com

স্কুল। তবে ছাত্রছাত্রী সবাই ছিল খ্রিস্টান। কোন হিন্দু বা মুসলিম ছেলেমেয়ে সে স্কুলে পড়তে আসত বলে জানা যায় না। লেনার্দো তাই এদেশীয় হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৭টি বাংলা স্কুল এবং ১৮১৭ সালে মুসলিম ছাত্রদের আকর্ষণ করার জন্য একটি ফারসি স্কুল স্থাপন করেন। তবে তার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ইংরেজি স্কুলটির দরজা স্থানীয় অখ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া। বেশকিছু হিন্দু ছাত্র প্রথমে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও সামাজিক কারণে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৪৮ সালে স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮২৪ সালে খ্রিস্টান মেয়েদের জন্য ঢাকায় আরও একটি স্কুল খোলা হয়। কিন্তু ১৮২৬ সালে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়।[১০]

নারীশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮৪০-এর দশকের শেষপাদে। ১৮৪৯ সালের মে মাসে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা এদেশে নারীশিক্ষার অগ্রযাত্রার পথে প্রথম বড় মাইলফলক। প্রতিষ্ঠাতা জে. ই. ডি. বেথুনের নামানুসারে স্কুলটি বেথুন স্কুল হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। অক্সফোর্ডের মেধাবী ছাত্র বেথুন ১৮৪৮ সালে ভারতে আসেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ স্কুলটির পিছনে ব্যয় করেন। ১৮৫১ সালে তাঁর অকাল মৃত্যুর পর সরকার স্কুলটির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। বেথুন স্কুল কলকাতার ভদ্রলোক শ্রেণীর সামনে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। এ স্কুলটি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ধর্মান্তর করার কোন ইচ্ছা প্রতিষ্ঠাতার ছিল না। তাছাড়া এর অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন এদেশীয় এবং হিন্দু।

স্কুলটির সাফল্য নিয়ে পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। গোলাম মুরশিদ বলেন, "অল্পসংখ্যক মানুষ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। হরদেব চট্টোপাধ্যায়সহ যে অল্পসংখ্যক মানুষ তাঁদের বাড়ির মেয়েদের বেথুন স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা হিন্দু অভিজাত রক্ষণশীল সমাজের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। ১৮৫০ সালের ২৯ মার্চ বেথুন লর্ড ডালহউসিকে জানান যে, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মেয়েদের তাঁর স্কুলে পাঠাতে পুরোপুরি বিরোধী এবং একজন প্রভাবশালী রক্ষণশীল হিন্দু নেতার মৃত্যুর পর তাঁর স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁর মেয়ে সৌদামিনীকে ঐ স্কুলে পাঠাবার আগে দ্বিধান্বিত ছিলেন।"[১১]

রক্ষণশীল সমাজ মনে করত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর নারীসুলভ গুণাবলি হ্রাস পায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পক্ষে থাকলেও শিগ্‌গির তিনিও সমাজের চাপের মুখে নারীশিক্ষার বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তাঁর 'দুর্ভিক্ষ' নামক কবিতায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, নারীশিক্ষা প্রসারের ফলে মেয়েরা তাদের গুণাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। মুরশিদ জানাচ্ছেন, "মাত্র ১১ জন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে সংখ্যা শিগ্‌গির ৭-এ নেমে আসে। কোন একসময় ছাত্রীসংখ্যা ৩-এ দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে ছিল ঐ স্কুলের শিক্ষক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই মেয়ে।"[১২] অথচ *বাংলাপিডিয়া* থেকে জানা যায় যে, 'বেথুন তাঁর এ পদক্ষেপের পক্ষে বিখ্যাত কয়েকটি পরিবারের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন। ফলে ১৮৫০ সাল নাগাদ এর ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ জন।'[১৩]

www.pathagar.com

তবে আজ আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে বেথুন স্কুল (পরে, যেটি কলেজে পরিণত হয়)-এর অবদান অসামান্য। ১৮৪০ ও ৫০-এর দশকে অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ রায় ও সর্বোপরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় নারী শিক্ষার প্রতি সমাজ অনেকটাই নমনীয় হয়ে আসে এবং ১৮৫৪ সালে উড সাহেবের শিক্ষা প্রতিবেদনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে এই বলে স্বস্তি প্রকাশ করা হয় যে, "আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, এদেশবাসী তাদের মেয়েদের শিক্ষার প্রতি ক্রমান্বয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এখন থেকে যেসব বিদ্যালয়কে অনুদান (grant-in-aid) দেওয়া হবে, তার মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ... গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল বাংলা সরকারকে জানিয়েছে যে, তারা এখন থেকে স্ত্রীশিক্ষাকে সবদিক থেকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করবে।"[১৪] ফলে অনেকেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। জয়কৃষ্ণ মুখার্জী কলকাতার উত্তরপাড়ায় একটি এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র রাজশাহীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি কলকাতা, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৪ সালে সারা বাংলার সর্বমোট ২৮৮ বালিকা বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল।[১৫]

মনে হতে পারে যে, বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ১৮৫০ কিংবা ১৮৬০-এর দশকে এদেশের মেয়েরা বুঝি সামজের অবরোধপ্রথা ভেঙে দলে দলে ঐসব স্কুলে এসে ভর্তি হয়। মোটেই তা নয়। পরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করা তখনও এদেশের মেয়েদের ভাগ্যলিপি ছিল। বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা সেই সংস্কারকে সহজে ভাঙতে পারে নি। তার ওপর যাঁরা মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তাঁরাও পুরুষ শিক্ষকদের কাছে মেয়েদের পড়তে যাওয়াটা সমর্থন করেননি। তাই তখনও নারীশিক্ষার বিষয়টি এক কঠিন সামাজিক সমস্যা ছিল। স্মরণীয় যে, মহিলা শিক্ষিকার অভাব ছির অপূরণীয়। মেয়েরা বাড়িতে স্বামী, বাবা বা আর কারো কাছে কিছুটা শিক্ষালাভ করতেন। তাছাড়া ১০/১১ বছর বয়সে বালিকাদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বয়স্ক মেয়েদের পক্ষে স্কুলে যাওয়া বা উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। যাঁরা বাড়িতে 'জেনানা শিক্ষা' গ্রহণ করতন, সে-যুগে তাঁরা সবচেয়ে শিক্ষিত বলে গণ্য হতেন। ১৮৫০ ও ৬০-এর দশকে 'জেনানা শিক্ষার' সাফল্যের পিছনে ছিল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপ্রভাবিত হিন্দু এবং দেশীয় খ্রিস্টান পরিবারের সমর্থন। তাঁরা ধর্মীয় উৎসাহ নিয়ে জেনানা শিক্ষার পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ দত্ত প্রধান। এঁরা পশ্চিমা আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও স্ববিরোধিতায় ভুগেছেন। তাঁরা স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজেদের স্ত্রী বা মেয়েদের ঘরের বাইরে পাঠিয়ে স্কুলে শিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন। উপর্যুক্ত ব্রাহ্ম নেতাদের কারো স্ত্রী-ই কিন্তু স্কুলে যান নি। এমনি তাঁদের নেতা কেশবচন্দ্র সেনেরও।

www.pathagar.com

১৮৬৩ সালে কেশবচন্দ্র সেনের কয়েকজন শিষ্য উমেশচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে 'বামাবোধিনী সভা' স্থাপন করেন। ঐ সালেই তাঁরা *বামাবোধিনী পত্রিকা* প্রকাশ করেন। বাঙালি নারীমুক্তি আন্দোলনে ঐ পত্রিকাটি অসামান্য ভূমিকা পালন করে। পত্রিকাটি 'জেনানা শিক্ষাকে' সমর্থন করে নিয়মিত প্রচার চালাতো। কৈলাশবাসিনীর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ১২ বছর বয়সে ১৮৪৯ সালে ব্রাহ্ম দুর্গাচরণ গুপ্তের সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হয় তখন তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন না, মেয়েদের লেখাপড়াকে বরঞ্চ ঘৃণার চোখেই দেখতেন। কিন্তু ব্রাহ্ম স্বামীর চাপে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং সারা ভারতে তিনিই প্রথম লেখিকার আসনটি দখল করে আছেন। ১৮৬৩ সালে তিনি হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা নামে একটি বই লেখেন।[১২]

এতকিছুর পরেও বলা যায় বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথা তখনও নারীশিক্ষা বিস্তারের পথে মস্তবড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ১০/১১ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়ার ফলে কারো পক্ষে ঐ বয়সের পর আর স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, ব্রাহ্ম, বাঙালি খ্রিস্টান এবং ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান-প্রভাবিত হিন্দু পরিবারই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ও সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় এ ব্যাপারে পিছনে পড়ে ছিল। তাছাড়া মহিলা শিক্ষকের অভাবও ছিল একটা বড় ঘটনা। তাই মহিলা শিক্ষকের অভাব মেটানোর জন্য মহিলা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। সরকার এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা যখন চিন্তাভাবনা করছিল, ঠিক তখনই ঢাকার কিছু উদ্যোগী মানুষের অনুরোধে ১৮৬২ সালে দক্ষিণ-পূর্ব ডিভিশনের ইন্সপেক্টর অব স্কুল্স আর. এল. মার্টিন সরকারের কাছে ঢাকায় একটি ফিমেল নরমাল স্কুল বা মহিলা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপনের আবেদন জানান।[১৭] কিন্তু সে সময় উঁচু ঘরের কোনো মহিলাই যে স্কুল শিক্ষিকার চাকরিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে না, এ বিষয়টি বেশ নিশ্চিতই ছিল। 'মেয়েরা চাকরি করবে', তখনকার হিন্দু-মুসলমান সমাজে এ রকম কোন চিন্তাই স্থান পায় নি।

অনেক তর্কবিতর্কের পর ভারত সরকার এক বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি ফিমেল নরমাল স্কুল স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। একই সঙ্গে বাংলা সরকার কলকাতার বেথুন স্কুল কর্তৃপক্ষকে সেই স্কুলে অনুরূপ একটি মহিলা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ক্লাস খোলার অনুরোধ জানায়। তখন বেথুন স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উত্তরে তিনি সরকারকে জানান, 'কলকাতার বিদ্যমান সামাজিক অবস্থায় এ ধরনের একটি স্কুলের জন্য সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন ছাত্রীই পাওয়া যাবে না।'[১৮] অবশেষে ১৮৬৩ সালের ১১ মে ১৬ জন ছাত্রী নিয়ে ঢাকাতে বাংলার প্রথম ফিমেল নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬ জন ছাত্রীর মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন কায়স্থ, দু'জন বাঙালি খ্রিস্টান, এবং ১২ জন বৈরাগী।'[১৯] উল্লেখ্য যে, একজনও মুসলমান ছাত্রী ভর্তি হয়নি। প্রথমদিকে স্কুলটি সাফল্য লাভ করলেও অল্পদিনেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, ঐ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় তখনও ঢাকায় আসেনি। কেবল বাঙালি খ্রিস্টান ও কিছু নিম্নবর্গের হিন্দু মহিলাই ঐ স্কুলে প্রশিক্ষণ নিতে আসত। তাই শেষমেশ ১৮৭২ সালে স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২০] ঢাকার জেনানা এডুকেশন সোসাইটি ব্রাহ্ম মহিলাদের শিক্ষা ও

www.pathagar.com

পুরস্কারের ব্যবস্থা করে। জগন্নাথ স্কুলের শিক্ষক নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের মূল চালিকা শক্তি।

১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকায় আসেন নবকৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ঢাকার কতিপয় প্রগতিশীল ব্যক্তির সহযোগিতায় নবকৃষ্ণ ১৮৭১ সালে 'ঢাকা শুভসাধনী সভা' নামে একটি সমাজসংস্কারক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভার উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে ঢাকায় প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৮৭৬ সালে মেরী কার্পেন্টার ঢাকায় এসে স্কুলটি পরিদর্শন করেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সরকারকে লেখেন। সেই প্রশংসাপত্রের সুবাদে সরকার ১৮৭৮ সালের জুন মাসে সেটিকে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এ্যাশলি ইডেনের নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ করা হয় ইডেন গার্লস স্কুল। সেপ্টেম্বর মাসে স্কুলটিকে সরকারি করা হয়। সেটাই আজকের *ইডেন গার্লস স্কুল*।[২১]

১৮৬৩ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ফিমেল নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধারণ করার মতো সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ঢাকায় তৈরি হয়নি। কিন্তু কলকাতার সমাজ তৈরি হয়েছিল। তাই ঢাকার স্কুলটি ১৮৭২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের বছর ১৮৭১ সালে কলকাতায় এ ধরনের একটি স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ বছরই কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে এনেট্টা এক্রোয়েডের তত্ত্বাবধানে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার পর মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রি লাভের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার বিষয়টি সামনে চলে আসে। ঐ বিদ্যালয়টি ছিল মূলত বয়স্ক মহিলা ও শিক্ষিকাদের ট্রেনিং স্কুল। এক্রোয়েডের ঐ স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় তাঁর কয়েকজন বাঙালি বন্ধু তাঁকে সাহায্য ও সহায়তা দান করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মনমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ও দুর্গাদাস। বলা যায়, এই স্কুল স্থাপনের মধ্য দিয়েই বাংলায় মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার শুরু। স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে এই প্রথম মেয়েদের থাকার জন্য হোস্টেল স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ সালে এই স্কুলটিকে বেথুন স্কুল ও কলেজের সঙ্গে একত্র করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র বাংলার নারীশিক্ষা আন্দোলন নিয়ে যখন কথা বলছি, তখন ঐ সময়ে খোদ ইংল্যান্ডে নারীশিক্ষার অবস্থাটি কি ছিল, তার দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। যে-দেশের ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের সভ্য করেছে বলে অনেকে মনে করেন, সে-দেশের নারীশিক্ষার অবস্থা আমাদের চেয়ে কোনো অংশেই ভাল ছিল না। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয় নি। ঐ সালে সর্বপ্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেয়। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৯২০ ও ১৯২৯ সালে সে অনুমতি দেয়। তার জন্য উনিশ শতক জুড়ে সেদেশেও নারীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দাবিতে ১৮৬৩ সালে লন্ডনে একটি কমিটি গঠিত হয়।[২২] এই তথ্যটুকু প্রমাণ করে না কি যে, উনিশ শতকে আমাদের নারীশিক্ষার আন্দোলন ও অর্জন ইংল্যান্ডের চেয়ে খারাপ ছিল না?

www.pathagar.com

আমরা জানি ১৮৫৭ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সে-তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কোনো পাবলিক পরীক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় নি। এতে প্রমাণ হয় যে, সে-সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে, মেয়েদের উচ্চাশিক্ষার বিষয়টি কর্তাব্যক্তিদের মাথাতেই ছিল না। ১৯২১ সালে রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতপাত ধর্মবর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার ভর্তি নিশ্চিত করেছিল। ১৮৫৭ থেকে ১৯২১। দীর্ঘপথ। ১৮৫৭ সালের সামাজিক পরিবেশ ১৯২১ সালে অনেকটাই বদলে গেছে। ১৮৫৭ সালের ৩০ এপ্রিল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লেখা এক চিঠিতে জানতে চান যে, তাঁরা মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়া ও ভর্তির বিষয়ে কি চিন্তাভাবনা করছেন। সিন্ডিকেটে চিঠিটা আলোচিত হয় কিন্তু তাঁরা কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। তবে কয়েকমাসের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে ও সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

দেহেরার 'নেটিভ খ্রিস্টান গার্লস স্কুলে'র একজন ছাত্রী চন্দ্রমুখী বসু স্কুলের হেডমাস্টারের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় (বর্তমান এসএসসি) অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সেই আবেদনটি এদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সে-আবেদনপত্র পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেশ বিপাকেই পড়ে যান। ১৮৭৭ সালের ১০ মার্চ উপাচার্য হবসহাউস তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতায় বলেন, 'একজন ভারতীয় খ্রিস্টান মেয়ে এ বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আইন মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়াটা অনুমোদন করে না। আমরা আপাতত যা করতে পারি তা হল এই যে, তাকে একই ধরনের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে তার যোগ্যতার প্রমাণ নিতে পারি।' তাই করা হয়। পরীক্ষায় চন্দ্রমুখী নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করেন। এরপর মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার পক্ষে নিয়মকানুন প্রণয়ন করা ছাড়া কোনো উপায় রইল না। সেই লক্ষ্যে সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময় এসেছে এবং বিভিন্ন অনুষদকে সেই লক্ষ্যে আইনকানুন প্রণয়ন করতে আহবান জানায়।

১৮৭৭ সালের ১২ মে কলা অনুষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মেয়েদের পরীক্ষা ছেলেদের প্রশ্নপত্রেই নেওয়া হবে, তবে আলাদা কক্ষে মহিলা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। সেই কলা অনুষদ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে F.A. (এখনকার HSC) এবং B.A. পরীক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মকানুন তৈরির জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করে। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য রচিত নিয়মকানুনগুলো ২৭ মার্চ সিন্ডিকেটে এবং ১২ মে কলা অনুষদে গৃহীত হয়। আর F.A ও BA/MA পরীক্ষার জন্য প্রণীত নিয়মকানুন ১৮৭৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সিন্ডিকেটে এবং ২৭ এপ্রিল সিনেটে অনুমোদিত হয়। আর একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছিল। তা হল মেয়েদের গণিতের বদলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিতে হবে। কারণ তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের

www.pathagar.com

কাছে তথা সমগ্র সমাজে এ রকম একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, গণিত মেয়ের জন্য কঠিন বিষয়, তাই মেয়েরা গণিত বিষয়ে পড়াশুনা করার উপযুক্ত নয়। যাহোক, আইন পাস হলে উচ্চাশিক্ষার জন্য মেয়েদের সব বাধা দূর হয় এবং ১৮৭৭ সালে চন্দ্রমুখী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাসে নিজের স্থান করে নেন। ১৮৭৯ সালে সিন্ডিকেট চন্দ্রমুখীকে F.A. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু ১৮৮৩ সালে B.A. পাস করে উপমহাদেশের প্রথম মহিলা স্নাতক হবার গৌরব অর্জন করেন। ১৮৮৩ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপাচার্য রেনল্ডস্ এটাকে 'most remarkable' ঘটনা বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি 'landmark'[২৪]। সাফল্যের জন্য তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানান।

১৮৫০ ও ৬০-এর দশকে যাঁরা মেয়েদের পরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে আটক রেখে শিক্ষা দানের পক্ষে ছিলেন, তাঁরাও কিন্তু শিক্ষার বিষয় নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। একদল মনে করতেন মেয়েদের 'মেয়েলি' বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। মেয়েলি বিষয় কি? সন্তান-ধারণ ও তাদের যত্ন নেওয়া, রান্নাবান্না, সেলাই, ভালভাবে সংসার চালানো ইত্যাদি। এই দলের প্রতিভূ ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। সে সময়ে স্কুলে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত, তাঁদের মতে সেগুলো 'মেয়েলি' ছিল না। তাঁরা মনে করতেন জ্যামিতি, গণিত, দর্শন প্রভৃতি পুরুষের শিক্ষার বিষয়, পুরুষালি। এগুলো মেয়েদের শেখা উচিত নয়। এগুলো পড়লে মেয়েদের 'নারীত্ব' নষ্ট হয়ে যাবে।

তাঁদের তুলনায় যাঁরা বেশি সংস্কারমুক্ত ছিলেন তাঁরা মনে করতেন জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই। এঁদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, আনন্দচরণ খাস্তগীর, শশীপদ ব্যানার্জী ছিলেন প্রধান। এঁরা প্রথম দলকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন। ১৮২০-এর দশকে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীও একই শ্লোগান তুলেছিলে, "ঈশ্বর নারী পুরুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন। কোনোই পার্থক্য করেন নি। তাই সব কাজই পুরুষের মতো মেয়েরাও করতে পারে।" তবে সময়ের বহু আগেই যে তাঁরা এ-শ্লোগান দিয়েছিলেন ইতিহাস তা প্রমাণ করে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* অবস্থান ছিল প্রথম দলের পক্ষে। পত্রিকাটি মনে করত একজন ভাল মা ও স্ত্রী হওয়ার শিক্ষাই মেয়েদের জন্য দরকার। জমিদার নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিশ শতকের পূর্বে এ-ধরনের বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান মেয়েরা যোগদান করে নি।[২৫] ১৮৯৫ সালে কলকাতায় দু'টি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নি। কলকাতায় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন মুর্শিদাবাদের নবাবপত্নী ফেরদৌস মহল ১৮৯৭ সালে। এরপর ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সোহরাওয়ার্দী গার্লস কলেজ।[২৬] অতঃপর নারীশিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন বেগম রোকেয়া। তিনি কলকাতায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৯১১ সালে ৮ জন ছাত্রী নিয়ে। স্কুলটি ১৯১৫ সালে

www.pathagar.com

প্রাথমিক এবং ১৯১৭ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হলে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭। কিন্তু বেগম রোকেয়াও প্রথম দিকে কূপমূণ্ডক মুসলমান সমাজকে অগ্রাহ্য করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। তবে বেগম রোকেয়া, ১৯২৭ সালে ঘোষণা দেন যে, ৪০ জন বাংলাভাষী ছাত্রী পেলে বাংলা শাখা খোলা হবে।

উল্লেখ্য, এ সময় বাংলাভাষী মুসলমান মেয়েদের কোনো স্কুল ছিল না। উর্দু স্কুল ছিল ১৭টি আর মক্তব ২৫টি। শুধু কলকাতাতেই ১৯১১ সাল পর্যন্ত মেয়েদের জন্য ছিল বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল, ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলসহ সাতটি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি এম. ই স্কুল, ৫টি ভার্নাকুলার স্কুল, ৪১টি উচ্চমাধ্যমিক এবং ৪১টি নিম্নমাধ্যমিক স্কুল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০১ সালের এক হিসাব অনুসারে বঙ্গদেশে ইংরেজ ও অ্যাংলো মহিলাসহ মহিলা শিক্ষক ছিলেন ১৫৬ জন।[২৭] ১৯১৩ সালে সর্বধর্মের মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম তৈরির জন্য সরকারকে পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত হল ফিমেল এডুকেশন কমিটি।[২৮] সরকারি পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশ শতকে প্রবেশের প্রাক্কালে এদেশে নারীশিক্ষার চালচিত্রটি কেমন ছিল সেটা জানতে পারি।

১৮৮৬-১৮৮৭ এবং ১৮৯১-৯২ থেকে ১৮৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত সারা বাংলায় পাবলিক স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে[২৯]

সাল	ছাত্রীসংখ্যা	সাল	ছাত্রীসংখ্যা
১৮৮৬-৮৭	৮১,৫৯২ জন	১৮৯৪-৯৫	১০৩,৭৬৮ জন
১৮৯১-৯২	৮৮,৭৩১ জন	১৮৯৫-৯৬	১০৪,৫৭৪ জন
১৮৯২-৯৩	৯২,৭৪৩ জন	১৮৯৬-৯৭	১০৫,৯১৯ জন
১৮৯৩-৯৪	৯৬,৫৪৭ জন		

এই রিপোর্ট স্পষ্টই জানিয়ে দেয় যে, উক্ত পরিসংখ্যান দ্বারা বাংলার প্রকৃত হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রীর চিত্র পাওয়া যায় না। তখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় ইউরোপীয় মেয়েরাই বেশি সুযোগ গ্রহণ করেছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালে পাঠরত বালিকাদের শতকরা ৫৭ ভাগেরও বেশি ইউরোপিয়ান ও ইউরেশিয়ান, এবং দেশী খ্রিস্টানদের সংখ্যা শতকরা ২৮ ভাগ। বাংলায় ব্রাহ্ম ছাত্রীর সংখ্যা জানা গেলে প্রকৃত বাঙালি হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা জানা যেত। তবে সে-সংখ্যা যে খুব কম ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর বাঙালি মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা? সুতরাং রিপোর্টের মতে এই ছাত্রী সংখ্যা দেখে এদেশবাসীর মধ্যে নারীশিক্ষা প্রসারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে ভুল করা হবে।[৩০] বাংলার এই চিত্রের সঙ্গে সারা ভারতে হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার পরিসংখ্যানটি মিলিয়ে যে-সত্যটি প্রকাশ পায় তা হল শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতেই মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার অবস্থার চালচিত্রটি ছিল মোটামুটি অভিন্ন এবং করুণ। নিচে ১৮৮৬-৮৭, ১৮৯১-৯২ ও ১৮৯৬-৯৭ সালে সারা ভারতে হিন্দু ও মুসলমান মেয়ের শিক্ষা চিত্রটি দেওয়া হয়েছে।[৩১]

www.pathagar.com

১৮৮৬-৮৭

হিন্দু	মাধ্যমিক ইংরেজি	শতকরা	মাধ্যমিক মাতৃভাষা	শতকরা	প্রাথমিক	শতকরা
	১,৮৯৫	১১.৯	৫,৮৮৫	৬৬,৬	৯৩,৪৯২	৭১.২
মুসলমান	১৮	০.১	১৫৩	১.৭	১৭,৬৩০	১৩.৪

১৮৯১-৯২

হিন্দু	মাধ্যমিক ইংরেজি	শতকরা	মাধ্যমিক মাতৃভাষা	শতকরা	প্রাথমিক	শতকরা
	১,৫৩২	৮.২	১০,৪০৭	৬৬,৮	১,১২,৩৮৩	৭১.৫
মুসলমান	২০	০.১	৯৬২	৬.২	২৫,৩৮৮	১৬.২

১৮৯৬-৯৭

হিন্দু	মাধ্যমিক ইংরেজি	শতকরা	মাধ্যমিক মাতৃভাষা	শতকরা	প্রাথমিক	শতকরা
	১,০০১	৫.৬	১০,৭৬৩	৬৩.৬	১,৩০,৬০৬	৭১.৯
মুসলমান	২৫	০.১	৬৯৮	৪.১	২৬,৮৯২	১৪.৮

১৮৯১-৯২ ও ১৮৯৬-৯৭ সালে বাংলায় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে[৩২]

	স্কুল	ছাত্রী	স্কুল	ছাত্রী
ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল	৩৯	৩,৯৬১	৩৪	৪,০০৯
মাতৃভাষার মাধ্যমিক স্কুল	২২	১,৪৩৮	২৩	১,৩৪৬

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সরকার তখন সে-ক্ষোভ প্রশমিত করার লক্ষ্যে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ এ অঞ্চলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অঙ্গীকার করে। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশক্রমে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্মবর্ণ-লিঙ্গ-নির্বিশেষে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই স্থাপন করে। কিন্তু ঢাকার সমাজ তখনও যে সে রকম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি, তা প্রমাণ হয়ে যায় প্রথম বছরেই লীলা নাগের ভর্তির বিষয়টি নিয়ে। ঢাকার রক্ষণশীল সমাজ সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। পক্ষেও দাঁড়ায় কেউ কেউ। বিতর্ক জমে ওঠে। ঢাকায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে প্রতিদিন তাঁর ভর্তির বিরুদ্ধে প্রবন্ধ ছাপা হতে থাকে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে মেয়েদের ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত ছিল, তাই সকল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লীলা নাগকে ভর্তি করতে পেরেছিল। শুরুর বছরেই তাঁর ভর্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সহশিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত করে। লীলানাগ ১৯২৩ সালে ইংরেজিতে এম. এ পাশ করেন। ঢাকার রক্ষণশীল সমাজের মুষ্টি আলগা হতে শুরু করে। ১৯২৩ সালে আরো তিনজন ছাত্রী ভর্তি হন। লতিকা রায়, মালা রায় ও

www.pathagar.com

অরুনবালা সেনগুপ্ত ১৯২৫ সালে বাংলায় MA পাস করেন। ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৩৪ সালে ৩৯, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৫৯, ১৯৪৪-৪৫ সালে ৯০ এবং দেশভাগের বছর ১৯৪৬-৪৭ সালের ছাত্রীসংখ্যা ১০০তে উন্নীত হয়।[৩৩] দেশভাগের ফলে ব্যাপক হারে হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে ছাত্রীসংখ্যা হঠাৎ করে ১৯৪৮ সালে ৭২-এ নেমে আসে। ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৪,০৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ৮,২১৪ জন। বাংলাদেশের মোট ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ৯,৬৬,৪৬২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩,৬২,৬৪০ জন।[৩৩(ক)]

তবে যে-সম্প্রদায়ের মুখ চেয়ে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, সে সম্প্রদায়ের আড় ভাঙতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। মুসলিম সমাজ বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেনি। সে-রক্ষণশীলতায় প্রথম আঘাত হানেন ফজিলাতুন্নেসা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হন ১৯২৫ সালে; এবং সেই গণিত বিষয়ে যে-গণিত মেয়েদের মস্তিষ্কের জন্য উপযুক্ত নয় বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি গণিতে এম. এ. পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথম মুসলিম মহিলা এম. এ.। তবে তখনও মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা তেমন বাড়েনি। প্রথম যুগের ক'জন মুসলিম ছাত্রী হলেন আজিজুন্নেসা, জোবেদা খাতুন, জামসেরুন্নেসা ও আনোয়ারা খাতুন।

করুণাকণা গুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ইতিহাস হয়ে আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা শিক্ষক। ১৯৩৩ সালে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে পাস করে ১৯৩৫ সালে ঐ বিভাগে সহকারী প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর দু'বছর পরে চারুপমা বসু যোগ দেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তাই করুণাকণা গুপ্তের যোগদানকে ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ স্বাগতই জানিয়েছিল। ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৯২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৭৭ জন মহিলা[৩৪] শিক্ষকের উপস্থিতি আজ আর কারো বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত মোট ৫,৪৮৭ জন পুরুষ শিক্ষকের বিপরীতে ৯৭৫ মহিলা শিক্ষক কর্মরত আছেন।[৩৪]

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক কলকাতায় লেডি ব্রেবন কলেজ স্থাপন করেন। ঐ মহিলা কলেজে শামসুন নাহার মাহমুদ বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদেন ১৯৩৯ সালে।

এতক্ষণ ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত এদেশে নারীশিক্ষার এক সংক্ষিপ্ত চালচিত্র তুলে ধরা হল। বর্তমানে নারীশিক্ষা সম্পর্কে অনেক পুরনো বিতর্কের অবসান হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু উচ্চাশিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে কালো বোরখায় ঢাকা ছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এখনো মেয়েদের চার

www.pathagar.com

দেয়ালের আড়ালে বা কালো কাপড়ে ঢেকে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং মেয়েদের 'মেয়েলি' শিক্ষা দেবার পক্ষে এখানে এখনও যথেষ্ট মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে সমাজ যেহেতু তাঁদের বিরুদ্ধে, তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা তাঁদের বাড়ির মেয়েদের ঘরের বাইরে আসতে দেন এবং সহশিক্ষার পীঠস্থানগুলোতে পাঠান। কিন্তু সমাজ থেকে মেয়েদের বিচ্ছিন্ন রাখার মনোভাব এখনো মুসলিম সমাজ থেকে যে একেবারে উঠে গেছে, একথা ঠিক নয়।

১৯৪০-এর দশকেও সাধারণভাবে এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় নারীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিছু 'সাহসী ব্যক্তি ও পরিবার সে-বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে তাঁদের মেয়েদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করেন, ফজিলাতুন্নেসা যার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

আমরা আজ যদি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকাই তাহলে কি দেখি? বাংলাদেশে আজ আধুনিক বুর্জোয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদার জোয়ার বইছে। মানুষ আজ শিক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র মানুষের সে-চাহিদা মেটাতে অক্ষম। তাই ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে ক্রমশ শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছে। যারা বৈধ-অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন, তাঁরা বিনিয়োগের একটা ফাঁকা ক্ষেত্র পেয়ে গেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত খুলে তাঁরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করছেন। এঁদের লক্ষ্য শিক্ষাবিস্তার নয়, একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা। তাই ঢাকার অলিতে-গলিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডের সঙ্গে হোঁচট খেতে হয়।

২

এদেশে নারীশিক্ষার আন্দোলন ও প্রচলনের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে যেমন কিছু ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের নাম আপনা থেকেই উঠে এসেছে, তেমনি বাদও পড়েছে অনেক নাম। তবে এদেশে নারীশিক্ষা প্রসারের ওপর যেকোনো প্রমাণ্য গ্রন্থ পড়লে এসব তথ্যই পাওয়া যাবে। এর মধ্যে নতুন কিছুই যোগ করা যায় নি। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব থেকে বেগম রোকেয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে ফজিলাতুন্নেসা, চন্দ্রমুখী বসু থেকে করুণাকণা গুপ্ত কিংবা বেথুন স্কুল থেকে ইডেন স্কুল বা *বামাবোধিনী পত্রিকা* থেকে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি—এসব তথ্যই এসেছে। একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে উত্থাপন করার জন্যই এতক্ষণ এই ইতিহাস লক্ষ্য করতে হল।

সে-প্রশ্নটি হল এদেশে নারী-শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে নায়ক কে? ইতিহাসে এক এক সময়ে এক একজন নায়ক আসেন। তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে বিদায় নেন। এভাবেই সমাজ এগিয়ে চলে। এদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সে-নায়কটি কে? রামমোহন রায়? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? *বামাবোধিনী পত্রিকা*? চন্দ্রমুখী বসু? ফজিলাতুন্নেসা? বেগম রোকেয়া? নাকি করুণাকণা গুপ্ত? সত্যি কথা বলতে কি এঁরা কেউই নায়ক নন। রামমোহন রায় যদি আরো দু'শ বছর আগে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে কি তিনি সতীদাহ প্রথার অমানবিকতা কিংবা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব

www.pathagar.com

অনুভব করতে পারতেন? ড্রিংকওয়াটার বেথুনই কি পারতেন তাঁর বিখ্যাত বেথুন স্কুল স্থাপন করে এদেশে নারীশিক্ষার বন্ধ দরজা খুলে দিতে? আরো পঞ্চাশ বছর আগে জন্মালে চন্দ্রমুখী বসু কি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করতে পারতেন? ১৮৬৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদাদেবী বিলেত থেকে ফিরে খোলা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ঠাকুরবাড়িতে যেতে সাহস পেতেন? সাহস পেতেন কি অসুস্থ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে একা গভর্নর জেনারেলের ভোজসভায় পাঠাবার? এই দু'টি ঘটনা ষাটের দশকে ঠাকুরবাড়িসহ সমাজে দারুণ ঝড় তুলেছিল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরক্ত হয়েছিলেন এবং নারীশিক্ষার অগ্রপথিক প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেদিন এতই ভেঙে পড়েছিলেন যে, ভোজসভা ত্যাগ করে তিনি বাড়ি চলে যান। কিন্তু সময়টা যদি ১৮৬০-এর দশক না হয়ে আরও একশ' বছর পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং তখন যদি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হত, তাহলে কি তিনি সেই সাহস দেখাতে পারতেন?

কাজেই এক্ষেত্রে নায়ক অন্য কেউ নয়—নায়ক হচ্ছে সময়। উনিশ শতক অবিভক্ত ভারতের জন্য এক ক্রান্তিকালের শতক। এক শতকে ঠিক হয়ে যায় রিলে রেসে কোন সম্প্রদায় বিংশ শতাব্দীতে এগিয়ে যাবে, আর কোন সম্প্রদায় পিছনে পড়ে থাকবে। তার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গুটিকয়েক মানুষ দায়ী, কলকাতার মোট জনসংখ্যার তুলনায় তাঁরা শতকরা ০.১ হবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে সমাজ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে পরিবর্তনের পক্ষে মুষ্টিমেয় মানুষকেই পাওয়া যায়। ব্যাপক জনসংখ্যা পরিবর্তনের বিপক্ষেই থাকে। গতানুগতিকতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে তারা নিশ্চিত হতে চায়। সোজা রাস্তায় চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যে-রাস্তায় বাপ-চাচা-দাদারা চলাফেরা করেছেন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর কথা ধরা যাক। আমরা নানাভাবে সে রেনেসাঁর গুণকীর্তন করি। সেই ইউরোপীয় রেনেসাঁ কি সংখ্যাগুরুর আন্দোলন ছিল? না, তা ছিল না। সামান্য ক'জন মানুষই রেনেসাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সুতরাং সংখ্যাটাই বড় নয়। বড় হচ্ছে সময়। রেনেসাঁর সংখ্যালঘু নায়কেরা জয়ী হবার জন্য উপযুক্ত সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তেমনি উনিশ শতকে ভারতবর্ষের জন্য এক ক্রান্তিকালের শতক; সামন্তবাদী অর্থনীতি ও সামন্তবাদী সংস্কৃতির ধ্বংস এবং উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রসারের শতক। আঠার শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমেই হিন্দু সম্প্রদায়ের কতিপয় অভিজাত ও জমিদার সমাজ-পরিবর্তনের সে-সংকেত দেখতে পেয়েছিলেন এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন তাঁদের স্ববিরোধিতার কোনো অন্ত ছিল না। সে-স্ববিরোধিতাকে আজকের প্রগতিশীলরা যে-ভাবেই সমালোচনা করুন না কেন, তাঁদের সময় তাঁরাই ছিলেন প্রগতিশীল।

পক্ষান্তরে কলকাতা ও ঢাকায় মুসলিম আশরাফ ও জমিদার শ্রেণী সে-সমাজ পরিবর্তনের সংকেত ধরতে পারুন বা না-পারুন, তাঁরা সেদিন তাকে অস্বীকার করেছিলেন। যদি ধরতে পেরে অস্বীকার করে থাকেন, তাহলে বলতে হয় তাঁরা সেদিন

www.pathagar.com

স্বধর্মাবলম্বীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। আর যদি না-বুঝে অস্বীকার করে থাকেন, তাহলে বলতে হয় সেদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে আসীন হবার কোনো যোগ্যতাই তাঁদের ছিল না। উনিশ শতকের প্রথমে কেবল প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী হিন্দু নেতৃবৃন্দই নন, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অনেকেই ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন নারীশিক্ষার প্রতি।

পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজপতিরা সামগ্রিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। হাজার বছরের ধর্মীয় জ্ঞান ও ধর্মান্ধতার মধ্যে নাক ডুবিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ইংরেজি ভাষাকে হারাম ও বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে ঘৃণা করতেন এবং এ দু'টি আধুনিক ভাষা শেখা থেকে দূরে সরে থাকেন। তার ফলে তাঁদের উত্তরপুরুষদের হিন্দু সম্প্রদায়ের পিছনে পড়ে থাকার গ্লানি বহন করতে হয়েছে। কলকাতায় শতকরা ০.১ ভাগ অভিজাতশ্রেণী সমগ্র হিন্দু সমাজকে এগিয়ে দিয়েছিল। আর মুসলমান আশরাফ ও আলেম সম্প্রদায় মুসলমানদের পিছনে ঠেলে দিয়েছিল। কাজেই মুসলমানদের পশ্চাদগামিতার জন্য যদি কাউকে দোষ দিতে হয় তাহলে তাঁরা হচ্ছেন তৎকালীন মুসলিম সমাজপতি, আশরাফ, জমিদার, ধনিক শ্রেণী।

তাঁরা যে ভুল করেছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালে। যে ইংরেজি ভাষাকে তাঁরা হারাম বলে ঘোষণা করেছিলেন, আজকের বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সেই ভাষাটি আয়ত্তে আনার জন্য হন্যে হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। ইংরেজি ভাষায় দু'চার দশটা বাক্য বলতে পারলে জীবন ধন্য হয়েছে মনে করছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করে বাবা-মা নিজেদের জীবন সার্থক বলে ভাবছেন। আর যে বাংলা ভাষাকে তাঁরা সেদিন 'হিন্দুদের ভাষা' বলে ঘৃণা করতেন, এদেশের বাঙালি মুসলমান সেই ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে প্রাণ দিয়েছেন।

আজ অনেকেই সেদিনের মুসলিম আশরাফ শ্রেণীর অদূরদর্শিতার কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ঢাকার ইতিহাস লিখতে গিয়ে শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ইংরেজি শিক্ষার জনপ্রিয়তা আর ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ধীরে ধীরে ঢাকার জনগণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। এর ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তন হয়, তা হল ঢাকায় ইংরেজি-শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব, যারা আস্তে আস্তে উচ্চ পদে এবং ক্ষমতায় আসীন হয়। এই শ্রেণীটির বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল নতুন ধরনের। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত এ শ্রেণীটি ছিল একেবারেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুসলমানরা এই নতুন শিক্ষায় মোটেই অংশগ্রহণ করেনি বললেই চলে।'[৩৫] শরীফ উদ্দীন আহমেদ আরো বলেন, "তবে এটা ঠিক যে, মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষাকে অনিষ্টকর বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত যে, এই শিক্ষার ফলে তাদের সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা এবং

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাসে ফাটল ধরবে। উপরন্তু বাংলা ভাষা, যা ছিল প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম, তার প্রতিও তারা ছিল বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এই ভাষাকে তারা হিন্দুদের ভাষা বলে আখ্যায়িত করত।"

এই ধারণা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় বাংলার শহুরে মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে, যারা উর্দুতে কথাবার্তা বলতেন।"[৩৬] শরীফ উদ্দীন সিদ্ধান্ত টানেন যে, 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি মুসলমানদের এই গভীর আগ্রহ এবং ইংরেজি শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হয়।'[৩৭] মাহমুদ শামসুল হক বলেন, 'বাঙলায় নারীশিক্ষার যখন এই হাল তখন মুসলমান মেয়েদের অবস্থা ছিল নিদারুণ শোচনীয়। ধর্মহানির আশঙ্কায় তখন মুসলমান ছেলেরাই যেতো না মিশনারি স্কুলে। তারা বেথুন-বিমুখ হয়েছিল এজন্যে যে, সেখানে বাংলা শেখানো হয়; শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। সাধারণ্যেও প্রচারিত ছিল যে বাংলা হিন্দুদের ভাষা আর ইংরেজী কাফেরের বুলি। ... বস্তুত মুসলমানরা প্রায় স্বেচ্ছায় এই পশ্চাদ্‌পদতার শৃঙ্খলে জড়িয়েছিল।'[৩৮] এম. ফজলুর রহমান বলেন, 'এইসব বিদ্যাকেন্দ্রের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা তাঁদের (মুসলমান আশরাফ) একেবারেই মনঃপূত ছিল না।'[৩৯]

নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা থাকা ভাল। তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য চিন্তা ও কাজ করাকে কেউ কখনও খারাপ কাজ মনে করে না। কিন্তু তা যখন অন্য সম্প্রদায় ও তাদের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষাকে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করে তখনই তা সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য বিষে পরিণত হয়। তখন তা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের সে-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সারা উনিশ শতক জুড়ে মুসলমান সমাজপতিদের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিল। তাঁদের সে-সাম্প্রদায়িকতা মুসলমান সমাজকে ক্রমাগত পিছিয়ে দেয় এবং উনিশ শতকের শেষে তা ভয়াবহ রূপ নেয়। ১৮৭০-এর দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক এদেশে নিজেদের শাসন প্রলম্বিত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিতে থাকে; ঠিক সেই সময়ে এদেশে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আধুনিক রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ইংরেজ শাসক পশ্চাদৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করতে থাকে এবং হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, পার্থক্যের সে বোধ ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ঘটায়।

এদেশের নারীশিক্ষার ইতিহাস থেকে প্রমাণ হয় যে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায় আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে নি। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের বছরেও এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ করলে এ সত্য প্রকাশ পায়। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিক্য কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। প্রতিষ্ঠার বছরে, ১৯২১ সালে মোট ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৮ জন ছিলেন মুসলমান। এঁদের মধ্যে ৬ জনই আরবি ও ফার্সির

www.pathagar.com

শিক্ষক।[৪০] পনের বছর পর ১৯৩৫-৩৬ সালে এই সংখ্যা উন্নীত হয় ১২৪ জনের মধ্যে ২৪ জনে। এঁদের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন আরবি, ফার্সি ও উর্দু বিষয়ের এবং ৪ জন আইন ও শিক্ষা বিষয়ের। বিজ্ঞান ও অন্য আধুনিক বিষয়ে ৪৫ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান। ছাত্রদের মধ্যেও অনুরূপ ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছিল। ১৯২১ সালে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল মুসলমান ছাত্রের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। ১৯৩৭ সালে মোট ১৭৫৪ জনের মধ্যে মুসিলম ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৯৫ জন। অর্থাৎ তখনো হিন্দুরা সংখ্যায় প্রায় সাড়ে চারগুণ বেশি ছিল।[৪১]

দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় দলে দলে দেশ ত্যাগ করেছিল, ওপার থেকেও মুসলমানরা দলে দলে পাকিস্তানে এসেছিল। এই যাওয়া-আসায় পূর্ববঙ্গই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বেশি। কারণ ওপার থেকে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে শিক্ষা থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছিল। তাই এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, দেশভাগের ফলে এদেশ পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর। সেই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণের দায়িত্বও তাদেরই নিতে হয়। ফলে দেশভাগের পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা।

গত পঞ্চাশ বছরে দেশ শিক্ষার সে-ভগ্নাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি, বরং যত দিন গেছে, ততই শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। শুনলে অবাক হতে হয় যে, ১৯৪৭ সাল থেকে এদেশে কোন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ছাড়াই শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙা গাড়িটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে, কোন রকম জোড়াতালি দিয়ে, আমলাতন্ত্রের সহায়তায়। যত দিন যাচ্ছে সে-গাড়িটি ততই পুরনো হচ্ছে এবং আরও অচল হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। দিন দিন এদেশের শিক্ষা অজ্ঞানতার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র শিক্ষা পাওয়ার কোনো সুষ্ঠু রাস্তার সন্ধান দিতে পারে নি। অশিক্ষায়-কুশিক্ষায় জাতি আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সামগ্রিকভাবে আধুনিক শিক্ষা বিশেষ করে "নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃটিশ যুগে যেটুকু প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে, তার প্রায় সবক্ষেত্রেই হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টানদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হিন্দু নারীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য যেভাবে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন, মুসলিম সমাজে এঁদের মত বড় মাপের সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক দেরিতে।"[৪২] মানুষের জীবনে ও সমাজে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্ম মানুষের জীবন ও সমাজ নানাভাবে প্রভাবিত করে। ধর্মের সাথে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যেমন একটা যোগসূত্র আছে, তেমনি ধর্মের সঙ্গে নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নটিও জড়িত। তাই তো রোকেয়াকে বলতে শুনি' যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ় সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন।"[৪৩] এতক্ষণের আলোচনায় এটা প্রমাণ হয়েছে যে ধর্মান্ধতার কারণেই এদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়

www.pathagar.com

নারীশিক্ষা গ্রহণে ইতস্তত করেছে। হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান সম্প্রদায়ের চেয়ে ৬০/৭০ বছর আগে ধর্মান্ধতার সে গণ্ডি ভেঙে বের হয়ে আসার চেষ্টা শুরু করে। তাই তো ১৮৯৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে ৪৩ জন মেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হন, তাঁদের মধ্যে একজনও মুসলমান মেয়ের নাম নেই।[৪৪]

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রমাণ যে, বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ধ্বংসের বীজটি উনিশ শতকের গোড়াতেই রোপিত হয়েছিল। '৪৭-এর দেশভাগের পর শিক্ষাব্যবস্থার ওপর সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষটি চাপিয়ে দেবার পর আজ তা মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। এর থেকে উদ্ধারের সচেতন ও আন্তরিক মনোভাব কোনো সরকারই দেখাতে পারে নি। কারণ, তারা নিজেরাও অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত। শিক্ষার ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই। তাই আমাদের মনে হয় আধুনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ, বিজ্ঞানমনস্ক, ইহজাগতিক ও ধর্মান্ধতামুক্ত একটি শিক্ষাব্যবস্থাই কেবল পারে এ-অন্ধকার দূর করতে। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা পাওয়ার জন্য একটি প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক ও ইহজাগতিক সরকার গঠন অপরিহার্য। সেজন্য প্রয়োজন ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং অবিভক্ত বাংলার উনিশ শতকীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মতো আমাদের দেশেও একটি আন্দোলনের জন্ম দেওয়া। ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র সংগঠন পর্যায়ে যাঁরা একাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাদের সে-আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে ও পরতে পরতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. দেখুন, ইরফান হাবীব, মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা : ১৫৫৬-১৭০৭, কলকাতা, ১৯৮৫
২. ঐ, পৃ ১০
৩. Ghulam Murshid, *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization*. Rajshahi, 1983, p 15
৪. *বাংলাপিডিয়া*, ৯ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৩৪
৫. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ; ৩৩১
৬. সুশোভন সরকার, 'ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল', *ডিরোজিও*, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ১৯
৭ *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খণ্ড, পৃ ৯০
৮. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা : ইতিহাস ও নগরজীবন :* ১৮৪০-১৯২১, ঢাকা, ২০০১ পৃ ৬৫-৬৬
৯. ঐ, পৃ. ৬৬
১০. ঐ; ৬৬-৬৭; *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খণ্ড, পৃ ৯০
১১. Ghulam Murshid, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪
১২. ঐ, পৃ ৩৪
১৩. *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খণ্ড, পৃ ৯০
১৪. Syed Nurullah & J.P. Naik, *A Student's History of Education in India*, 1800-1847, New Delhi, 1951, p 121
১৫. *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খণ্ড, পৃ ৯০

www.pathagar.com

১৬. Ghulam Murshid. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮
১৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮১
১৮. ঐ, পৃ ৮২
১৯. ঐ, পৃ ৮২
২০. ঐ, পৃ ৮২
২১. ঐ, পৃ ৮৩
২২. Ghulam Murshid, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭
২৩. *Hundred Years of the University of Calcutta,* Calcutta, 1957, p. 121
২৪. ঐ, পৃ ১২২
২৫. *বাংলাপিডিয়া,* ৫ম খণ্ড পৃ ৯১
২৬. মাহমুদ শামসুল হক, *বাঙালি নারী,* ঢাকা, ২০০০, পৃ ২৮৩
২৭. ঐ, পৃ ২৮৪
২৮. ঐ, পৃ ২৮৪
২৯. Progress of Education In India 1892-93 to 1896-97, third Quinquennial Review by J. S. Cotton, 1898, p. 283
৩০. ঐ, পৃ ২৯০
৩১. ঐ, পৃ ২৮৬
৩২. ঐ, পৃ ২৮৯
৩৩. M. A. Rahim. *The History of The University* of Dacca, Dacca, 1981. pp 147-75.
৩৩ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৪ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা ২১১।
৩৪. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৪, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পৃ. ২০১
৩৫. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮
৩৬. ঐ, পৃ ৮৯
৩৭. ঐ, পৃ ৯
৩৮. মাহমুদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৮৩
৩৯. M. Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education,* ঢাকা, ১৯৭৩ উদ্ধৃত মাহমুদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৩
৪০. জাহেদা আহমেদ, 'রাষ্ট্র ও শিক্ষা', বাংলাদেশের ইতিহাস, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা,
৪১. ঐ, পৃ ১১৭

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়
নারীশিক্ষার স্থান : সমকালীন প্রেক্ষাপট

ড. শরিফা খাতুন

সূচনা

আজ বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার কথায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সোচ্চার। উন্নয়নশীল দেশগুলো নারী শিক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশও সমকালে নারীর সার্বিক উন্নয়ন তার ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করছে। জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষা পরিকল্পনায় নারীশিক্ষা বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ নারীর ক্ষমতায়ন অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা বড় চালিকাশক্তি। শিক্ষার আলোই তাকে অধিকার আদায়ের শক্তি যোগাতে পারে। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য শিক্ষার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধ, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও গৌরবময় করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম।

সমঅধিকার সংশ্লিষ্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ

আমাদের সংবিধান রাষ্ট্র ও সমাজের কর্মকাণ্ডে নারীর অবস্থান নির্ণয় ও অধিকার আদায়ের দিকনির্দেশক। নিচে উল্লিখিত বিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ থেকে নারীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার বিধানগুলো থেকে তা অনুধাবন করা যায়।

১০. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার ব্যবস্থা করা হবে।

১৪. রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতী মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তিদান করা।

www.pathagar.com

১৫. রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রম বৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত স্থানের দৃঢ় উন্নতি সাধন যাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

ক. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

খ. কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।

গ. যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যক্তি ও পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

১৯. ১. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।

২. মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করবার জন্য রাষ্ট্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৭. সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮. ১. কেবল ধর্ম গোষ্ঠী বর্ণ নারী পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।

২. রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন।

৩. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৪. এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই—

ক. নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে;

খ. কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায় হতে প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হতে;

www.pathagar.com

গ. যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে, পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

১৭ নং শিক্ষা বিষয়ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

খ. সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করার জন্য এবং যে জন্য প্রয়োজনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলো থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বিধানের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এসব নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা আইন প্রণয়ন ও বিধি করেছে। তথাপি নারী সাংবিধানিক অধিকার অর্জন ও ভোগ করার ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে আছে এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার।

নারীর অবমূল্যায়ন

নারী সম্পর্কে সমাজের ধারণা, অদক্ষ, অপর্যাপ্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নারীর অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে ধর্মীয় নেতাদের অপব্যাখ্যা, আইনের বিধানে সুস্পষ্টতার অভাব, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নারীর অংশগ্রহণের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব, সন্ত্রাসীদের প্রাধান্য, প্রচারমাধ্যমের দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে নারীর শোষণ, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, মেয়ে শিশু ও নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, নারীর বিকাশ ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা, নারীর প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব, নারীসত্তার অবমূল্যায়ন প্রভৃতি নারীকে অসহায় সামাজিক অবস্থানে স্থাপন করেছে। নারী নারী হওয়ার কারণে এবং সামাজিকভাবে দুর্বল অবস্থানের জন্য মূলত গৃহকর্মে বা অবাজারজাত কর্মে আবদ্ধ। গৃহকর্ম সংসারের জন্য অর্থ আনে না। এই কারণে পরিবারে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা নূন্যতম।

বিভিন্ন শিক্ষা দলিলে নারী শিক্ষার স্থান

নারী স্বাধীনতা, উন্নয়ন ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের ক্ষেত্রে এবং সংবিধানে উল্লিখিত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভে তার বড় হাতিয়ার হল শিক্ষা, শিক্ষার আলোই তার যোগ্যতা অর্জন ও সার্বিক বিকাশে

www.pathagar.com

সহায়ক। শিক্ষা সকল মানুষের জন্য প্রয়োজন। মানবজীবনের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য। আমাদের সমাজের নারীদের সর্বক্ষেত্রে অবস্থান পেছনে বলে তাদের বিকাশের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার প্রশ্নটা আলাদাভাবে উত্থাপিত হচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও শিক্ষা পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট নারী উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নারী বিষয়ে গৃহীত নীতি ও কার্যক্রম বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন বিষয়টির প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে দুটি শিক্ষা কমিশন ও কতিপয় শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে। এসব দলিলের রিপোর্ট ও সুপারিশের ভিত্তিতে পার্লামেন্টে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ গৃহীত হয়। নিচে এসব দলিলের নারী শিক্ষা বিষয়ক ধারণা ও সুপারিশ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পূনর্গঠনের জন্য ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিটি ১৯৭৪ সালের ৩০ মে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে সুচিন্তিত সুপারিশ সম্বলিত এক রির্পোট পেশ করে। কমিশনের নারী শিক্ষা বিষয়ক বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

নারী শিক্ষা বিষয় আলোচনার শুরুতে কমিশন বক্তব্য রাখেন : 'সমাজে সব মানুষের সকল বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ গৃহের মান ও পরিবেশ উন্নত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য নারী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। শিশু চরিত্র অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয় মাতৃপরিবেশে। অথচ মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে কখনোই পুরুষদের শিক্ষার সমান গুরুত্ব অর্জন করেনি। শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে পাথেয় করে সংসার জীবন নির্বাহ করে। অনতিবিলম্বে অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। নারী শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের রিপোর্টে নিম্নের কতিপয় সুপারিশ করা হয় :

১. মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে ১ মাইলের কম দূরত্বের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করতে হবে। নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
২. মেয়েদেরকে শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য প্রাথমিক স্তরে অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এর জন্য পিটিআইনগুলোতে অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৩. মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা স্কুলে শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অধিক হারে মেয়েরা লেখাপড়া করবে।
৪. মেয়েদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
৫. শিক্ষাদান ও প্রশাসন উভয়ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রির্পোট গৃহীত হয়নি। অবশ্য এসব সুপারিশ পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এরপর ১৯৭৮ সালে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। এই কমিটির বিপোর্টে নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত পক্ষে দু'জন মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো নারীর বিরুদ্ধে যাবতীয় কুসংস্কার বিলোপের লক্ষ্যে স্কুলের পাঠ্যসূচিতে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

এরপর ১৯৮৭ সালে উপাচার্য অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। কমিশন প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করে। প্রয়োজন হলে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে বলে। মেয়েদের উচ্চাশিক্ষা লাভে উৎসাহ ও সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। মেয়েদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও অধিক সংখ্যক চাকরির সুযোগ সৃষ্টির কথাও কমিশন উল্লেখ করেছে যাতে তারা পড়াশোনায় উৎসাহ বোধ করে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ওপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করে।

চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, আইন প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও অধিক পরিমাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করার সুপারিশও কমিশন করেছে। তবে এই কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৬ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে কমিটি তার রিপোর্ট সরকারের নিকট জমা দেন। এরই ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়।

কমিটির নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন ও সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ। অনুচ্ছেদের শুরুতে বলা হয়েছে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে। নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশু যত্নের ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক জাতীয় উন্নয়নে নিষ্ক্রিয় রাখা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবণতা দূর করতে হবে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রেখেছে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল, জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেতন হয়ে ওঠে।

কমিটির রিপোর্টে নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন, সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠন, যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ করা। যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে ততদিন পর্যন্ত সমাজ থেকে যৌতুক ও নারী নির্যাতনের মতো অপরাধ রোধ করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না।

সমাজে নারী বিষয়ে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি ও সুশীলতা বিকাশে শিক্ষাস্তরের প্রথম থেকেই কমিটি ছেলে ও মেয়ের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার কথা বলেছেন। কিন্তু কমিটি মাধ্যমিক স্তরে নারীর বিষয়ে সংবেদনশীলতাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি।

বাংলাদেশের নারীর নিগৃহীত অবস্থান, সে ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা জেন্ডারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব না আরোপ করায় প্রাথমিক স্তরের অর্জন নস্যাৎ হতে পারে—সে আশঙ্কা রয়েছে।

অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা বিষয়ে কমিটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। এই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন্স স্টাডিজ নামে আলাদা বিভাগ খোলার সুপারিশ করেছে। তাছাড়া সিডো সনদের বাস্তবায়নের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণসহ নারীশিক্ষা সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি, উন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত মতামত দিয়েছে।

এবারই বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট সরকারিভাবে গৃহীত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট বিভিন্ন সমাবেশে আলোচনা ও জনমত যাচাইয়ের ভিত্তিতে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০০০ হিসেবে গৃহীত হয়।

এই নীতিতে নারী শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়েছে এবং নারী শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য কমিটির সুপারিশের আলোকে নিম্নে উল্লিখিত কৌশলসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :

১. নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
২. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ঝরেপড়া ছাত্রীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।
৩. খণ্ডকালীন বৃত্তিমূলক এবং নারী শিক্ষার বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি নজর দিতে হবে।
৪. অধিক সংখ্যক মেয়েদের শিক্ষার আওতায় আনতে হলে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা ও পেশাদারি শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী করে তোলার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের পাঠ্যসূচিতে যথার্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচিতে আনতে হবে। যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরো অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচিত লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষ সকলের পুরো স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং সকল বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

৮. মেয়েদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের সুবিধার জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৯. ছাত্রীদের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার জন্য সহজ যাতায়াত ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. বিজ্ঞান ও বিভিন্ন পেশার শিক্ষায় (যেমন প্রকৌশল, মেডিক্যাল, আইন, কারবার ইত্যাদিতে) অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের উৎসাহিত করতে হবে।

১১. উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং মূল সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়ণ হলে শিক্ষা নারীর বিকাশে উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের শিক্ষার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। এই নীতিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশল মেয়ে ও ছেলে শিশু বিকাশের অনুকূল হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি ও কৌশলগুলো উদার ও সাধারণভাবে সকলের জন্য একই প্রকারের হয়েছে। এই স্তরের শিক্ষায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা ফুটে ওঠেনি। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও। নারীর প্রতি সংবেদনশীলতার ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মহিলা নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। শিক্ষানীতির কৌশলে ও বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কার্যসূচিতে নারীর বিবিধ সমস্যা এর কারণ, প্রতিকারের প্রতিবন্ধকতা এবং তা কিভাবে প্রতিকার করা যায়—এসব দিক অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় শিক্ষানীতিকে আরো কার্যকর করা যায়। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীশিক্ষা নীতি ও কৌশল বলিষ্ঠ ও বাস্তব। তবে সমাজে নারীর বিষয়ের প্রতি সংবেদনশীলতা সৃষ্টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নয়ন ও কৌশলগুলো বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ।

www.pathagar.com

নারী শিক্ষার বর্তমান চিত্র

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য কতিপয় শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। সব কয়টির রিপোর্টে মেয়ে শিশু ও নারী শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্টগুলোর সুপারিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহীত হয় নি। যেগুলো গৃহীত হয়েছে সেগুলোও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। তবে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে সরকারের গৃহীত কার্যসূচি সরকারের প্রণীত আইন ও বিধির ফলে মেয়েদের শিক্ষার অনেক অগ্রগতি হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে। সাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার বাংলাদেশের নারীশিক্ষার নীতি ও কার্যসূচি গ্রহণে যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তার পেছনে কাজ করেছে পৃথিবীব্যাপী নারী অধিকার, নারীর স্বাধীনতা, নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের শ্লোগান। মেক্সিকোতে ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ঘোষণা, ১৯৭৬-৮৫ সালে জাতিসংঘের নারী দশক পালন, ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কনভেনশন, ১৯৮৫ সালে নাইরেবিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন বাংলাদেশে নারী বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এসব আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের নারী সমাজকে নিজ অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অধিকতর সজাগ ও সচেতন করেছে।

আমাদের দেশে '৯০-এর দশক থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু ও নারীর অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে জমতিয়েনে 'সবাইর জন্য শিক্ষা' বিষয়ক সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। এই সালেই বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাস হয়। পরের দুই বছরে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন ও তা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যেমন প্রতি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা, অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, বিনা বেতনে শিক্ষা, বিনামূল্যে বই সরবরাহ ও স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক স্কুলে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পায়।

মাধ্যমিক স্কুলেও ছাত্রীভর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে শহর এলাকার বাইরের স্কুলগুলোতে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। স্কুলের ভৌত পরিবেশ উন্নয়নের জন্য টিউবওয়েল এবং মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি। এই কার্যক্রম থেকে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ার প্রেক্ষিতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে শিক্ষাদানের কার্যক্রম গৃহীত হয়। তবে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন মেয়ে ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে করতে পারবে না—এই শর্ত পালন সাপেক্ষে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া ছাত্রী সংখ্যা

www.pathagar.com

বৃদ্ধির সাথে সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যান বেইজ) ২০০০ সালের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে দেশের সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড ও নন রেজিস্টার্ড প্রাথমিক স্কুলগুলোতে মোট ১, ৭৬, ২১, ৭৩১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে ৮৫, ৫৬, ৭১২ জন ছাত্রী। এই সংখ্যা প্রাথমিক স্কুলে গমন উপযোগী মোট মেয়ে সংখ্যার ৯৪·১৪ শতাংশ। একই বছরে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৬, ৯৮, ৫০৪ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ৩, ৯৬, ৭৭৫ জন। অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর ৫৬, ৮% শতাংশ ছাত্রী। উক্ত সালে মাধ্যমিক স্কুলে ৬৬, ৮১, ২১২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫, ৪২, ১৫০ জন ছাত্রী। ছাত্রী সংখ্যা মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার ৫৩% শতাংশ। মাদ্রাসায়ও একই সালে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪০% শতাংশ ছাত্রী। এই তথ্য থেকে বলা যায় স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার ছাত্রীভর্তির বর্তমান চিত্র আশাব্যঞ্জক।

সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৯৯৯ সালে ভর্তিকৃত ৭৬, ৫৩৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫, ১৬৩ জন অর্থাৎ ২০% শতাংশ ছাত্রী। তবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে। একটি মাত্র পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৯৯৯ সালের তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৪৩ জন মহিলা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৬৭৬ জনের মধ্যে ৭৫৫ জন মহিলা এবং শাহ্‌জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫৮ জন মহিলা শিক্ষার্থী। উচ্চ শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশের নারীশিক্ষার ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনায় এ সংখ্যা আশাব্যঞ্জক ভূমিকা রাখবে।

উপসংহার

শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের চিত্র থেকে দেখা যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে তাদের অংশগ্রহণের হার আশাব্যঞ্জক, উচ্চ শিক্ষায় আশাব্যঞ্জক না হলেও ইতিবাচক। এদের বাদ দিয়ে বলা যায় বাংলাদেশের নারী সমাজের বিরাট অংশের অবস্থা করুণ ও শোচনীয়। এদের অধিকাংশই গ্রামীণ নারী সমাজ, ভূমিহীন ও শ্রমজীবী আর শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠী। এরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার।

যতদিন পর্যন্ত এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত না করা যায় এবং তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা না যায় এবং এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন না হয় ততদিন পর্যন্ত দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। নারীশিক্ষা উন্নয়ন, প্রসার ও নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূলে নিচে কিছু সুপারিশ করা হল :

www.pathagar.com

১. সমাজে নারীর প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নারীর সংবেদনশীলতা বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার কার্যক্রমে ও পাঠ্যসূচিতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা থাকতে হবে।

২. মেয়ে ও নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে গ্রাম ও মফস্বল এলাকায় যাতায়াত, আবাসিক ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। আর্থিক কারণেও অনেক মেয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রবর্তন, আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষায় আকৃষ্ট করতে হবে।

৩. নারীর উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসারের জন্য জাতীয়ভাবে নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি উদ্যোগকেও এসব কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার রোধ করার জন্য স্থানীয় এলাকায় বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সরকারি, বেসরকারিভাবে এবং এনজিওদের উদ্যোগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

৬. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও অন্যান্য পেশাগত শিক্ষায় মেয়েদের অধিক হারে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

৭. নারীশিক্ষা উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৯. নারী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালী করতে হবে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মহিলা সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বিত করতে হবে যাতে পরিকল্পনা ও সম্পদের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হয়।

তথ্যসূত্র

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত
২. রাশিদা বেগম 'আমাদের শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার অবস্থান' বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সম্পাদনা হোসনে আরা শাহেদ ২০০২.
৩. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট—১৯৭৪
৪. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৫. BANBEIS (২০০০) : Bangladesh Educational Statistics, 2000 'Ministry of Education Dhaka 2000
৬. পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা ১৯৯৮

www.pathagar.com

৭. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭ প্রতিবেদন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, ১৯৯৭

৮. মুঃ সিরাজুল ইসলাম, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০। শিক্ষাবার্তা, চতুর্দশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা জুলাই ২০০১

৯. Sharifa khatun, inequalities, Disparities and Education : Bangladesh situation paper presented in the South Asian Conferenace on Education November 14-18, 1999, Department of Education University of Delhi, Delhi, India.

১০. Sharifa khatun, "State of Pre-University Education, 1971-2000" Bangladesh on the threshold of the Twenty First Century (edited), Asiatic Society of Bangladesh. Dhaka, 2002

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম

আবদুল মালেক

উনিশ শতকের শেষ ভাগের মধ্যে উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের নানারূপ ফলাফল প্রতিফলিত হয়। শত শত বছরের একমাত্রিক সমাজ প্রবাহের অধিকারী এশীয় সমাজে পরিবর্তনের নানাবিধ ধারা সৃষ্টি হয়। বাঙালি সমাজেরও সাধিত হয় কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কার। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় বাঙালি হিন্দু সমাজে পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য ধারা সূচিত হয়। গড়ে ওঠে 'আত্মীয়সভা', 'ইন্ডিয়ান ল কমিশন', 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'ইয়ং বেঙ্গল', 'ইন্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন' প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। বাঙালি মুসলমান সমাজ তখনও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি' এবং 'ন্যাশনাল মহমেডান এসোসিয়েশন'। কিন্তু এসব মনীষী ও তাঁদের গড়া প্রতিষ্ঠান বাঙালি মুসলমান সমাজে তেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি, যেমন পেরেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙালি হিন্দু সমাজে।

অনেকে এসব ঘটনাকে বাঙালি সমাজের 'রেনেসাঁস' হিসেবে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় 'রেনেসাঁস'-এর মানদণ্ডে তা বলা চলে না।[১] এসব সংস্কারের ফলাফল তখনও আপামর জনসাধারণের দুয়ারে পৌঁছেনি। হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালি সমাজে যে 'কৌলিক সংকীর্ণতা' বিদ্যমান ছিল তার মাত্রা তখনও তেমনভাবে কমে আসেনি। বিশেষত নারী পরাধীনতার প্রকট রূপটিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া তেমন লাগেনি। বাঙালি মুসলিম সমাজে এ ক্ষেত্রটি শত শত বছরের রীতি—প্রথার কঠিন-কঠোর আবরণ দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এমনি কৌলিক ও সামাজিক পরিবেশে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (যিনি বেগম রোকেয়া নামে সমধিক পরিচিত) ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার এক মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

১. বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৫

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়ার পৈতৃক পারিবারিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশ থেকে তৎকালীন বাঙালি অভিজাত মুসলিম সমাজের প্রকৃতি বহুলাংশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেগম রোকেয়া তাঁর রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামের পিতৃগৃহের পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ির তুলনা কোথায়? সাড়ে তিনশত বিঘা লা-খেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটী। বাড়ির চতুর্দিকে গভীর বন, তাহাতে বাঘ, শূকর, শৃগাল—সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা 'ঘু-ঘু', 'বউ কথা কও', 'ও খুকি ও খুকি', 'চোখ গেল' প্রভৃতি পাখির ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের 'হুয়া হুয়া ক্যা হুয়া' শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি, মাগরেবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাতিকালে কুরুয়া পাখীর 'কা-আক্-কা-আক্-কু ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি, এখন রাত্রি তিনটি।"[২] বাড়ির প্রাকৃতিক ও জড় পরিবেশের এরূপ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিল সামাজিক পরিবেশ। ঘনীভূত অবরোধ প্রথা ছিল এ সামাজিক পরিবেশের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বেগম রোকেয়া লিখেছেন, " ... সবেমাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়েমানুষের অবাধ গতি—অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ির কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণভয়ে যত্রতত্র—কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরানীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।"[৩] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, "বাচ্চাওয়ালী মুরগি যেমন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহার ছানাগুলো মায়ের পাখার নিচে পলায়, আমাকেও সেইরূপ পলাইতে হইত। কিন্তু ছানার ত মায়ের বুকস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট আশ্রয় থাকে, তাহারা সেইখানে পলাইয়া থাকে; আমার জন্য সেরূপ কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থান ছিল না। আর মুরগির ছানা স্বভাবতঃই ইঙ্গিত বুঝে—আমার ত সেরূপ কোন স্বাভাবিক ধর্ম (instinct) ছিল না। তাই কোন সময় চোখের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরব্বিগণ, 'কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ' ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।।"[৪] সামাজিক পরিবেশের এই যে অবরুদ্ধ অবস্থা তা শুধু রোকেয়ার পিতৃ-পরিবারে ছিল না, মুসলিম সমাজের সর্বত্র বিশেষ করে আশরাফ মুসলমান সমাজে বিরাজমান ছিল। এক্ষেত্রে রোকেয়ার আর একটি বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে কলিকাতা থাকাকালীন আমার দ্বিতীয়া ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ি—বোহার হইতে দুইজন

২. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৯৫-১৯৬
৩. ঐ, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯
৪. ঐ পৃ. ৪৮৯

www.pathagar.com

চাকরানী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের 'ফ্রী পাসপোর্ট ছিল'—তাহারা সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণভয়ে পলায়নমান হরিণ শিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্রতত্র—কপাটের অন্তরাল কিম্বা টেবিলের নিচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটি নির্জন চিল-কোঠা ছিল; অতি প্রত্যূষে আমাকে কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত; প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। বোহারের চাকরানীদ্বয় সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে সেই চিল-কোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সমবয়সী ভগিনী-পুত্র, হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্য, সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল, আমি সেই ছাপরখাটের নিচে গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম—ভয়, পাছে আমার নিঃশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়হীন স্ত্রীলোকেরা খাটের নিচে উঁকি মারিয়া দেখে। সেখানে কতকগুলো বাকস্-পেটারা, মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু তাহার (৬ বৎসর বয়সের) ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেইগুলো টানিয়া আনিয়া আমার চারিধারে দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল। আমার খাওয়ার খোঁজ খবরও কেহ নিয়মমত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিল-কোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকেই ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা 'বিন্নি' (খই বিশেষ) আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না—ছেলেমানুষ ত, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।"[৫]

এ অবস্থায় সমাজে নারীর জীবনযাপন সম্পূর্ণতই ছিল আরোপিত। অর্জিত গুণের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করার তেমন সুযোগ ছিল না। এমনকি, মেয়েদের পছন্দ অনুযায়ী লেখাপড়ার সুযোগ ও অধিকার ছিল না সেখানে। অভিভাবকেরা উর্দু, ফার্সি ও আরবি পড়ার অনুমতি দিলেও মাতৃভাষা বাংলা পড়ার অনুমতি দিতেন না। রোকেয়া উল্লেখ করেছেন, " ... আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফার্সি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।"[৬] বেগম রোকেয়ার পিতাও মেয়েদের বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন।[৭]

এরকম বদ্ধ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বেগম রোকেয়া নিজেকে এর বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাথে সাথে নিজের মধ্যে আত্মসচেতন সত্তা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আর "আত্মসচেতন সত্তামাত্রই বড় কোন ক্ষেত্র, উচ্চতর কোন কোন আদর্শের জন্ম দিতে চায়।"[৮] এ জাতীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই নানা ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কারণ তাঁরা কৌলিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন নিজেদের সামাজিক পরিমণ্ডল ভেদ করে, নিজেদের জাতি ও শ্রেণীগত-অবস্থান অতিক্রম করে সমাজে আপনাপন ভূমিকা

৫. ঐ, পৃ. ৪৮৯-৯০
৬. উদ্ধৃতি, মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৯
৭. শামসুন নাহার মাহমুদ, *রোকেয়া জীবনী*, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ১৮
৮. বেগম আকতার কামাল, 'রোকেয়া-মানসের মূলসূত্র', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৩৫ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩

www.pathagar.com

নির্ধারণ করে নেন। বস্তুত "নিজ নিজ শ্রেণীর ভাবাদর্শে প্রত্যেকের ব্যক্তিমানস গড়ে উঠলেও, যে মানস পরবর্তী ধাপে সময়ের অগ্রসর চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে নিজের সত্তাকে যুক্ত করে নেয়, সেই মানসই ইতিহাস রচনা করে। বেগম রোকেয়া এরকমই একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তা।"[৯]

বেগম রোকেয়ার যে ব্যক্তিমানস তার কেন্দ্র ছিল সমাজ। সমাজ এবং তার কল্যাণসাধন করাই ছিল তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মের লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে তিনি নারী-কল্যাণের কথা বেশি করে ভেবেছেন। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা সবার উপরে তুলে ধরেছেন। নারীর মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। এখানে তাঁকে লিঙ্গকেন্দ্রিক এক সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে দোষারোপ করা চলে না। নারী গোত্রের একজন হিসেবে নিজের সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে নারীর প্রতি তাঁর সহমর্মিতা স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছে। সমাজে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধকতা তাঁকে অহরহ পীড়া দিয়েছে। অবরোধপ্রথাকে তিনি সমাজে নারীর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সবচেয়ে বড় বাধা বলে চিহ্নিত করেছেন। বাঙালি সমাজে, বিশেষত বাঙালি মুসলিম সমাজে এ বাধার কারণে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা যথাযথ স্থান লাভ করতে পারছে না বলে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সর্বনাশ এ অবরোধ প্রথার কবল থেকে নারীকে রক্ষা করে সুস্থ ও বলিষ্ঠ এক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই ছিল তাঁর সামগ্রিক চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দু।

বেগম রোকেয়ার জীবৎকাল (১৮৮০-১৯৩২) বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথম দশকে তাঁর সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের উত্থান ঘটে। তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রসারও ঘটে এ সময়ে। তখন থেকেই তিনি লেখিকা, সমাজকর্মী, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি নানামুখী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি আধুনিক, বাস্তববাদী, যুক্তিসিদ্ধ ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন সুস্পষ্টভাবে।

বাঙালি নারীর, বিশেষত বাঙালি মুসলিম নারীর মুক্তিসাধনই ছিল বেগম রোকেয়ার আরাধ্য বাসনা। নারীশিক্ষার বিস্তারকে তিনি এক্ষেত্রে চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করেন। আর এ কাজকেই তিনি তাঁর জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এজন্য মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে তিনি জীবনের বেশির ভাগ কর্ম-সময় ব্যয় করেছেন। তবে এ কর্তব্যকাজের উৎসভূমিটি নিহিত রয়েছে তাঁর সাহিত্যচর্চার মধ্যে। তিনি সুদীর্ঘ তিন দশক কাল সাহিত্যচর্চা করেন। তেইশ বছর বয়সে এর যাত্রা শুরু হয় এবং মৃত্যুর আগের রাত্রি পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ সময়কালে তিনি পাঁচটি গ্রন্থ, ষোলটি প্রবন্ধ, ছয়টি ছোট গল্প ও রস রচনা এবং সাতটি কবিতা লেখেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চা নিছক সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে হয়নি। তারও মূল দিক ছিল সমাজ তথা নারী সমাজের হিতসাধন। "বাঙালি, বাঙালি মুসলমান, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ; তাঁর ভাবনাশীলতা এইসবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ইস্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা : এইসব তাঁর কর্মের পরিধি। আর লেখিকা হিসাবে গল্প, কবিতা-

৯. ঐ, পৃ. ৪৩

www.pathagar.com

উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেইসবের মধ্যে দিয়েও একটি উৎকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে : নারীজাগরণ তথা সমাজহিত।"[১০] বস্তুত শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নারীর সামাজিক উত্তরণের যে ব্রত রোকেয়া গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অনুষঙ্গ হিসেবে তিনি সাহিত্যকর্ম করেছিলেন। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।"[১১] বেগম রোকেয়ার লেখা প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদির ভাব ও প্রকরণ বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, "অন্য উদ্দেশ্যে নয়ই, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যও নয়, রোকেয়া লিখেছিলেন 'দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন' করবার জন্য।"[১২]

বেগম রোকেয়ার জীবৎকালের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্মের প্রকৃতি এবং পরিধি নিজের সামগ্রিক জীবনবোধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এজন্য তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাঁর জীবন পরিসরের কালক্রমিক পর্যালোচনা প্রয়োজন।

রোকেয়ার জীবনে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রাম ও কলকাতা শহর এবং বিহারের ভাগলপুর বিশেষভাবে জড়িত। পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত ১৬ বছর কেটেছে। এ জীবনে তিনি অনেক কিছু হারিয়েছেন, আবার অনেক কিছু পেয়েছেন। পিতৃ পরিবারের রুদ্ধ পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। আবার এর মধ্যেই তিনি তাঁর বড় ভাই ইবরাহিম সাবের এবং বড় বোন বেগম করিমুন্নেসার সহায়তা ও অনুপ্রেরণায় আধুনিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে আলোর সন্ধান পান। এ আলোই তাঁকে ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

সার্বিক বিচারে একথা বলা চলে যে, বেগম রোকেয়ার জীবনের প্রধানতম যাত্রা শুরু হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিয়ের পর বিহারের ভাগলপুরে। একজন চিন্তাবিদ, লেখিকা এবং শিক্ষাব্রতী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে এখানেই। এক্ষেত্রে তাঁর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের প্রেরণা ও সহায়তা প্রধান 'অবলম্বন' ছিল। এ-সময়ে বেগম রোকেয়ার লেখা 'নিরীহ বাঙালি' নামক প্রবন্ধটি সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকায় ১৩১০ সনের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম রচনা। এ পত্রিকায় পরপর তাঁর আরও কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা 'বোরকা', 'স্ত্রীজাতির অবনতি', 'গৃহ' ও 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধগুলো এ পত্রিকায় যথাক্রমে ১৩১১ সনের বৈশাখ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। এগুলোর

১০. আবুদল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া,* ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১০
১১. উদ্ধৃতি, ঐ, পৃ. ৮৮
১২. ঐ, পৃ. ৮৮

www.pathagar.com

সাথে 'পিপাসা' ও 'সুগৃহিণী' নামে আরও দু'টি প্রবন্ধ নিয়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'মতিচুর' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া নারীর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য নারীকে যে বৈরী সামাজিক ফলাফল ভোগ করতে হচ্ছে সে বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বস্তুত জীবনের এ পর্যায়েই শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তার কাঠামোটি সৃষ্টি হয়ে যায়। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তা-মানস বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়। "বেগম রোকেয়া যদি আর কিছু না-ও লিখতেন, শুধু এই প্রবন্ধটি ছাড়া, আমরা এখানেই নারী-শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তার সংবাদ পেয়ে যেতাম।"[১৩] নারীর শিক্ষার প্রশ্নে তিনি নারীর সামাজিক অবস্থান, অধিকার ও মর্যাদার কথা তুলেছেন। "প্রথমেই শিক্ষার প্রসঙ্গটা আসেনি, এসেছে সমাজে নারীর অবনতির এক ভয়াবহ বর্ণনা। নারীকে চিত্রিত করা হয়েছে দাসী হিসাবে।"[১৪] এই দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্তি দেওয়াই ছিল রোকেয়ার শিক্ষাচিন্তার লক্ষ্য। এসময় নারী জাগরণের চিন্তা তার মধ্যে কতখানি ঘনীভূত হয়েছিল তা বুঝা যায় তাঁর Sultana's Dream (১৯০৮) রচনা থেকে। নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর পরম দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে এতে।

ভাগলপুরেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়টি ঘটে। তা হলো ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে তাঁর স্বামীর মৃত্যু। স্বামীর মৃত্যু তাঁর জীবনকে উলট পালট করে দেয়। কিন্তু তিনি পরাজিত হননি। ইতোমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর মূল লক্ষ্য সাধনের দিকে ধাবিত হন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নারীশিক্ষা বিস্তারই ছিল বেগম রোকেয়ার জীবনের প্রধান কর্তব্য কাজ। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরেই (অক্টোবর, ১৯০৯) তিনি ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাকে তিনি গতানুগতিক দৃষ্টিতে শুধু চাকরি লাভের উপায় হিসেবে দেখেননি। শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন মানুষের অন্তর্জাত শক্তির বিকাশের 'উপায়' হিসেবে। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ অনুরকণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাস করা বিদ্যা'-কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।"[১৫] শিক্ষার মাহাত্ম্য তুলে ধরতে

১৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, 'বেগম রোকেয়া : নারী-শিক্ষা', *প্রণোদনা,* বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ১৮
১৪. ঐ, পৃ. ১৮
১৫. *রোকেয়া রচনাবলী,* পৃ. ২৭

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেন, "যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal); কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুতকরণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর, কয়লার দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন ভগিনি! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব?"

নারীকে তিনি এই 'প্রকৃত শিক্ষায়' শিক্ষিত করার কথা চিন্তা করেন। আর এজন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমাদের শয়ন-কক্ষে যে সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল-কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি?"[১৭] নারীর জন্য দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ১লা অক্টোবর) তিনি ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের কল্যাণসাধনের তীব্র বাসনা নিয়ে তিনি যা প্রতিষ্ঠা করেন তার সপক্ষে সমাজের কাছ থেকে তেমন সাড়া পেলেন না। অভিভাবকরা তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। তা সত্ত্বেও তিনি মনে অটুট বল রেখে তা পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু অনাহূত এক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভাগলপুরে তাঁর পক্ষে বসবাস সম্ভব হলো না। তাঁর স্বপত্নীকন্যা ও জামাতা এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। ফলে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি বিহারের ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় আসতে বাধ্য হন। বাকি জীবন তিনি কলকাতাতে অতিবাহিত করেন।

কলকাতায় আগমন তাঁর জীবনের পক্ষে শুভই হয়েছিল। এখানেই তাঁর সুপ্ত প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল।[১৮] রোকেয়ার সাহিত্যকর্মের বড় অংশই কলকাতাতে সম্পন্ন হয়। মতিচুর (২য় খণ্ড), পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি কলকাতায় বসে রচনা করেন। শিক্ষাকর্মের প্রায় সবটুকুই পরিচালিত হয় কলকাতায়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ তারিখে ভাগলপুর থেকে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' কলকাতার ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে স্থানান্তর করেন। কলকাতায় স্কুলটি মাত্র আটজন ছাত্রী ও দু'খানা বেঞ্চ নিয়ে শুরু হয়। পরবর্তীকালে ছাত্রীসংখ্যা বাড়ায় এ গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ মে তারিখে স্কুলটি ১৩নং ইউরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনে সরানো হয়। ১৯১৫

১৭. ঐ, পৃ. ২৭
১৮. মোতাহার হোসেন সুফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দের শুরুতে স্কুলটি উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং বছরের শেষে ছাত্রীসংখ্যা ৮৪-তে দাঁড়ায়। ছাত্রীসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকায় ১৯১৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এ স্কুল ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডের ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়।[১৯] ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ১০৫-এ পৌঁছায়।

কলকাতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই রোকেয়া শিক্ষাবিস্তার কর্মের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণে দীর্ঘদিন যাবত তাঁর সাহিত্যচর্চায় বিরতি ঘটে। লক্ষ করা যায় যে, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 'Sultana's Dream' প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ ব্যবধানে 'মতিচুর' (২য় খণ্ড) ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ সময় নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রসারের গুরু দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তাঁকে সামনের দিকে এগুতে হচ্ছিল। আর্থিক সংকট যেমন বড় বাধা ছিল, তেমনি সামাজিক নিন্দা-বিদ্রূপকেও মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তাঁকে ধৈর্যের পরম পরীক্ষা দিতে হয়। স্কুলের জন্য তাঁর স্বামী প্রদত্ত দশ হাজার টাকা যে ব্যাংকে (বার্মা ব্যাংক) গচ্ছিত রাখেন সে ব্যাংক ফেল করায় সমস্ত টাকাই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। সে সময় তাঁর যে দু'চারজন শুভাকাঙ্ক্ষী সহকর্মী ছিলেন, এ ঘটনায় তাঁরাও নিরাশায় ভেঙে পড়েন। কিন্তু তিনি পরাজয় স্বীকার করে নেননি কখনও। এসময় তিনি নিজের টাকা থেকে ত্রিশ হাজার টাকা বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। বিদ্যালয়ের পরিচালিকা হিসেবে তাঁর যে মাসোহারা বরাদ্দ ছিল সেটাও তিনি কোনদিনই নেননি।[২০] প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের অনুকূলে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি তেমন একটা পাননি। স্কুল প্রতিষ্ঠার বছরখানেক পরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাস থেকে মাসিক ৭১ টাকার সরকারি সাহায্য জোটে। বহু চেষ্টার পর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে এ সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় মাসিক ৪৪৮ টাকায়। সে সময় মাসিক পৌনঃপৌনিক ব্যয় ছিল ৬০০ টাকা। সরকারি সাহায্যের অতিরিক্ত ১৫২ টাকা প্রতিমাসে সংগ্রহ করার জন্য তাঁকে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতে হতো।[২১] তাঁর চাচাতো বোন বেগম মরিয়ম রশীদকে লেখা একটি চিঠি থেকে তা বুঝা যায়। এ চিঠির এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, "তোমার প্রেরিত কাসন্দ পেয়ে খুশী হয়েছি। বুয়া। তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফান্ডে চার পাঁচটা টাকা পাঠাতে তাতে আমি বেশী সুখী হতুম। এক ব্যক্তি সুদূর রেঙ্গুন থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন—গত মাসে ২৭ পাঠিয়েছিলেন। এবার ৬৯ পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার আপন লোক হয়ে স্কুলটাকে ভুলে থাক।"[২২]

বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তাঁকে প্রতিনিয়ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়েছে। সাথে সাথে সমাজের বিদ্রূপকে হজম করতে হয়েছে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর ঐ চাচাতো বোনকে লেখা রোকেয়ার চিঠির একটি অংশ থেকে তা আন্দাজ করা যায়।

১৯. ঐ, পৃ. ৩৫
২০. মোশফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া* পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৪
২১. মুহাম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওাত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৫
২২. মোশফেকা মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

www.pathagar.com

তিনি লিখেছেন, "চিঠি না লিখবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতেই পারো এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ি, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি সবদিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কিনা তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে। এই যে হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুনি ইহার বিনিময় কি, জানিস? ... আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।"[২৩]

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত উভয়বিধ মানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই শুধু ছাত্রীসংখ্যা বাড়ানো নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়ানোর প্রতিও রোকেয়া সমান আন্তরিক ছিলেন। এজন্য তিনি বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার ইংরেজ, বাঙালি নির্বিশেষে সকল অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ ও মেলামেশা শুরু করেন। ক্রমে তিনি কলকাতার মিসেস পি. কে. রায়, মিসেস রাজকুমারী দাস প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মহিলার সংস্পর্শে আসেন। মধুর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানানুরাগ ও কল্যাণ প্রচেষ্টা দিয়ে তিনি তাঁদের চিত্ত জয় করেন। তাঁদের সহযোগিতায় কলকাতার বেথুন, গোখেল মেমোরিয়াল প্রভৃতি স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত করে স্কুল পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলেন দিনের পর দিন। এমনকি, ক্লাসে পড়া চলার সময় ছাত্রীদের সঙ্গে ক্লাসরুমের একপাশে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যেত।[২৪] বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য রোকেয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব অনুভব করেন। তিনি সরকারকে এ বিষয়ে লেখেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সরকারিভাবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কলকাতায় একটি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়। এ স্কুল থেকে পাস করা শিক্ষিকাগণ পরবর্তীকালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার এটিও একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নততর করার জন্য তদুপরি তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষয়িত্রী আনার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। স্কুলের জন্য 'জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া'—এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।"[২৫]

জীবনের প্রধান করণীয় কাজ হিসেবে বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়ে তিনি কতখানি আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন তাঁর প্রমাণ বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। বেগম রোকেয়ার

---

২৩. ঐ, পৃ. ১৫
২৪. উদ্ধৃতি, মোতাহার হোসেন সুফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
২৫. শামসুন নাহার মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

www.pathagar.com

ছাত্রী ও পরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আনোয়ারা বাহার চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, "কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি যখন দেখেছি স্কুলের শেষ গাড়িটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেছেন। খোঁজ-খবর নিয়েছেন সেদিনের সব কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা। অনেক রাত অবধি তিনি লেখাপড়ায়ও ব্যস্ত থাকতেন।"[২৬] বিদ্যালয়ের জন্য তিনি প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। বিশ্রাম বা আরাম ভোগ করার অবকাশ তাঁর ছিল না। প্রতিদিনই নতুন নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে তিনি স্কুলের কাজ করে যেতেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে এ বিষয়ে প্রমাণ মেলে। তিনি লিখেছেন, "আত্মীয়-স্বজনের মমতা কি মধুর জিনিষ তা আমার মত আত্মীয়হারা না হওয়া পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারবে না। শুনেছি, লোকে বেহেশতে গিয়েও নাকি আত্মীয়স্বজনের বিরহে ব্যাকুল হবে। কিন্তু বোন গ্রীষ্মাবকাশে আমার তো কোথাও যাবার যো নাই। এই যে স্কুল সংক্রান্ত রাশিকৃত office work—এগুলো করবে কে? সুতরাং বেহেশতের নিমন্ত্রণ পেলেও তো স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না।"[২৭]

বেগম রোকেয়ার এ জাতীয় নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে 'মধ্য ইংরেজি' বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি 'উচ্চ ইংরেজি' বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। এ বিদ্যালয়কে তিনি নিজের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন যে, "ইহার জীবনের অন্য সাধনা ও প্রচেষ্টার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু এই স্কুলের জন্যই মুসলমান সমাজ ইহার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবে।"[২৮] বর্তমানে স্কুলটি সচল অবস্থায় কলকাতার ৯নং লর্ড সিংহ রোডে অবস্থিত রয়েছে।

এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রোকেয়াকে নানারূপ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং বিদ্রূপ ও কুৎসার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজের একটি অংশ তাঁর এই মহান প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে দেবার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রোকেয়ার আশা ছিল কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্কুল পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করেননি, বরঞ্চ তাঁর সাথে বৈরী আচরণ করেছেন। অনেকে স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন এবং কুৎসা রটনা করেছেন। তাঁর নামে এমনও অপবাদ দেয়া হয়েছিল, "যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রূপ-যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।"[২৯] এ অবস্থাতেও তিনি শক্ত মনোবল ও গভীর নিষ্ঠার সাথে তাঁর আরাধ্য কাজ করে গেছেন। দীর্ঘদিন স্কুল পরিচালনা করে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, "এই

২৬. আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, 'বেগম রোকেয়াকে যেমন দেখিছি',*সংবাদ*, ঢাকা, ২৪ অগ্রাহায়ণ, ১৩৮৯

২৭. মোশফেকা মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

২৮. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

২৯. শামসুন নাহার মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

www.pathagar.com

আঠারো বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক—যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরববোধ করে, তাঁহারাও প্রাণপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন। আর কিছু কিছু এই দীনতম সেবিকাও সময় সময় শুনিতে পায়।"[৩০] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, "স্কুলটা যে এত ঝঞ্ঝাগত, এত শিলাবৃষ্টি, এত অত্যাচার সহিয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহাই যথেষ্ট। একথা বলি না যে, আমরা সমাজের সম্মুখে অতি উচ্চদরের এক অদ্বিতীয় আদর্শ বিদ্যালয় উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তাহাই করিয়াছি এবং অবরোধ-বন্দিনী বালিকাদের পক্ষে যতটা শিক্ষা পাওয়া সম্ভব, তাহাই তাহারা পাইয়াছে।"[৩১] তৎকালীন সমাজে বিরাজমান কঠোর পর্দা ও অবরোধ প্রথার কারণে মুসলিম মেয়েরা পায়ে হেঁটে স্কুলে আসতে পারতো না। এ কারণে রোকেয়াকে তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু সেখানেও তাঁকে দু'ভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। একদল অভিভাবক এ গাড়িকে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ)'[৩২] হিসেবে আখ্যাত করে এ ধরনের গাড়িতে করে স্কুলে মেয়েদের পাঠানো বন্ধ করে দেবেন বলে জানান। আর একদল এ গাড়ির পর্দা ব্যবস্থা ভাল না বলে 'এরূপ বেপর্দা গাড়িতে কি করিয়া মেয়েরা আসে'[৩৩] তা দেখে নেবেন এবং তৎকালে প্রকাশিত 'খবিছ', 'পলীদ' প্রভৃতি উর্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করবেন বলে শাসিয়ে রোকেয়ার নিকট পত্র লেখেন। এ অবস্থাকে তিনি উভয় সংকট হিসেবে আখ্যাত করে বলেছেন, "না ধরিলে রাজা বধে,—ধরিলে ভুজঙ্গ।"[৩৪]

সমাজে নারী জীবনযাপন তখন কতখানি অসহনীয় ছিল তা তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর পরিণত বয়সে লেখা 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে। সামাজিক এ পরিস্থিতিতে তিনি দুঃখ করে বলেছেন, "কেন বলেছেন, কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে, কেন জন্ম লভিলাম পর্দানশীন ঘরে!"[৩৫] এখানে তাঁর নারী হৃদয়ের হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের তাবৎ নারীর প্রতি তাঁর এক গভীর মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে। বাংলার আর এক নারী দরদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মর্মবেদনা থেকে উৎসারিত উচ্চারণের সাথে এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। নারীর প্রতি, বিশেষত বিধবাদের প্রতি সমাজের হৃদয়হীন উদাসীনতা ও অমানবিক আচরণের পরিচয় লাভ করে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, "হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"[৩৬]

---

৩০. ঐ, পৃ. ৫৩
৩১. ঐ, পৃ. ৫৪
৩২. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৫১১
৩৩. ঐ, পৃ. ৫১২
৩৪. ঐ, পৃ. ৫১২
৩৫. ঐ, পৃ. ৫১২
৩৬. অশ্রুকুমার সিকদার ও দেবেশ রায় (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর-নির্বাচিত রচনা* উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ১৯৭১, পৃ. ৫৭

www.pathagar.com

বস্তুত সমাজ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও হৃদয়াবেগের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে রোকেয়ার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে রোকেয়ার তুলনা আমার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। শুধু শিক্ষা ও সমাজ ভাবনায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরা পথিকৃৎ বলেই নয়, অসীম সাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা, চিন্তাজীবন ও কর্মজীবনের সমন্বয়— এসব দিক দিয়েও দু'জনের মধ্যে মিল আছে। ... সামাজিক বিরুদ্ধতায়, হিংসায়, সংকীর্ণতায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন দু'জনেই, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেননি।"[৩৭] পরাজয় না মানার মানসিকতার কারণেই হাজারো সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও বিদ্রূপ মাথায় করে রোকেয়া বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এখানে তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ কিছুই ছিল না। সবই করেছেন সমাজের মঙ্গলের জন্য। তিনি বলেছেন, "এই স্কুলটা না থাকলে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই? চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়; চাই, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দু'টির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইন-বোর্ড থেকে ও শব্দ দু'টি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ, আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিম্বা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়রা এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।"[৩৮] তাঁর এই যে খেদোক্তি তা সমাজকে রক্ষার জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য। সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি এমন উক্তি করেছেন জীবনের শেষ দিকে গিয়ে অর্থাৎ ১৩৩৮ সনে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' শীর্ষক এক লেখায়।

সাথে সাথে একথাও উল্লেখ প্রয়োজন যে, কুৎসা-বিদ্রূপ, তিরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিদগ্ধজনের কাছ থেকে তিনি প্রশংসা ও সহায়তা লাভ করেছিলেন তাঁর কাজের জন্য। এঁদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, লেডি চেমসফোর্ড, আগা খান, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ হাসান ইমাম, আবদুর রসুল, স্যার আবদুর রহিম, স্যার এ.কে. গজনভী, এ.কে ফজলুল হক প্রমুখ রয়েছেন।[৩৯] ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর সরোজিনী নাইডু হায়দরাবাদ থেকে বেগম রোকেয়াকে একটি চিঠি লেখেন তাঁর কাজের প্রশংসা করে। তিনি লেখেন, "... কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, আপনি কি দুঃসাহসের কাজ করিয়া চলিয়াছেন। মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপনি যে কাজ হাতে নিয়াছেন এবং তাহার সাফল্যের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী যে ত্যাগ সাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই

৩৭. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
৩৮. ঐ, পৃ. ২১
৩৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০

www.pathagar.com

বিস্ময়কর। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠিখানা লিখিলাম।"[৪০] এ চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "... আজ সাময়িকপত্রে (Indian Ladies Mgazine) আপনার স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়িতেছিলাম। আপনার এই ভগ্নী দূর হইতে বরাবর আপনার আদর্শকে এবং আপনার কর্মময় জীবনকে কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে, তাহা জানাইবার জন্যই এই চিঠি। মুসলমান নারীদের কল্যাণের জন্য আপনি যে অক্লান্ত সাধনা করিতেছেন, বিধাতা করুন, তাহা জয়যুক্ত হউক।"[৪১] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বড়লাট পত্নী লেডি চেমসফোর্ড সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিদর্শন করেন এবং বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। উল্লিখিত ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে বিদ্যালয়ের বিষয়ে বেগম রোকেয়াকে সহায়তা করেছেন। নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এঁদের সমর্থন, সহায়তা, সহানুভূতি ও প্রশংসা বেগম রোকেয়াকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করার পেছনে তাঁদের অনুপ্রেরণা রোকেয়াকে শক্তি যুগিয়েছে।

বেমগ রোকেয়ার শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্মবিচার বিশ্লেষণ করলে তাতে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের নতুন নতুন মাত্রা স্পষ্ট হয়ে আসে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সামাজিক উত্তরণে তাঁর বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি সে সময়কার বাস্তবতার নিরিখে বিস্ময়কর মনে হয়। তিনি শিক্ষাক্রমে সাধারণ বিষয়াবলির সাথে পুষ্টিবিদ্যা, পশুপালন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন, উত্তাপতত্ত্ব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সূচি বিদ্যা, শুশ্রূষা প্রণালী, সন্তান লালন প্রণালী প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[৪২] পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর জ্ঞান আহরণ করে নারীরা যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি তা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নানা যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন। গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কাজগুলো সূচারুরূপে সম্পাদন করবার জন্য বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বাসগৃহের পরিবেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত করা, পরিমিত ব্যয়ে সংসার পরিচালনা করার জন্য তিনি মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।[৪৩] স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রস্তুত করতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি বলেছেন, "গৃহিণীর রন্ধন শিক্ষা করা উচিত, একথা কে অস্বীকার করেন? একটা প্রবাদ আছে যে, স্ত্রীদের রান্না তাঁহাদের স্বামীর রুচি অনুসারে হয়। গৃহিণী যে খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবনধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনীরা প্রায়ই 'কালাই' রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া কোর্মা প্রস্তুত করে, তাহা বিষ ভিন্ন আর কিছু নহে; মুসলমানেরা প্রায়ই অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ

৪০. শামসুন নাহার মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০
৪১. ঐ, পৃ. ১২১
৪২. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৪৫-৪৬
৪৩. ঐ, পৃ. ৪৬-৪৭

www.pathagar.com

রোগে ভুগিয়া থাকেন, তাহার কারণ খাদ্যের দোষ ছাড়া আর কি হইতে পারে?"[৪৪] তিনি আরও বলেছেন, "রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর ডাক্তারী ও রসায়ন (Chemistry) বিষয়ক সধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কোন্ বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য প্রয়োজন, এসব বিষয়ে গৃহিণীর জ্ঞান চাই। যদি আহারই যথাবিধি না হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হইবে কিসের দ্বারা?"[৪৫] উত্তম সাংসারিক জীবনযাপনে আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক কিভাবে জড়িত তা বুঝতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সেই সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। উহাদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থান না থাকায় উহারা বাড়ির মধ্যেই ঘুরিয়া চলিয়া বেড়ায়। কাজেই বাড়িখানাকে পশুশালা বা পশুপাখীদের 'ময়লার ঘর' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে এই জন্তুগুলো রুগ্ন না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট থাকে এবং গৃহ নোংরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উহাদের বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওয়াদার (airy) হওয়া উচিত। নচেৎ রুগ্ন পশুপাখীর মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট বই উপকার নাই। তবেই দেখা যায়, এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপতত্ত্ব (Horticulture, Chemistry ও Theory of Heat) শিখিতে হয়।"[৪৬] এভাবে পোশাক প্রস্তুত ও ব্যবহার, রোগে পীড়িতদের সেবাশুশ্রূষা, প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। তবে সন্তান লালন-পালনে মায়ের শিক্ষার বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তাতে বিস্ময়বোধ জাগে। সন্তান পালনকে তিনি 'সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার' হিসেবে আখ্যাত করেছেন। এর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন, 'ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। ... শিশু স্বভাবত মাতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতি কার্য, প্রতি কথা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতি ফোঁটা দুগ্ধের সহিত মাতার মনোগত ভাব শিশুর মনে প্রবেশ করে।"[৪৭] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, "মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলো সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্য মাতা কারণে-অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে ..."[৪৮] তাঁর মতে, "মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষায়ত্রী।"[৪৯] এখানে আধুনিক সামাজিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বেগম রোকেয়ার জ্ঞানের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত বেগম

৪৪. ঐ, পৃ. ৪৮
৪৫. ঐ, পৃ. ৪৯
৪৬. ঐ, পৃ. ৫০
৪৭. ঐ, পৃ. ৫২
৪৮. ঐ, পৃ. ৫৩
৪৯. ঐ, পৃ. ৫৩

www.pathagar.com

রোকেয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক বিকাশের সাথে বৈষয়িক ও ইহজাগতিক উন্নতি সাধন করে নারীর সমাজসত্তাকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে রোকেয়ার ভেতর এই বোধের গভীরতা বেড়ে চলে। তাঁর জীবনের শেষ দশকের লেখাগুলোর অনেক ক্ষেত্রে এর ছাপ লক্ষ করা যায়। ১৩৩৭ সনে লেখা 'সুবেহ সাদেক'-এ তিনি উল্লেখ করেছেন, "অন্তত পক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা—যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতা-রূপে গঠিত করিবে। শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক—উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ি, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।"[৫০] তৎকালীন সমাজে মুসলমানদের অধঃপতনের মূলে তিনি শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'রাণী ভিখারিণী'-তে বলেছেন, "মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন—তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিত-সুযোগ মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিত অযোগ্য মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি স্বাভাবিক। 'অযোগ্য' বলার জন্য রাগ না করিয়া 'যোগ্য' হইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়।"[৫১]

রোকেয়া তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে শিক্ষাকে বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে 'বিদ্যালয়, কর্মালয় এবং আতুরাশ্রম'-কে একীভূত করে 'তারিণী-ভবন'-এর কথা চিন্তা করেছেন। সাথে বিদ্যালয় বিভাগে ব্রাহ্ম, হিন্দু, খ্রিস্টান শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের কথা চিন্তা করে এবং তাঁহারা 'সকলে যেন এক মাতৃগর্ভজাত সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছেন' বলে ইউরোপীয় রেঁনেসাসীয় উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।[৫২] এ উপন্যাসে বিধৃত তাঁর শিক্ষাচিন্তা মানসের পরিচয়ে বিস্ময়বোধ না করে পারা যায় না। এখানেও তাঁর শিক্ষায় জীবনমুখীনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় লক্ষ্য করা যায়। 'তারিণী ভবন'-এর শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র—সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন

৫০. ঐ, পৃ. ২৯৯
৫১. ঐ, পৃ. ২৯১-৯২
৫২. ঐ, পৃ. ৩২৯

www.pathagar.com

প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষত তাহারা আত্মনির্ভরশীল হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।"[৫৩] বস্তুত বেগম রোকেয়া 'তারিণী-ভবন'-এর শিক্ষা বিভাগের আদলে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

তাঁর অন্যান্য লেখাতেও নারীর আত্মিক ও পার্থিব জীবন বিকাশকেন্দ্রিক বিষয়ের অস্তিত্ব ও বিস্তার লক্ষণীয়। এর সব কিছু এ ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। বস্তুত তিনি আধুনিক প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনের অনুসারী ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন। নিজের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন এক আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মননের ভিত্তি। তাই তাঁর লেখায় আকর ও উদাহরণ হিসেবে অনেকবারই আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যক্তি ও সমাজ প্রসঙ্গ এসেছে। তবে তাঁর সে মননের ভিত্তিটি ছিল নিজ সমাজ, নিজ দেশ ও তার মাটি। " ... কোনো সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিলো না তাঁর মনে, কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিক মননের অর্থ ছিলো না আবার উন্মূলতা, শিকড়হীনতা বা বিচ্ছিন্নতা। তীব্রভাবেই যুক্ত ছিলেন তিনি স্বসমাজে ও স্বদেশে।"[৫৪]

বেগম রোকেয়ার শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্ম বিশ্লেষণে যে জিনিসটা সবকিছুর ওপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, নারীকে তিনি সমাজে নিজের স্থান করে নেওয়ার যোগ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে উগ্র নারীবাদের প্রকাশ কখনও ঘটেনি। 'Sultana's Dream' (সুলতানার স্বপ্ন) গ্রন্থে তিনি যে নারীপ্রধান সমাজের কথা চিন্তা করেছেন, তা নিছক স্বপ্ন। বস্তুত স্বপ্ন দেখলেও তিনি অতিমাত্রায় স্বপ্নবাদী ও তাত্ত্বিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রায়োগিক ও বাস্তববাদী। "নারী মুক্তির কোন দিকটি তাঁকে বেশি আলোড়িত করেছিল, তাত্ত্বিক দিকটি, নাকি তার প্রায়োগিক রূপটি? তিনি সচেতন মানুষ ছিলেন, বাস্তববাদী ছিলেন।"[৫৫] তাই সমাজের উন্নতির জন্য পুরুষ ও নারীর সমান প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উপলব্ধি করেন। এ গভীর উপলব্ধিবোধ থেকে তাই তিনি বলেছেন, " ... আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত

৫৩. ঐ, পৃ. ৩২৯

৫৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

৫৫. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'রোকেয়ার স্বপ্ন এবং বাস্তবতা', *আজকের কাগজ*, ঢাকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০১

www.pathagar.com

উন্নতির সাথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতির রাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিনী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই। একথা নিশ্চিত।"[৫৬] এখানে রোকেয়ার মধ্যে সমাজে নারী অধিকার, মর্যাদা, স্বার্থ ও ভূমিকার ক্ষেত্রেও সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিবিড়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারীকে পুরুষের যোগ্য সঙ্গী ও সহকর্মী করাই ছিল রোকেয়ার সকল চিন্তা ও কর্ম-প্রচেষ্টার সার লক্ষ্য। নারী সমাজে 'প্রকৃত শিক্ষা'র প্রসার ঘটিয়ে তিনি এ লক্ষ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর লক্ষ্য যাতে বাস্তবে ফললাভ করে সেজন্য শিক্ষাপ্রসার কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে মুসলিম মহিলা সমাজকল্যাণমূলক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যে সময় বাঙালি মুসলিম সমাজের পুরুষেরা পদ ও পদবী লাভের আশায় মোসাহেবিতে ব্যস্ত সে সময় একজন নারী হয়ে বেগম রোকেয়া প্রবল সাহস ও মনোবল নিয়ে সমাজ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

এত কিছুর পরও বেগম রোকেয়ার মধ্যে গভীর দুঃখবোধ বিরাজমান ছিল। সমাজে নারীদের ঘনীভূত বঞ্চনা ও দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তাঁর ভেতরে এ দুঃখবোধ সৃষ্টি হয়। এমন ত্যাগ নেই যা তিনি সমাজের জন্য করেননি। সমাজের মঙ্গলের জন্য তিনি অনেক কিছুর সাথে আপোসও করেছেন। যে অবরোধপ্রথাকে তিনি ঘৃণা করতেন তাকেও তিনি মাঝে মাঝে অবলম্বন করেছেন বাস্তব প্রয়োজনে।"[৫৭] তারপরও তাঁর অন্তরের কান্না থামেনি। তারই বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলন' (Bengal Womens' Educational Conference)-এ প্রদত্ত অভিভাষণে। আবেগপূর্ণ এ ভাষণে তিনি বলেন, "... ২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজ সেবা করিয়া—বিশেষত ১৬ বৎসর যাবত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি। স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। ... আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা

৫৬. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৩১
৫৭. মোতাহার হোসেন সুফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯

www.pathagar.com

নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন? সে-জীব ভারত-নারী। এই জীবগুলোর জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। ... এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে—যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরআন শরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু—বিশেষত ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া না হয়।"[৫৮] তৎকালীন বাঙালি সমাজে বিদ্যমান তমসাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ, গতানুগতিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা যা রোকেয়ার হৃদয়কে দুঃখভারাক্রান্ত করেছিল তার আরও প্রমাণ মেলে বেগম রোকেয়ার সহকর্মী ফাতেমা খানমের ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফজলকে লেখা এক চিঠি। তিনি লিখেছেন, "অলস অকর্মণ্য মুসলমান সমাজে নারীজাতির জন্য এই প্রবীণা বিধবা মহিলাটি যা করেছেন সমস্ত ভারতে (বৃটিশ-ভারতে) তার তুলনা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালি মুসলমানদের নিদ্রা তিনি কিছুতেই ভাঙ্গাতে পারছেন না। তাঁর স্কুলে তফসিরসহ কোরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, ফার্সি, হোম নার্সিং, ফাস্ট এড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা আগ্রহে শিক্ষা করছে। কিন্তু বাঙালিরা এদিকে ফিরেও চাচ্ছে না। ১১৪টি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুইটা বাঙালি। এখন বুঝতে পার বাংলার কি অবস্থা।"[৫৯] কি অচিন্তনীয় সে সামাজিক অন্ধকারময় পরিবেশ।

বেগম রোকেয়ার মনে তীব্র দুঃখবোধ ও ঘনীভূত বেদনার পাশাপাশি সুপ্ত প্রত্যাশাও ছিল। একদিন এ অন্ধকার কেটে যাবে। আজ তাঁর মৃত্যুর ৬৬ বছর পর শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও সমাজের নারীর সামনের দিকে যাত্রা চলেছে। পুরুষের পাশাপাশি তাদের অবস্থানের মাত্রা ও গভীরতা ক্রমে বাড়ছে। তবে তা আরও বাড়া প্রয়োজন সমাজে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য, ঠিক যেমনটি আশা করেছিলেন বেগম রোকেয়া।

৫৮. উদ্ধৃতি, ঐ, পৃ. ৩৯-৪০
৫৯. ঐ, পৃ. ৪০

www.pathagar.com

বেগম রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন : স্বরূপসন্ধান

নুসরাত সুলতানা

বাঙালি মুসলমান নারীর অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি সংগ্রামের পথিকৃৎ, শিক্ষাবিস্তার সাধনার নিরলস তাপসকর্মী এবং মুক্তিচিন্তায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যসেবী বেগম রোকেয়ার পরিচিতি সুবিদিত। তিনি সুপরিচিত আক্রোশবিক্ষুব্ধ পরিবেশে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও তার পরিচালনার জন্যও। এই বিদ্যালয় ছিল তাঁর আদর্শ রূপায়ণের ব্যবহারিক কর্মক্ষেত্র। কারণ তিনি বেশ বুঝতেন যে, নারীর অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির ও তা বৃদ্ধির পূর্বশর্তই হচ্ছে নারীকে সুশিক্ষিত করে তোলা। তাই তিনি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সে ব্রত পালন করেছিলেন সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে। শুধু সুযোগ করে দেয়া নয়, নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকা পালন করে অবদান রেখেছেন শিক্ষাব্যবস্থায়। বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম প্রশংসার সাথে মূল্যায়িত হয়েছে। নারী অধিকার ও তা আদায়ের পন্থা সম্পর্কিত বক্তব্য আজো সমাজকর্মীদের প্রেরণার উৎস, তাঁর শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াসও শ্রদ্ধা পেয়েছে সুধীজনের। যিনি চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, পরিচালনা করেছেন বিদ্যালয় প্রশাসন, সাগ্রহে পাঠদান করেছেন শ্রেণীকক্ষে তাঁর নিজস্ব একটা শিক্ষাদর্শন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষাদর্শনের ওপর তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তাই প্রকাশিত রচনাবলি পর্যালোচনা করে তাঁর শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে আলোকপাত করারই চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

শিক্ষাদর্শন কী বা কাকে বলে? এ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা রয়েছে বেশকিছু দেশী-বিদেশী লেখায়। সেসব বক্তব্য পর্যালোচনা করলে যা বোঝা যায় তার সারসংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায় যে, শিক্ষাদর্শন হচ্ছে কী শেখাব এবং যা শেখাব তা কেন শেখাব? সে সম্পর্কিত বক্তব্যের একটি সুসংহত রূপ। প্লেটো (৪২৮-৩৪৭) কুইন্টিলিয়ান, লয়োলা, রুশো, হার্বার্ট, জন ডিউই, রাসেল এঁরা সবাই এই বিষয়টিই

www.pathagar.com

যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে। বেগম রোকেয়ার শিক্ষাসংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করাই হবে বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। আগেই বলা হয়েছে, বেগম রোকেয়ার শিক্ষাসংক্রান্ত বক্তব্যগুলো উল্লিখিত দার্শনিকদের মতো, কোনো একক গ্রন্থে বা প্রবন্ধে সংহত নয়; বরং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসে। যদিও তিনি স্ত্রীশিক্ষাকে উপলক্ষ করে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত মতামত উপস্থাপন করেছেন তবু সেগুলো সর্বজনীনতার মানদণ্ডে মোটেও অকিঞ্চিৎকর নয়। কারণ তিনি সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যকে অযৌক্তিক বলেই বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে রকম সমতা থাকা উচিত শিক্ষা ক্ষেত্রেও সেটাই প্রয়োজন।[১] তিনি বলেছেন, ঈশ্বর ও মায়ের কাছে মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক নয়। যদি তাই হতো তাহলে এইরকম বন্দোবস্তো স্বাভাবিক হতো যে, ছেলে যেখানে দশ মাস মাতৃগর্ভে থাকবে মেয়ে সেখানে পাঁচ মাস থাকবে। ছেলের জন্য মায়ের স্তনে যতটা দুধ আসে মেয়ের জন্য তার অর্ধেক আসবে। কিন্তু প্রকৃতিতে তো সে রকম নিয়ম নেই।[২]

বেগম রোকেয়া বলেছেন, 'প্রকৃত সুশিক্ষা চাই যাহাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত হয়'।[৩] তাঁর মতে, সুশিক্ষার অভাবেই হৃদয়বৃত্তি সঙ্কুচিত হয়ে যায়।[৪] প্রকৃত শিক্ষা কাকে বলে সেকথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শিক্ষার অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নয়; বরং সৃষ্টিকর্তা যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের মাধ্যমে বাড়িয়ে তোলাই শিক্ষা। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত যে ক্ষমতা বা গুণ রয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা তার কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা অন্যায়।[৫] এই কথাগুলোর মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মত লক্ষ করা যায়: শিক্ষা অন্ধ অনুকরণ নয়; মানুষের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা; অনুশীলন বা ব্যবহারের মাধ্যমে এই ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

শিক্ষা যে অন্ধ অনুকরণ নয়, একথা বলে বেগম রোকেয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। শুধু কোনো জাতি বা সম্প্রদায় নয়, শিক্ষা কোনো ব্যক্তিরও অন্ধ অনুকরণ হতে পারে না। অনুকরণ অনুকরণই, সেটা শেখা নয়। শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে অনেক কিছু শেখে বটে কিন্তু সেটা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের শেখা। তাছাড়া সেও কেবলই অন্ধ অনুকরণ করে না। নিজস্ব বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে গ্রহণ ও বর্জন করে থাকে। মানুষ যদি কেবলই অন্ধ অনুকরণ করতো, কোনো নতুন সংযোজন না করতো তাহলে আজ সে গুহাবাসীই থেকে যেতো, বিংশ শতাব্দীর এই স্বর্ণালোকিত সভ্যতাকে সম্ভব করতে পারতো না। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবৈষম্য রয়েছে। প্রকৃতির প্রয়োজনেই এই গুণগত বিভিন্নতা। শক্তির বা গুণের এই বিভিন্নতা মানুষকে বিভিন্নমুখী কর্ম সম্পাদনে সক্ষম করে। আর শিক্ষার অর্থই হচ্ছে এই শক্তি বা গুণের সুষ্ঠু উন্মেষণ। অন্য ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ কোনো ব্যক্তির নিজস্ব গুণের উন্মেষণকে বাধাগ্রস্ত করে। ব্যক্তির বেলায় যা সত্য জাতির বেলায়ও তা সত্য। এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিত এক এক রকম। এক জাতির জন্য যা প্রয়োজন বা শোভন

www.pathagar.com

অন্য জাতির জন্য তা নাও হতে পারে। তাই প্রত্যেক জাতির প্রেক্ষিত বিবেচনা করেই তার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তা না হলে কোনো জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির সঠিক উদ্বোধন হবে না। সুতরাং বেগম রোকেয়া যথার্থই বলেছেন, শিক্ষার অর্থ অন্ধ অনুকরণ নয়।

শিক্ষা যে অন্ধ অনুকরণ নয় সে কথা স্বনামধন্য শিক্ষক দার্শনিক ফ্রয়েবেলও বলেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ আর এর উপায় প্রাণহীন অনুকরণ নয়, এর উপায় স্বতঃস্ফূর্ত ঔৎসুক্য ও আত্মানুশীলন; মানবজাতির একজন হিসেবে এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে সমগ্র মানবজাতির প্রাণকোষ সঞ্চারিত হয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। কিন্তু এই মানবতার প্রকাশ প্রত্যেক মানুষে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং প্রত্যেক ব্যক্তির এ স্বকীয়তার সম্পূর্ণ বিকাশ দ্বারা শিক্ষাপ্রণালীর সাফল্য নির্ণীত হবে।[৬] তাহলে দেখা যায়, ফ্রয়েবেল ও রোকেয়া দু'জনেই বিশ্বাস করতেন শিক্ষা অন্ধ অনুকরণ নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ত আত্মানুশীলন; উভয়ই বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর রয়েছেন এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা এবং উভয়ই বিশ্বাস করতেন ব্যক্তির স্বকীয়তা বা নিজস্ব ক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমেই আসে প্রকৃত শিক্ষা বা শিক্ষাপ্রণালীর সার্থকতা।

মন্তেসরি শিক্ষাপদ্ধতির ড. মারিয়া মন্তেসরি শিক্ষাদর্শনের সঙ্গেও রোকেয়ার দর্শন তুলনীয়। মন্তেসরির মতে, শিক্ষা হচ্ছে শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বাড়নে সক্রিয় সাহায্য দেওয়া।[৭] তাঁর কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিশুর শিক্ষা অন্যের অনুকরণে বা অন্যের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে না বরং তা হবে তার জীবনের স্বাভাবিক বাড়ন। এক্ষেত্রে প্রবীণতর প্রজন্ম কেবল সক্রিয় সাহায্যই প্রদান করতে পারেন, এর বেশি কিছু নয়।

বেগম রোকেয়ার মতে, সৃষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি জ্ঞান বা ক্ষমতার প্রতিশব্দ হিসেবে Faculty শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আবার গুণও বলেছেন। শিশুর মধ্যে যে সহজাত ক্ষমতা বা গুণাবলি রয়েছে সেকথা ভাববাদী দার্শনিকেরা বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। ফ্রয়েবেলের বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ফ্রয়েবেল যে দর্শনের উত্তরাধিকারী ছিলেন তা ছিল কান্ট সূচিত এবং ফিকটে, শেলিং, হেগেল বিকশিত ভাববাদ।[৮] ফ্রয়েবেল বিশ্বাস করতেন মানুষের মন ফুলের পাপড়ি খোলার মতো করে ধীরে ধীরে একটা নির্দিষ্ট নমুনায় খোলে। তিনি বলেছেন, শিশু যা হবে তা সম্ভাবনার আকারে শিশুর মধ্যেই থাকে এবং তা অর্জন করা সম্ভব কেবল ভিতর থেকে বাইরের দিকে বিকাশের মাধ্যমে। অর্থাৎ ফ্রয়েবেলের মতে শিশুর সম্ভাবনা বা গুণাবলি তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। তাঁর এই তত্ত্বের নাম দেয়া হয়েছে উন্মেষণের তত্ত্ব।[৯] অন্যদিকে জন লক সহজাত ধারণার তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন জন্মের সময় মন থাকে অলিখিত সাদা কাগজের মতো, মানুষের ধারণা তৈরি হয় অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে। হার্বার্টও লকের সাথে একমত হয়ে বলেছেন, আত্মার কোনো সহজাত প্রবণতা নেই বা মানসিক ক্ষমতা বলে কিছু নেই।[১০]

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়, বেগম রোকেয়া বলেছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা।[১১] এ ব্যাপারে প্রকৃতিবাদীরা একেবারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের কাছে শিক্ষা শিশুর সহজাত ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের চেয়ে বেশি কিছু নয়।[১২] অর্থাৎ তাঁরা সহজাত ক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্য মানুষের হস্তক্ষেপের বিরোধী এবং বাধাহীন বিকাশ ঘটতে দেয়ার পক্ষপাতী। অনুশীলন করার অর্থই হচ্ছে নিয়মিত চর্চা করা এবং শিশু নিয়ম আপনিই শেখে না, অভিজ্ঞজনের নির্দেশনাতেই শেখে। তাই রোকেয়া যখন অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধির কথা বলেন তখন তা ফ্রয়েবেলের কথার প্রতিধ্বনি বলেই মনে হয়। ফ্রয়েবেল বলেছেন, নিয়ম-মানা, নির্দেশনা ছাড়া কোনো বিকাশই হয় না।[১৩] শিশুর মধ্যে সহজাত ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার এবং সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করার সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস থেকে এ ধারণা করা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, এ ক্ষেত্রে রোকেয়া ভাববাদী অবস্থান সমর্থন করেছেন। রাসেল যদিও ভাববাদী নন, তবুও এক্ষেত্রে রোকেয়ার ও রাসেলের মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। রাসেল বলেন, "উপযুক্ত শিক্ষা সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন সম্ভব করতে পারে কিন্তু এগুলোকে হতে হবে প্রশিক্ষিত ও পরিমার্জিত প্রবৃত্তি, প্রকৃতি থেকে পাওয়া স্থূল, অগঠিত অবস্থার তাড়না নয়।[১৪] প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে রোকেয়ার মতের সঙ্গে প্লেটোর মতেরও বেশ মিল রয়েছে। প্লেটো বলেছেন, "এখন আমি শিক্ষা বলতে সেই প্রশিক্ষণকে বুঝি যা উপযুক্ত অভ্যাস বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর মধ্যেকার প্রাথমিক সহজাত গুণাবলির প্রতি দেওয়া হয়।"[১৫]

রোকেয়া বলেন, মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত যে ক্ষমতা বা গুণ রয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা তার কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা অন্যায়। এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। জড়বাদী ও যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদীরা ছাড়া কেউই মনে করেন না যে, জগৎ ও জীবনের সৃষ্টি অনর্থক বা উদ্দেশ্যহীন। বরং তাঁরা মনে করেন বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষ বিভিন্ন গুণাবলি নিয়ে জন্মায়। সুতরাং এসব গুণের সদ্ব্যবহার করা প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনে নিজের কর্তব্য পালন করা এবং অপব্যবহার করা সে উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা, যা অবশ্যই অন্যায়।

রোকেয়ার কাছে শুধু পাস করা বিদ্যা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাঁর মতে, শুধু সনদলাভ করলেই মানুষ শিক্ষিত হয় না; জ্ঞান ও গুণের সদ্ব্যবহার করতে পারা, 'মস্তিষ্ক ও মন উন্নত' করতে পারাটাই হচ্ছে শিক্ষিত জনের মূল্যায়নের মাপকাঠি। এই বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বোধ হয় বলা যায় যে, রোকেয়ার মতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে যে, পরিণত মানুষ কেবল বংশগতিরও ফসল নয় অথবা কেবল পরিবেশেরও ফসল নয় বরং এ দুয়ের মিলিত ফসল। সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের মস্তিষ্কে যে পরিমাণ কোষ রয়েছে আমরা এ পর্যন্ত তার অতি সামান্য অংশই ব্যবহার করতে পেরেছি এবং চর্চার মাধ্যমে আমরা এর কার্যক্ষমতা আরো বাড়াতে পারি। অবশ্যই এই চর্চা কেবল শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং মস্তিষ্কের উন্নয়নকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে রোকেয়া তাঁর উন্নত

www.pathagar.com

বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছেন। মস্তিষ্কের কারবার মূলত জাগতিক বস্তুসমূহকে নিয়ে, অন্যদিকে মনের কারবার অন্য মন বা মনসমূহকে অর্থাৎ ব্যক্তিকে নিয়ে। এখানেই আসে সামাজিকতা ও নৈতিকতার প্রশ্ন। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশু জন্মের সময় থাকে অসামাজিক (asocial), সামাজিকও (social) নয়, অসামাজিকও (antisocial) নয়। নৈতিকতার ক্ষেত্রেও তাই। জন্মের সময় থেকে শুরু করে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত শিশু যেসব আচরণ করে সেগুলোকে নৈতিকও বলা যায় না অনৈতিকও বলা যায় না। সামাজিকতা ও নৈতিকতার ধারণা সে লাভ করে শিক্ষার মাধ্যমেই তাই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে উন্নততর মন বা মানসিকতা অর্জনকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে বেগম রোকেয়া উন্নততর সমাজ গঠনের প্রকৃত দিকনির্দেশনাই দিয়েছেন।

বেগম রোকেয়া বলেন, সৃষ্টিকর্তা আমাদের যে হাত, পা, চোখ, কান, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়েছেন, আমরা যদি সেগুলোকে সবল করি, হাত দিয়ে সৎ কাজ করি, চোখ দিয়ে কার্যকরভাবে প্রত্যক্ষ করি, কান দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে শুনি এবং চিন্তাশক্তি দিয়ে আরো সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে শিখি, তবে সেটাই প্রকৃত শিক্ষা।[১৬] এরকম কথা বলেছেন ফ্রয়েবেলও। তাঁর মতে, মানুষের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সাধনের উপায় হিসেবে হাতের কাজের যথেষ্ট দাম আছে। এমনকি শিশুকালেও সে কতটা বাইরে থেকে গ্রহণ করল ও আয়ত্ত করল তার চাইতেও বেশি মূল্যবান হচ্ছে সে নিজে কী সৃষ্টি করল, নিজেকে কতটা প্রকাশ করতে পারল। তার চিন্তা ও বাক্যের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নমনীয় উপাদান দিয়ে বিভিন্ন বস্তু ও জীবনের রূপায়ণ, কেবল মুখস্তের মধ্য দিয়ে বাক্য আহরণের চাইতে তা বিকাশ ও পরিণতির পক্ষে অনেক বেশি উপযোগী।[১৭] মুখস্ত করা যে প্রকৃত শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে যথেষ্ট নয় সে কথা রোকেয়াও বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেন, "তাহাদের বাকশক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে"।[১৮] অর্থাৎ, তাঁর মতে, "কেবল অন্যের বক্তব্য মুখস্ত করে উদ্‌গীরণের মাধ্যমে নয় বরং চোখ, কান এবং চিন্তাশক্তির যথানিয়ম অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষালাভ করা সম্ভব। ইন্দ্রিয়সমূহকে সবল করে ব্যবহার করতে পারাটাই যে প্রকৃত শিক্ষা সে কথা মারিয়া মন্তেসরিও বিশ্বাস করেছেন আন্তরিকভাবে। আর সে জন্যই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়সমূহকে সবল করার বিভিন্ন রকম আয়োজন রেখেছেন। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের যতটা সম্ভব আলাদা করে প্রশিক্ষণদানের পক্ষপাতীও ছিলেন তিনি।"[১৯]

বেগম রোকেয়া শিক্ষা বলতে প্রকৃত সুশিক্ষা বোঝেন এবং তাঁর মতে শুধু গোটা কতক বই পড়তে পারা বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়। তিনি চেয়েছেন সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদের নাগরিক অধিকার অর্জন করতে সক্ষম করবে। এই শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক দুই রকমই হতে হবে।[২০] মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার আওতায় তিনি যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন এখনকার আলোচনা সেগুলো সম্বন্ধে। রোকেয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র এইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতি

www.pathagar.com

বেশি মনোযোগ দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ না করিয়ে দেশ ও ধর্মকে অধিক ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়া দরকার।[২১]

পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানপাঠের ওপর রোকেয়া বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সৌরজগত' গল্পে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের কথাই বলেছেন প্রথমে।[২২] 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পটিতেও বিভিন্নভাবে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছেন এবং অল্প বয়স থেকেই যে এই পাঠ শুরু করা দরকার তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। রোকেয়ার বক্তব্য এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করা যায়। "তাহাদের আলোচ্য বিষয় ছিল বায়ু। বায়ুর শৈত্য, উষ্ণতা, লঘুত্ব, গুরুত্ব, বায়ুতে কত প্রকার গ্যাস আছে; কি রূপে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাষ্প, মেঘ, সলিল এবং শীতল তুষারে পরিণত হয় ইত্যাদি"।[২৩] অন্য জায়গায় লিখেছেন, "অল্পকালের মধ্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন, তাদ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়।[২৪] অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়গুলোর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গভীর অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। কারণ বিজ্ঞানের চর্চাই যে উন্নয়নের চাবিকাঠি সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। তাঁর এই মনোভাব তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পে।

বিজ্ঞান বলতে আমরা বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের যে বিষয়টিকে বুঝি, পাশ্চাত্যে তার অন্তর্ভুক্তির সূচনা যদিও ঘটেছিল সতের শতকেরই ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন ও মোরাভিয় শিক্ষাব্রতী জন এমোস কমেনিয়াস-এর কাজের মাধ্যমে। কিন্তু নিয়মিত উপস্থিতি সোচ্চার হয়নি উনিশ শতকের আগে। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হেনরি হাক্সলি বলেন শিল্পবিপ্লবের জন্মভূমি ইংল্যান্ডের পক্ষে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত না করাটা মোটেও উচিত হচ্ছে না। এরপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞানকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করে। ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার মানবিক বিষয়গুলোর চেয়ে বিজ্ঞানকে বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন তাঁর What Knowledge is Most Worth শীর্ষক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।[২৫] শিক্ষার ইতিহাসে এর বিরুদ্ধ মতও কম জোরালো ছিল না। তাঁদের মতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রম সংকীর্ণ এবং কেবল ব্যবহারিক উপযোগিতা নির্ভর। অন্যদিকে মানবিক পাঠ্যক্রম সরবরাহ করে এমন সাধারণ অনুশীলন ব্যবস্থা যা মনের শক্তিকে যে কোনো দিকে পরিচালিত করার যোগ্য করে তোলে। তাছাড়া এই পাঠ্যক্রম বস্তুতান্ত্রিকতার ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিকতার ওপরও গুরুত্ব দেয়। ফলে নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকে নিবিড়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, গুরুত্ব প্রমাণের এই প্রতিযোগিতার ফলে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমের অনুসারীদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তেই থাকে। অথচ প্লেটোই প্রথমে পঠনীয় বিষয়গুলোকে দুটো দলে ভাগ করলেও কোনোটিকে কোনোটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলেন নি। বরং দু'দলের বিষয়বস্তুই সবার জন্য অবশ্য পঠনীয় বলেছেন। বিশ বছর বয়স পর্যন্ত

www.pathagar.com

প্রধানত শরীরচর্চা ও সঙ্গীত, পরবর্তী দশ বছর বিজ্ঞানসমূহ এবং তার পরবর্তী পাঁচ বছর দর্শন।[২৬] রাসেলও উভয় ধরনের বিষয়বস্তু পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, মানবিক ও বিজ্ঞানের মধ্যে আপোষরফার মাধ্যমে আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। তাঁর মতে, শিক্ষায় মানবিক উপাদান অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেগুলোকে হতে হবে যথোচিতভাবে সহজসাধ্য, যাতে করে সেই সব উপাদানের জন্য স্থান সংকুলান করা যায়, যেগুলো ছাড়া বিজ্ঞানের অবদানে সম্ভব হয়ে ওঠা নতুন পৃথিবী কখনোই গড়ে তোলা যেত না।[২৭] রোকেয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়ার সাথে সাথে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয় শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন। এছাড়া ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারটিকেও তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।[২৮] মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজি ও অন্যকিছু ভাষা শেখাও যে, আত্মোন্নয়নের পক্ষে উপকারী, তিনি সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন।[২৯] তিনিও বুঝতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উভয় ধরনের জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সুষম হবে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন স্থানের পরিবেশ ও মানুষের জ্ঞানদানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রোকেয়ার মতে, প্রকৃতি আমাদের ভোগের জন্য তার অক্ষয় ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করে রেখেছে, আমাদের উচিত অতল জ্ঞানসাগরে ডুবে সেই রত্ন আহরণ করা। সুতরাং এজন্য যা কিছু দরকার তার সবই শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩০]

মানসিক শিক্ষার মধ্যে আর যে দুটি বিষয়ের ওপর রোকেয়া বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা। ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না, ভাল চরিত্র গঠন কি কেবল ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব নাকি ধর্মেরও এতে ভূমিকা আছে, ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি সহযোগীর হবে, না বিরোধীর হবে ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাসে প্রচুর দ্বন্দ্ব ও তর্কবিতর্ক রয়েছে।[৩১] রোকেয়ার মতে, ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁর মতে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নেই। (ধর্ম বলতে তিনি ইসলাম ধর্মকে বুঝিয়েছেন বলেই মনে হয়।) যথাসাধ্য জ্ঞানোন্মেষ ধর্মেরই এক অঙ্গ। বরং জ্ঞান ধর্মের প্রধান অঙ্গ।[৩২] তাঁর মতে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরআন শিক্ষাদান করা সবচেয়ে বেশি দরকার। কারণ তাঁর মতে আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কোরআন শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য কোরআন শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখির মতো আরবি শব্দ আবৃত্তি করানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর মতে, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরআনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, কেউ যেন মনে না করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন শিক্ষা দিতে বলে তিনি গোঁড়ামির পরিচয় দিচ্ছেন, কারণ গোঁড়ামি থেকে তিনি বহুদূরে। তাঁর মতে, আসলে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরআনে পাওয়া যায়।[৩৩] তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলাম 'অতি সুন্দর ধর্ম,' এর রয়েছে 'অতি সুন্দর আচার প্রথা'। এগুলো সম্বন্ধে জানা এবং তা জীবনের

www.pathagar.com

কাজে লাগানোর জন্য কোরআন শরীফের শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।[৩৪] তাঁর মতে, কোরআনের সর্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআনের বিধান অনুযায়ী ধর্মকর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।[৩৫] নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে যেসব গুণাবলির উন্মেষ দেখতে চেয়েছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সত্যবাদিতা, আত্মনির্ভরতা, সাহসিকতা, কর্তব্যবোধ, একতা, শিষ্টাচার (অর্থাৎ অগ্রজকে সম্মান ও অনুজকে স্নেহ) ইত্যাদি। 'সৌরজগত' গল্পটিতে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি এ সম্পর্কিত মতামত তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে আত্মনির্ভরতা ও সাহসিকতার প্রয়োজনীয়তার কথা ও ভীরুতার কুফল সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন। 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন শিশুদের বাড়ির কাজের লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার শেখানোর কথা। বেতনভোগী হলেও তারা যে মানুষ তাও তিনি আমাদের বুঝতে বলেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি হিংসা-দ্বেষ, ক্ষুদ্রস্বার্থ ত্যাগ করা ও সাম্যবাদিতার চর্চা করাও শেখাতে বলেছেন। আড়িপাতাও যে একটি নৈতিক অপরাধ তাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "লুকাইয়া কিছু শুনা উচিত নহে; সাবধান"।[৩৬]

অবসর বিনোদনের শিক্ষাও তাঁর পাঠ্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেছেন, অবসর সময়টা পরনিন্দায়, বৃথা কোন্দলে বা তাস খেলায় না কাটিয়ে নির্দোষ আমোদে কাটালে ভাল হয়। সেজন্য তিনি ছবি আঁকা ও সঙ্গীত শেখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[৩৭] নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়গুলোও তাঁর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩৮] প্রাচীণ গ্রিক-রোমক আমলের পরে সঙ্গীত, অভিনয়, ছবি আঁকা, মাটির কাজ, সূঁচিশিল্প ইত্যাদি ধরনের ললিতকলা পাশ্চাত্য শিক্ষায় নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে নতুন করে গুরুত্ব পেতে শুরু করে উনিশ শতকে এসে।[৩৮] ছবি আঁকা শেখানোর ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে জন লক এবং পরে হোরাসে মান বলেছেন, যা একটা পুরো পাতার গদ্যকথা বলতে পারেনি, তা হয়তো কারো সুনির্বাচিত কয়েকটি রেখা বুঝিয়ে দিতে পারে।[৩৯] ফ্রয়েবেল বলেন বর্তমান, সময়ে ছবি আঁকাকেই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন কাজ বলা যায়।'[৪০] যার মাধ্যমে সৃজনশীলতার চর্চা হতে পারে। উনিশ শতক থেকে সঙ্গীত পাঠ্যক্রমের আওতায় এলেও বিশ শতক থেকে শুরু হয় নাচ ও যন্ত্রসঙ্গীতকে এর অন্তর্ভুক্ত করা।[৪১] ডিউই বলেছেন, বিষয় হিসেবে কলাকে পাঠ্যকর্মের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন অবস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বিরাট ভুল করে ফেলা হয়েছিল। অবশ্য তিনি আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন এটা বুঝতে পেরে যে, কলা তার পুরোনো অবস্থান ফিরে পেয়েছে এবং উত্তরোত্তর আরো উন্নততর অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তার মতে, মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক উভয় দিক থেকে বিচার করেই বলা যায়, কলা বিলাসিতা বা বাহুল্য নয় বরং বিকাশ প্রক্রিয়ার মৌলিক শক্তি।[৪২]

বেগম রোকেয়া বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে হাতের কাজেরও একটা বিশেষ স্থান দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে নানা রকম হাতের কাজ করানোকেই তিনি যথেষ্ট মনে

www.pathagar.com

করেননি বরং সেই সব শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন। হাতের কাজকে রুশো এবং ফ্রয়েবেলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। তাঁদের মতে সক্রিয়তা শিশু-কিশোরদের স্বভাবধর্ম। তাঁরা আরো বলেছেন, শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা যেমন খেলার মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে তেমনি একটু বড় হবার পর তা নানারকম হাতের কাজের মাধ্যমে আকার পায়।[৪৩] ডিউই তাঁর পাঠ্যক্রমে হাতের কাজের জন্য রান্না, সেলাই, তাঁতবোনা, কাঠের কাজ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি অবশ্য এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এসব বিষয়কে পাঠ্যক্রমে কেন্দ্রীয় স্থান দিয়েছেন।[৪৪] রোকেয়াও মানসিক উৎকর্ষসাধনের জন্য কেবল বইপড়া বিদ্যার ওপর নির্ভর করাকে যথেষ্ট বলে মনে করেন নি, বিভিন্ন রকম সৃজনশীল কর্মের সুযোগ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। চারু ও কারুকলা শিক্ষাদানকে যে তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তা নয়, সাখাওয়াত মেমরিয়াল স্কুলের শ্রেণী সময়তালিকাতে এসব বিষয়ের জন্য সময় বরাদ্দ রেখে নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৪৫]

মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক শিক্ষাকেও রোকেয়া সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই।" তাঁর মতে, দেহে স্ফূর্তি না থাকলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। শরীরে স্ফূর্তি আনতে হাত পা খাটানো অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। তিনি আরো বলেছেন শুধু ঘোরাফেরা করলেই ব্যায়াম হয় না। প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করা দরকার।[৪৬] শুধু তাই নয়, শারীরিক শিক্ষার জন্য তিনি মেয়েদের লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধানভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং সব রকম ঘরের কাজ শেখাতে বলেছেন। তিনি শুধু লাপঝাঁপ, নাচ ইত্যাদির চেয়ে ঐ ধরনের শরীরচর্চা শতগুণে শ্রেয় বলেছেন।[৪৭] কারণ ঘরের শ্রমনির্ভর কাজগুলো করলে দু'তরফা লাভ হবে। কাজও হবে শরীরও ভাল থাকবে। তাছাড়া লাঠিখেলা ধরনের শরীরচর্চার মাধ্যমে তো দুর্বৃত্তের হাত থেকে আত্মরক্ষার যোগ্যতাও কিছুটা অর্জন করা যায়। তিনি খোলা মাঠে প্রাতঃভ্রমণকেও বাঞ্ছনীয় বলেছেন। শারীরিক শিক্ষা বা ব্যায়াম প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রিক পাঠ্যক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হতো। প্লেটো বলেছেন, "শরীরচর্চা শিশু বয়স থেকেই হওয়া উচিত; এই প্রশিক্ষণ সযত্ন হওয়া উচিত এবং সারাজীবন ধরে চলা উচিত"।[৪৮] কিন্তু মধ্যযুগের পাঠ্যক্রম থেকে শরীরচর্চা বা শারীরিক শিক্ষা বাদ পড়ে। তৎকালীন যাজক পুরোহিতেরা বিশ্বাস করতেন, "দেহ গুরুত্ব পাবার উপযুক্ত নয় কারণ দেহ হচ্ছে নিম্ন স্তরের প্রবৃত্তির পীঠস্থান"।[৪৯] এরপর সতের শতকে লকের মন্তব্য Mens sana, in corpore sano অর্থাৎ সুস্থ দেহে সুস্থ মন বিরাজ করে শিক্ষাবিদ ও সমাজপতিদের ভাবাতে শুরু করে। রুশো তাঁর 'এমিল' গ্রন্থে শিক্ষার্থীদের ছুটোছুটি, লাফঝাঁপ, গাছেচড়া ইত্যাদির পুরো স্বাধীনতা দিতে বলেছেন। রুশোর প্রভাবে বাসেডো, ফ্রেডারিক গাটসমাথ, লুডউনইং বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে শারীরিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পরে স্পিয়েসের প্রচেষ্টায় এই শিক্ষা বিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

পাঠ্যক্রমের নিয়মিত অংশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৫০] আমাদের দেশে অবশ্য বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত খেলাকে প্রাণীর উদ্দেশ্যহীন, অসংলগ্ন ও অনর্থক আচরণ বলেই বিবেচনা করা হয়েছে।[৫১] সে ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই খেলা বা শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং তাঁর বিদ্যালয়ে নিয়মিত ড্রিল করানোর ব্যবস্থা করেছেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন বলেই মনে হয়। সাধারণভাবে তিনি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে না বুঝিয়া থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমি বুঝাইয়া বলি"[৫২]। তাঁর এই বক্তব্য থেকে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর মত বোঝা যায়। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা কেবল দাতার ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা কেবল গ্রহীতার হবে না বরং শিক্ষাদানের কাজ প্রশ্ন উত্তরের আদান প্রদানের মাধ্যমে অগ্রসর হবে। রোকেয়া এক জায়গায় বলেছেন, "আমি কাল সকালবেলা মেঘমালা দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রশ্ন করিব।"[৫৩] তাঁর এই বক্তব্যে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। বাস্তববাদীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষাপাতী। অর্থাৎ, তাঁরা নিষ্ক্রিয় পঠনপাঠনের চেয়ে বাস্তববস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণকে জ্ঞানলাভের পন্থা হিসেব বেশি গুরুত্ব দেন।

কেবল পর্যবেক্ষণ নয়, শিক্ষালাভের পদ্ধতি হিসেবে অনুসন্ধান, শ্রেণীকরণ ও পরীক্ষণের উপরেও রোকেয়া গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ভূগোল পাঠদানের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তিনি অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৫৪] আধুনিক বিজ্ঞনীরা জানেন প্রাপ্ত উপাত্তের শ্রেণীকরণ জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল ও বোধগম্য করার একটি অপরিহার্য পন্থা। রোকেয়াও এটি ব্যবহারের কথা বলেছেন।[৫৫] পরীক্ষণ ছাড়া বিজ্ঞান শেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পরীক্ষণের মাধ্যমেই শেখাতে চেয়েছেন। এইসব পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খেলার আনন্দও উপভোগ করবে বলে তিনি মনে করতেন। অর্থাৎ রোকেয়া চাইতেন আনন্দঘন পরিবেশে খেলার ছলে পরীক্ষণ করতে করতে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের সত্য বা মূল সূত্রগুলো শিখে নেবে।[৫৬] শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে পরীক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়ায় রোকেয়াকে প্রয়োগবাদীদের দলভুক্ত করা যায়। কেবল বইপত্রের ওপর নির্ভরতার বদলে গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেয়ার কথাও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[৫৭]

চার দেয়ালের বাইরে প্রকৃতির মাঝখানে না গেলে যে শিক্ষা সম্পূর্ণ ও কার্যকর হয় না সে ব্যাপারেও রোকেয়া সচেতন ছিলেন। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ বা বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সুযোগ করে দিয়ে প্রকৃতিপাঠ, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এভাবে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিপদাপদ ও দুর্গমতাকে উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা উচিত বলেই তিনি মনে করতেন।[৫৮] এক্ষেত্রে রাসেলের বক্তব্য স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন ইতিহাস ও ভূগোলকে শিক্ষার্থীদের কাছে

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় করে তোলা যায় যদি সেগুলোকে ভ্রমণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে পড়ানো হয়। তিনি ভূগোল পড়াতে চেয়েছেন কিছুটা ছবি দেখিয়ে ও পর্যটকদের গল্প বলে, তবে প্রধানত এ সংক্রান্ত চলচ্চিত্র দেখিয়ে, যার মাধ্যমে দর্শনীয় বিষয় শিক্ষার্থীর সামনে মূর্ত হয়ে উঠবে। ইতিহাসের বেলাতেও তিনি মোটামুটি এই ধরনের পদ্ধতিই অনুসরণ করতে চেয়েছেন।[৫৯] শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, রোকেয়ার মতে, ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যেও ভ্রমণের আবশ্যকতা রয়েছে। তাঁর মতে, ঈশ্বরের সৃষ্টি যত বেশি দেখা যায় ততই তাঁর প্রতি ভক্তি বাড়ে। চোখ কান ঠিকমত ব্যবহার করে সৃষ্টি জগতের পরিচয় না নিলে স্রষ্টাকে ভালভাবে চেনা যায় না।[৬০]

কোরআন শিক্ষাদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও রোকেয়া বাস্তববাদী। কোরআন শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কেউ যদি ডাক্তার ডেকে রোগের ব্যবস্থাপত্র নেয়, কিন্তু তাতে লেখা ওষুধপত্র ব্যবহার না করে সেই ব্যবস্থাপত্রটিকে মাদুলি করে গলায় পরে থাকে আর দৈনিক তিনবার করে পড়ে তাতে তো আর রোগ সারবে না। আমরাও কোরআনে লেখা ব্যবস্থানুযায়ী কোনো কাজ করি না, শুধু তা পাখির মতো পড়ি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরে অত্যন্ত যত্নে উঁচু জায়গায় রাখি।[৬১] তিনি এই অবস্থাকে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার প্রকৃত পন্থা বলে মনে করেননি। তাঁর মতে উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে শ্লোকসমূহের অর্থ বলা ও তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া। এভাবে শিক্ষা না দিলে শিক্ষার্থীদের কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলার যোগ্য করে তৈরি করা যাবে বলে তিনি মনে করেন নি। এ যোগ্যতার অভাবেই মানুষ অল্প আঘাতে বা প্ররোচনাতেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় বলেই তিনি মনে করেছেন। তিনি নামাজে ব্যবহৃত দোয়া কালামেরও অর্থ বুঝিয়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন।[৬২]

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা বা আচরণ এবং যোগ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রোকেয়ার বক্তব্যে এ সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, শিক্ষকের ভূমিকা হবে আন্তরিকতাপূর্ণ,[৬৩] হাসিখুশি ও সহিষ্ণু,[৬৪] শাসন ও শৃঙ্খলা বিধানে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত[৬৫] এবং যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত।[৬৬] রোকেয়ার মতে, শিক্ষকের থাকতে হবে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপক ও সমন্বিত জ্ঞান, যাতে তিনি শিক্ষার্থীর (শিশু-কিশোর), প্রশ্নগুলোর সম্যক উত্তর দিতে পারেন।[৬৭] একটা সময় ছিল যখন শিক্ষা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক, অর্থাৎ, শিক্ষকের কাজকর্ম ও আচরণ ছিল পুরোপুরি কর্তৃত্বপূর্ণ। বেগম রোকেয়া যখন শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন তখনও প্রায় সব বিদ্যালয়ে ঐ ধারাই বর্তমান। কিন্তু রোকেয়া তাঁর উন্নত মননের আলোকে একেবারে বিপরীতধর্মী ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। সাম্প্রতিককালের শিক্ষাদর্শনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলে। রাসেল বলেছেন, শিক্ষকের উচিত তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে ভালবাসা।[৬৮]

শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় মানুষের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

উন্নয়নের একমাত্র হাতিয়ার যে শিক্ষা, এ সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তাছাড়া কেবল তাত্ত্বিক শিক্ষা বা বইপড়া বিদ্যার যে কোনো উপযোগিতা নেই এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি তত্ত্বের সাথে সে তত্ত্বের ব্যবহার সম্পর্কেও জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। শিক্ষা কাকে বলে, এ বিষয়েও তিনি প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। সাধারণত শিক্ষা বলতে আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানের আওতায় থেকে কিছু নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুরণ করার পর সনদ পাওয়াকে বুঝে থাকি। কিন্তু রোকেয়ার বক্তব্য এক্ষেত্রে গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত। তাঁর মতে, সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতার অনুশীলিত উন্নয়নই শিক্ষা।

রোকেয়ার মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হলো মস্তিষ্ক ও মন উন্নত করা, ইন্দ্রিয়গুলোকে সবল করে ব্যবহার করা, চিন্তাশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো। তাঁই এই মত পর্যালোচনা করে বোধহয় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে, তিনি ব্যক্তির উন্নয়নকে অর্থাৎ, শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। অবশ্য ভাববাদী দার্শনিকেরা এ রকম দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করে থাকেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যেহেতু ব্যক্তিকে নিয়েই গঠিত হয় সমাজ, তাই ব্যক্তির উন্নয়নই সামাজিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারে। তাই প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থার চরম লক্ষ্য যদিও আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক তৈরি করা তবু তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন সেই প্রশিক্ষণকে যা দেওয়া হবে শিশুর প্রাথমিক সহজাত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর জন্য। তবে বেগম রোকেয়া সেই শিক্ষাও চেয়েছেন, যা শিক্ষার্থীদের নাগরিক অধিকার অর্জনে সহায়তা করবে। অর্থাৎ, সুনাগরিকতা অর্জনও তাঁর শিক্ষার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর মতে শিক্ষার কর্মকাণ্ড যেমন পরিচালিত হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে তেমনি পরিচালিত হবে সুনাগরিক হতে সহায়তা করার লক্ষ্যে। রোকেয়ার এই মত শিক্ষাবিজ্ঞানের সমকালীন সংব্যাখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য সমকালীন দার্শনিক জন ডিউই ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য—এই দুই চরম দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করেছেন শিক্ষার সাথে গণতন্ত্রের নিবিড় সম্পর্কের ধারণা প্রবর্তন করে। ডিউই তাঁর Democracy and Education, The School and Society, ইত্যাদি গ্রন্থগুলোতে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদা দু'দিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে এদুয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পথ প্রদর্শন করেছেন। তবে রোকেয়া সুনাগরিকতা অর্জনকে শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেও তা চেয়েছেন ব্যক্তির অবস্থান থেকেই। অর্থাৎ রোকেয়ার কাছে ব্যক্তির সুসমঞ্জস উন্নয়নই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

বেগম রোকেয়া পাঠ্যক্রম নির্বাচনের সময় তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর বিষয়গুলোর পাশাপাশি নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্রগঠনকে তালিকায় স্থান দিয়েছেন; বরং এগুলোর প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ না করিয়ে দেশ ও ধর্মকে বেশি ভালবাসতে শেখানো দরকার। নিয়মিত পাঠ্যক্রমে ধর্মশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বর্তমানকালের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণ নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

সুনজরে দেখবেন না। কিন্তু বেগম রোকেয়ার মতো ক্ষণজন্মা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অন্যান্য মতামত যেখানে আলোকবর্তিকা হয়ে আজ পথ দেখাচ্ছে, যেখানে তাঁর এই মতটিও দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে বলে মনে হয়।

শিক্ষাবিজ্ঞানের সাহিত্যে এখন যে বিষয়গুলোকে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি বলা হয় রোকেয়া সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে তাঁর শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছেন। মানব ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের জন্য যেমন প্রয়োজন যুগসঞ্চিত জ্ঞানরাশির সঙ্গে পরিচিত হওয়া তেমনি প্রয়োজন কিছু সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়া। শেষেরটির জন্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি। এই উপলব্ধির মাধ্যমে রোকেয়া একজন প্রকৃত শিক্ষাদার্শনিকের পরিচয়ই প্রদান করেছেন। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রোকেয়ার মতামত আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এইসব বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা বোধহয় অনায়াসেই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে, সাহিত্যিক ও সমাজসেবীর পাশাপাশি রোকেয়া ছিলেন একজন সত্যদ্রষ্টা, মননশীল ও প্রাগ্রসর মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষাদার্শনিক। বিশ শতকের প্রথম সিকিভাগের মধ্যেই তিনি শিক্ষাবিষয়ের যেসব বক্তব্য রেখেছেন সেই রকম বক্তব্য আমরা সেই সময়ের এবং তাঁর পরের দশকগুলোর পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে পাই। সেইসব দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রতীচ্য এগিয়ে গেছে বহুদূর। আমরা না পেরেছি তাদের অনুসরণ করতে না পেরেছি স্বদেশের মনীষার মূল্য দিতে। শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া খাতুনও[৬৯] তেমনি অনাদৃত মনীষা।

তথ্যনির্দেশ

১. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, *বাংলা একাডেমী*, ঢাকা, ১৯৮৪. পৃ. ২১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৬. F. Froebel, *The Education of Man*, Tr. by W.N. Hailman, New York, D. Appleton, 1909, p. 16
৭. By Education must be understood the active help given to the normal expression of the life of the child. M. Montessori, *The Montessori Method, Tr. Anne E. George*, London, William Heinemann, 1912. p. 56
৮. Robert R. Rusk, *Doctrines of the Great Education*, London, Macmillan Education Lt. 1987, p. 179
৯. Froebel, Ibid., p. 68
১০. Johann Friedrich Herbert, *The Text Book of Psychology* (Ist ed. 1816) Vol. IV. Herbert's Collected Works in German, Langenoda, 1891, pp. 205-436

www.pathagar.com

১১. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
১৩. প্রাগুক্ত, Rusk, পৃ. ১৮৮
১৪. B. Russell, *On Education*, London, George Allen and Unwin Ltd, 1948, p. 108
১৫. Plato, The Laws, Sec. 653
১৬. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত পৃ. ১৮
১৭. Froeble, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
১৮. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত পৃ. ১১৯
১৯. Rusk পূর্বোক্ত পৃ. ২০১
২০. "শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটাকতক পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। . . . শিক্ষা-মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। . . . শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আঠা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া"। রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
২১. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
২২. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
২৩. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
২৪. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
২৫. J.S. Brubacher, *A History of the Problems of Education*, New York and London, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1947, p. 262-267
২৬. Henry Thomas and Dana Lee Thomas, *Living Biographies of Great Philosophers*, New York, Garden City Publishing Co., 1950, pp. 12-14.
২৭. Russell, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
২৮. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫, ৯৭, ১১১, ১১৩
২৯. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬, ৯৭
৩০. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭, ১১২, ১১৩, ১১৫
৩১. J. S Brubacher, Ibid., pp. 318-356.
৩২. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৩৩. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৩৪. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৩৫. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৩৬. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৩৭. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৩৮. J. S Brubacher, Ibid., P. 284
৩৯. J. S Brubacher, Ibidm., P. 285
৪০. J. H. Hughes, Frocbels Educational Laws for all Teachers. D. Appleton Century Company, Inc., New York, 1891, p. 256
৪১. Brubacher, Ibid, p. 287.

www.pathagar.com

৪২. "There has been great loss in relegating the Arts to the relatively trivial role which they finally assumed in schooling, and there is corresponding promise of gain in the efforts making in the last generation to restore these to a more important position, Viewed both psychologically and socially, the Arts represent not luxuries and superfluities, but fundamented forces of Development".

Dewey, j., in Monroe, *Cyclopedia of Education, vol. I, P.* 224, The Macmillan Company, New York, 1912

৪৩. Brubacher, Ibid, p. 282.

৪৪. Brubacher, Ibid, p. 283.

৪৫. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

৪৬. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

৪৭. রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

৪৮. "Gymnastics as well as music should begin in early years; the training in it should He careful and should contnue through life". Plato's *The Republic,* Translation into English, B. Jowett, The Modern Library, N. Y. P. 108

৪৯. Physical education, example, gave way to as criticism. Monks, if not knights, reasoned, why cultivate the body when it is the seat of the baser appetites". Brubaeher, p. 255

৫০. Ibid., pp. 273-275

৫১. অরুণ ঘোষ, *'খেলা ও শিক্ষা' শিক্ষাবিজ্ঞানের দর্শন ও মূলতত্ত্ব,* এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইর্স, কলিকাতা, ১৯৮৬ পৃ. ১৯৬

৫২. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৫৩. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৫৪. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১

৫৫. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩ আমার সংগৃহীত কুসুমরাজি হইতে তাহা বাছিয়া লইতে পার?, পৃ. ১১৮ 'তরুলতার গঠন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও আমরা বৈষম্য ও সাদৃশ্য পাশাপাশি বিদ্যমান দেখিতে পাই'।

৫৬. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১, আমি কাল পোটাশিয়াম জলে ফেলিয়া তামাশা দেখিব।

—পোটাশিয়াম জলে ফেলিলে কি তামাশা হইবে?

—কেন তোমার মনে নাই? —উহা জলে ফেলিবামাত্র জ্বলিয়া উঠিবে।

—হ্যাঁ মনে পড়িল। আমি খেলা করিব, সোডিয়াম ও গরমজল লইয়া।

৫৭. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৫৮. বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২, ১০৭, ১১০-১১২

৫৯. Russell, পূর্বোক্ত পৃ. ২০৮-২০৯

৬০ বেগম রোকেয়া রচনাবলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

www.pathagar.com

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮, পৃ. ১৭৬-১৯০
৬৩. প্রাগুক্ত, "ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং আমোদ বোধ করিয়া হাসিতেছেন।" পৃ. ৯৫
৬৪. প্রাগুক্ত, "হিমাদ্রিও ঠিক গওহরের মত সহিষ্ণু।" পৃ. ১১১
৬৫. প্রাগুক্ত, "দোষ বুঝাইয়া না দিলে ওরা ধমক মানে না।" "বিনা দোষে, বিনা কারণে ধমক মানিবেই বা কেন? হাসিলে দোষ কি?" পৃ. ১০৪
৬৬. প্রগুক্ত, "নানা প্রকার প্রশ্ন দ্বারা পিতার ধৈর্য্যগুণ পরীক্ষা করিতেছে।" পৃ. ৯৫
৬৭. প্রাগুক্ত, ৯৫. ১০৩
৬৮. Russell, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৫
৬৯. বেগম রোকেয়া রচনাবলি পৃ (২৩)। রচনাবলিতে মুদ্রিত চিঠিতে বেগম রোকেয়া নাম সই করেছেন 'রোকেয়া খাতুন'। মনে হয় এটি তাঁর নিজস্ব পুরো নাম। তাই পাশ্চাত্য ধারা অনুসরণ না করে অর্থাৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন না লিখে 'রোকেয়া খাতুন' নামটিরই উল্লেখ করা হলো।

www.pathagar.com

পাকিস্তান শিক্ষা কমিশনে নারীশিক্ষা

মাসুদুল হক

বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সমাজ সংস্কৃতিতে মিশে থাকা ধর্মীয় প্রভাব নারীদের অধস্তন ও প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এর কারণ ও উৎস সন্ধানে ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই— "পিতৃতান্ত্রিকতা ও পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো সমাজে নারী পুরুষের জন্য দু'টি পৃথক জগতের নির্মাতা যা লালনে ধনতন্ত্র বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এভাবে একদিকে পাবলিক বিষয়াদি বা বাইরের পরিমণ্ডল পুরুষের করায়ত্ত অন্যদিকে সাধারণভাবে নারী গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের সাথে সংশ্লিষ্ট। শিল্প অর্থনীতির প্রসারের সাথে সাথে নারীদের মর্যাদা উৎপাদক হিসেবে হ্রাস পায় এবং জেন্ডারধর্মী বা লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন স্থিতিশীল হয় যা পুরুষতন্ত্র সৃষ্ট বিভাজিত ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ নিয়মে নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্কের ভিত্তি দৃঢ়তা লাভ করে। ফলে পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, ধর্ম সকল ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জোরদার হয় এবং পুরুষ নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে যার প্রকাশ ঘটে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনে। পুরুষতান্ত্রিক হেজিমোনিতে এবং সর্বস্তরে নারী অধস্তনতায়।"[১] মোদ্দা কথা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা এবং সেই সঙ্গে স্থায়ী বিবাহপ্রথার উদ্ভবের কালেই প্রতিষ্ঠিত হয় এমন এক পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, যার প্রভু বা মালিক হল পুরুষ। এমনি পরিস্থিতিতে পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। তাই নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুধাবনে নারী শিক্ষার অবস্থান জানাও জরুরি।

বর্তমান সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষাগত যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তা প্রাচীন ভারতীয় ও সংস্কৃতিরই প্রতিফলন মাত্র। পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ধর্মশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী নারীর জীবনের প্রধান কাজ ছিল বিবাহ করে পুত্র সন্তানের জন্মদান এবং স্বামীর বংশ ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করে পিতৃতন্ত্রের বুনিয়াদকে দৃঢ় করা।

www.pathagar.com

কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তাদের শিক্ষাও ছিল স্বাভাবিকভাবেই অবহেলিত।[২] উল্লেখ্য যে, দ্রাবিড়দের মধ্যে নারীদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের কারণে তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষার একটি ক্ষীণ স্রোতরেখা লক্ষ করা যায়।[৩] এ-ছাড়া আর্যদের প্রাথমিক অবস্থায় সমাজে নারীদের সম-অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে বহু তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। মহাভারতেও কোথাও কোথাও নারীদের অশাস্ত্রা বললেও নারীশিক্ষার কথা উল্লেখ রয়েছে। বেদের মন্ত্রে কেউ কেউ নারীদের অধিকার না দিলেও জানা যায় বহু বেদমন্ত্র নারীদের দ্বারাই রচিত।[৪] অনুমান করা যায় যে, আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের ক্ষণে প্রধানত অনার্য প্রভাবের ফলেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতিক্রমী নারী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নারীদের সামনে কোনো প্রথাগত শিক্ষার আদর্শ অথবা ব্যবস্থা ছিল না। এ-ছাড়া স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে মনু নারীদের জন্য বেদপাঠ নিষিদ্ধ করে ব্রাহ্মণ নারীদের শিক্ষার পথও সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেন। কারণ সে কালে শিক্ষা বলতে ধর্মগ্রন্থ (বেদ) শিক্ষাই বোঝাতো। আর মনুর বিধানানুসারে শূদ্রের জন্য বেদপাঠ শুধু নিষিদ্ধই ছিল না, বেদপাঠ শোনাও ছিল অপরাধ। সুতরাং সব বর্ণের নারীকেই শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত করে সমাজের নিচের তলায় রাখাই শাস্ত্রকার ও সমাজপতিদের উদ্দেশ্য ছিল।[৪] এরপর হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মহামতি গৌতমবুদ্ধ তাঁর বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনে নতুন চেতনা সৃষ্টি করলেন। জন্মান্তরবাদ থেকে মুক্তির দর্শন প্রচার করে অপুত্রক হওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে নারীকে মুক্তি দিল বৌদ্ধ ধর্ম। পারলৌকিক কাজের বিষয় এই ধর্মে না থাকায় পুত্র-সন্তানের প্রয়োজন জরুরি ছিল না। পুত্র না থাকলে বাবার সম্পত্তি ও বংশরক্ষায় নারীর অধিকার স্বীকৃত হলো বৌদ্ধ ধর্ম।[৫] লক্ষণীয় বিষয় যে, বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের দৃশ্যত মুক্তি পেতে দেখা গেলেও মূলত এরা নতুন ধরনের নিষ্পেষণের সম্মুখীন হলেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হলেও বৌদ্ধ যুগেও মনুর শাসনে সমাজ চলত। তাতে সমাজে নারীর অবস্থান ভালো হয়নি বরং তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এ সময় নারীদের নাচে-গানে পারদর্শী করে গণিকাবৃত্তিতে অভ্যস্ত করা হয়। তৎকালীন সময়ে শিক্ষা বলতে নাচ-গানকেই শিক্ষা ধরা হতো। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলার নারীদের মধ্যে এক নতুন ধরনের জাগরণ এল। বৈষ্ণব সমাজ নারীর স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দেওয়ায় নারীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শাস্ত্র আলোচনার সুযোগ পেতেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, আধুনিক যুগে নারীশিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হওয়ার আগে বৈষ্ণবীরা নারী শিক্ষার একটা ধারা চালু করেছিলেন।[৬]

এ-দেশে একের পর এক শাসক এসে শাসন করেছেন ও নতুন নতুন ধর্ম প্রচারিত হয়েছে, সেই ধর্মগুলোর কিছু কিছু সূত্র বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু "মধ্যযুগে মুসলমানরা যখন বাংলার শাসন শুরু করেন (১২০৪ খ্রি:) তখন তারা বাইরের ধর্ম, আচার-আচরণ নিয়ে এলেন এবং বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে কোনোভাবেই অঙ্গীভূত হলেন না। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের যুগে আরব দেশে নারীর জন্য সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় যে সব অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা সেই সময়ের তুলনায় ছিল অনেক

www.pathagar.com

উদার ও তাতে নারী নির্যাতন অল্প মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হতো। শিশুকন্যা হত্যা, স্ত্রীর প্রতি নির্দয় আচরণ, সৎ মাকে বিয়ে করা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ হলো। নারী শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া হলো, স্ত্রীর জন্য খোরপোশ, মোহরানা বাধ্য করা হলো। বহু মুসলিম মেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হলো। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত নারীর অধিকার পূর্ব প্রচলিত ধর্ম থেকে উন্নত হলেও নারীরা বঞ্চিত থাকল। যেটুকু অধিকার নারীকে ইসলাম দিয়েছে সেটুকু অধিকারও কিন্তু বাংলার মুসলিম শাসকরা বাংলার নারীদের জন্য দিলেন না।"[৭] এই প্রেক্ষাপটে নারীশিক্ষাও রয়ে যায় তিমিরে।

১৭৬৫ খ্রি: ইংরেজরা বাংলা দেওয়ানি পায়। এরপর চলে ইংরেজ শাসন। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নারীদের সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা ও অধিকারের বিষয়ে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে রাজনৈতিক বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজ-ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর মর্যাদা, শিক্ষা ও অধিকারের কোনো পরিবর্তন বা তারতম্য ঘটেনি। এরপর উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রধানত ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এদেশে যে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের বীজ বপন হয়, তারই এক বিশেষ প্রভাবে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা বর্ণভেদ এবং অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছুটা সচেতনতা দেখা দেয়। সে সময় ইসলামের একত্ববাদ হিন্দুধর্মের সংস্কারকদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। আর এই বাতাবরণের মধ্যেই নারী-শিক্ষা বিষয়েও তৎকালীন সমাজে কিছুটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। সম্ভবত এ বিষয়ে প্রধান অবদান ছিল ব্রাহ্মসমাজের। এরই ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকের মধ্যভাগে যেসব মনীষী নারী-শিক্ষার বিষয়ে নিরলসভাবে সচেষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রগণ্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৫৫-৫৮ সালে বেশ কিছু সরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু সেই সময়েও সামাজিক কুসংস্কারের কারণে উচ্চ বর্ণ হিন্দু মেয়েদেরও স্কুলে ভর্তি করানো কঠিন ছিল। সে সময়ে সমাজে এরকম একটা ধারণা ছিল যে, শুধু বারাংগনার সমগোত্রীয় নারীরাই লেখাপড়া শেখেন।[৮]

ব্রিটিশ সরকার নারীদের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য কিছু কিছু আইন পাস করলেও সামগ্রিকভাবে নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই ধরনের পরিবেশে নারী-শিক্ষার প্রসার ঘটা সঙ্গত কারণেই কঠিন। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশের শাসননীতি, তা সে সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রীয় আইন যে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হোক না কেন, তার বৈশিষ্ট্য ভুললে চলবে না যে, এসবই গৃহীত হতো ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনের লক্ষ্য থেকে। মুসলিম সমাজের পারিবারিক সম্পর্ক, বিয়ে তালাক, খোরপোশ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ব্রিটিশ শাসক হস্তক্ষেপ করে নি। হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বিধবা বিয়ে, বহুবিধবা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে আন্দোলন হয়েছিল, সে রকম মুসলিম নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের আন্দোলন বিশ শতকের ত্রিশের দশকের আগে হয় নি। অর্থাৎ একই দেশের একই শাসকের

www.pathagar.com

শাসনাধীনে নারী সমাজের জন্য দুই ধরনের অধিকার নির্দেশিত হতো। উল্লেখ্য যে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উঁচু অভিজাত পরিবারে নারীশিক্ষার প্রচলন থাকার একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, গ্রামবাংলার গরিব সাধারণ নারীদের শিক্ষার কোনো সুযোগই ঘটেনি।[৯]

৫০ বছরের বেশি সময় ধরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্র চাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়ে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত এই দুটি পৃথক রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত এই দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলো। এ দেশের স্বাধীনতাকামী কোটি কোটি মানুষের বহু আত্মত্যাগ, জীবনোৎসর্গ এবং সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—তা অর্জিত হলো না। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো তৎকালীন পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন লীগ সরকার ক্ষমতায় পূর্ব, পশ্চিম উভয় প্রদেশের জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকটের জন্য পদক্ষেপ না নিয়ে দমননীতির আশ্রয় নিল। এমনই প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ করা, পারিবারিক আইনের সংস্কার ও নারী-শিক্ষার বিষয়গুলো হয়ে উঠলো উপেক্ষণীয়। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলার গড়ে ওঠা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে পূর্ব পাকিস্তানে বেআইনী ঘোষণা করা হলো ১৯৪৮ সালের ২৬ মে। এই সংগঠনের হিন্দু ধর্মাবলম্বী বহু নেত্রী ও কর্মী দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। পূর্ব পাকিস্তানে যারা রয়ে গেলেন তারাও প্রায় নিশ্চুপ হয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। সেই সময়ে নারী আন্দোলনের নেত্রীদের মধ্যে দেখা দেয় এক চরম হতাশা। তৎকালীন মুসলিম বাঙালি মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী এ-প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন :

> "কংগ্রেস ত্যাগ করি ১৯৩৫ সালে। দীর্ঘদিন সমাজসেবামূলক কাজ করার পর ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেই। তখন মনে হয়েছিল পাকিস্তান হলে আমরা শিক্ষা ও সম্পদে হিন্দুদের সমকক্ষ হতে পারব। পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে মেয়েরা যদি ভোট না দিতেন তবে পাকিস্তান হতো না। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সফল হবে না।"[১০]

অনুভব করা যাচ্ছে যে, তৎকালীন সময়ে নারী সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় আন্দোলনে তৎপর থাকতে পারলেন না; বরং নারীদের পুরনো চলতি সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিতে আবদ্ধ রেখে শুধু পারিবারিক দায়িত্ব পালনের জন্যই উৎসাহিত করা হলো। এমনি পরিস্থিতিতে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার বহু কমিশন ও কমিটি গঠন করে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে একটি শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে, তবে তার নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায়নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।" এই অধিবেশনে নির্দিষ্ট করে নারী-শিক্ষার কোনো উল্লেখ নেই।

এরপর ১৯৪৯ সালের ১৬ মার্চ তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার শিক্ষা সমস্যাকে ব্যাপক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খানের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতির নামানুসারে এটি 'আকরাম খান শিক্ষা কমিটি' নামে পরিচিত।[১১] এই কমিটি নুতন সদস্য ও উপদেষ্টাদের নিয়ে ৭টি সাব-কমিটি গঠন করে। এই ৭টি সাব-কমিটি হচ্ছে :

ক. খসড়া প্রশ্নমালা প্রণয়ন সাব-কমিটি
খ. প্রাক-প্রাসঙ্গিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সাব-কমিটি
গ. মাধ্যমিক শিক্ষা সাব-কমিটি
ঘ. মাদ্‌রাসা শিক্ষা সাব-কমিটি
ঙ. সংখ্যালঘু শিক্ষা সাব-কমিটি
চ. পরীক্ষা সাব-কমিটি
ছ. নারী শিক্ষা সাব-কমিটি।

উল্লেখ্য যে, সরকার সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে ৭ সদস্যবিশিষ্ট নারী শিক্ষা সাব-কমিটি গঠন করে দেন। এই সাব-কমিটি এ উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় যে, বিভিন্ন সাব-কমিটিতে তারা মনোনীত হয়ে নারী শিক্ষা সাব-কমিটির সদস্য হিসেবে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করবেন। বিশেষত বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়নে সবিশেষ ভূমিকা রাখবেন। তাছাড়াও নারীশিক্ষা সাব-কমিটি নারী-শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনও পেশ করবেন।[১২]

নারীশিক্ষা সাব-কমিটির সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন :

১	মিস এল. এ. বাকের বিদ্যালয় পরিদর্শিকা, পূর্ববঙ্গ	সভাপতি
২	মিস রাবেয়া খাতুন	সদস্য
৩	বেগম সুফিয়া কামাল	সদস্য
৪	মিসেস ডব্লিউ.এ. শাদানী	সদস্য
৫	মিসেস ফজিলাতুন্নেসা জোহা	সদস্য
৬	মিস আনসারী, প্রধান শিক্ষিকা, রমনা প্রিপারাটরি স্কুল, ঢাকা	সদস্য
৭	মিসেস শামসুন্ নাহার মাহমুদ	সদস্য সচিব

www.pathagar.com

১৯৫১ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিটি সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই কমিটি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারী-শিক্ষকের কথা উল্লেখ করে। এই প্রসঙ্গে সুপারিশমালার 'ক' (প্রাথমিক শিক্ষা) অনুচ্ছেদের ১০ ও ১২ কলামে বর্ণনা করেন : [...]"

১০. যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেহেতু মহিলাদের সবরকমের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১১. এদেশের জন্য একটি 'মহিলা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়' এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অতিসত্বর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"[১৩]

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত দুটি সুপারিশসহ অন্যান্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপই তৎকালীন সরকার গ্রহণ করেনি। তবে ১৯৫২ সাল থেকে চার বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। এখানে ১০ ও ১১ নং সুপারিশে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক স্তরে নারী শিক্ষকদের কথা বলা হচ্ছে এবং নারীদের জন্য সব রকমের সুযোগ-সুবিধাসহ মহিলা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা একদম ভিন্ন। তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষা সংকোচনে সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব বাংলার প্রায় সমস্ত স্কুল-কলেজে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশি। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রসরমান হিন্দু-সমাজ পাকিস্তান সৃষ্টির পর সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দলে দলে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে এ দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট সংকট দেখা দেয়। অন্তঃপুরবাসিনী বাঙালি মুসলিম নারীরা সবেমাত্র শিক্ষার জগতে প্রবেশ করছিল। ঠিক সেই সময় স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্রী-সংখ্যা কমে যাওয়ায় সরকার সেগুলোকে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় সিলেট মহিলা কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে জোবেদা খাতুন চৌধুরী তৎকালীন গভর্নর ফিরোজ খান নূনের সঙ্গে দেখা করে সিলেট কলেজটি বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁকে গভর্নর এক বছর সময় দিয়ে বলেছিলেন, "এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রী না হলে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।" দৃঢ় মনোবল নিয়ে জোবেদা খাতুন চৌধুরী তাঁর সঙ্গে সেরাজুন নেছা চৌধুরী ও আরো কয়েকজন সমাজকর্মী বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করে কলেজটি চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৪]

শুধু সিলেট মহিলা কলেজই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের স্কুল-কলেজ নিয়ে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে থাকে। ঢাকার ইডেন কলেজ ও স্কুল নিয়েও চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্রী-সংখ্যা কমে যাওয়ায় ইডেন ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলকে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। এর প্রতিবাদে প্রায় ৫০০ ছাত্রী ধর্মঘট করে ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীরাও ছিলেন। কেননা দুটি স্কুল এক হয়ে যাওয়ায় অনেকের পড়া যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,

www.pathagar.com

তেমনি অনেক শিক্ষয়িত্রীর চাকরিও চলে গিয়েছিল।[১৫] এ-ছাড়া নাচোলের রাণীমা ইলা মিত্রের নেতৃত্বে গ্রামের নিরক্ষর মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রক্রিয়া শুরু হলে প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকার মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগের বিরোধিতা করে। নিরক্ষর গরিব মেয়েদের লেখাপড়ার উদ্যোগকে তারা ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে প্রচারণা শুরু করে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো বেপর্দা করার শামিল বলে এরা হিন্দু সম্প্রদায়কে দায়ী করতে থাকে। শিক্ষা বন্ধের জন্য ধনীদের দ্বারা ধর্মভয় চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় গরিব জনগণ। এ-সময়ে 'নারী-শিক্ষা' বিষয়ে গ্রামজুড়ে আলোড়ন জেগে ওঠে। মূলত শিক্ষা সংকট ও সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিবাদে নারীসমাজ যেমন সোচ্চার ছিলেন, তেমনি ছাত্রীরাও প্রতিবাদে রাজপথ প্রকম্পিত করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে সকল ধর্মঘটের মূল প্রেরণা হিসেবেও কাজ করেছিল এই ছাত্রী ধর্মঘট। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন দৈনিক আজাদ পত্রিকার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য[১৬] : 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সংকট কতদূর চরমে উঠিয়াছে তাহা পনেরই নভেম্বর (১৯৪৮) তারিখে ঢাকার ছাত্রী বিক্ষোভ হইতেই অনুমিত হয়। ছাত্রীদের এত বড় মিছিল ইতিপূর্বে ঢাকায় দেখা যায় নাই। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে যে ছাত্রীরা বাহির হয় নাই এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।' তৎকালীন সরকার মূলত নারীর উচ্চ-শিক্ষা বোধের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছিল।

১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে 'পূর্ববঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি' গঠন করেন। জনাব আশরাফুদ্দিন চৌধুরী এ কমিটির চেয়ারমান মনোনীত হন। তার নামানুসারে এ কমিটি আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি নামে খ্যাত।[১৭] 'কমিটির সুপারিশমালাতে নারী-শিক্ষার বিষয়ে কোনো সুপারিশ ছিল না'।

১৯৫৭ সালে পূর্বপাকিস্তান সরকার 'পূর্বপাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন' গঠন করেন। কমিশনের সভাপতি ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন : ড. মাহমুদ হাসান, ড. মো : কুদরাত-ই-খুদা, জনাব আখতার হামিদ খান, জনাব আবু নাইম, ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, জনশিক্ষা পরিচালক (ডিপিআই), পূর্ব পাকিস্তান (সদস্য-সচিব)। এই কমিটি 'নারী-শিক্ষা' প্রসঙ্গে একটি মাত্র কলামে সুপারিশ করেন : 'শিক্ষার প্রতি মেয়েদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিনিয়র হাই স্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত তাদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।'[১৮] এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৯৫৮ সালে আইউব খানের সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার একটি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব এস. এম. শরীফ। কমিশন ১৯৬০ সালের ৮ জানুয়ারি একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এর অব্যবহিত পরে জাতীয় কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সারাদেশে ১৯৬১ সাল থেকে চালু হয়। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক

www.pathagar.com

স্তরের (১১-১২ শ্রেণী) তত্ত্বাবধান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে সরিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের ফলেই এসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া কমিশন ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ ও অনার্স দু'ক্ষেত্রেই তিন বছর করার প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাব পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রী সমাজ শিক্ষা সংকোচন নীতি হিসেবে গণ্য করে। অপরদিকে কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সকে শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী মহল কালাকানুন নামে অভিহিত করে। এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই কমিশনের সুপারিশে কোথাও 'নারী-শিক্ষা' প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয় নি।

১৯৬৩ সালের মে মাসে পাকিস্তান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে 'ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এ-কমিটি ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রিপোর্ট জমা দেয়।[১৯] এ রিপোর্টের কোথাও 'নারী-শিক্ষা' প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ নেই।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার 'ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ' কমিশন নিয়োগ করে যা পরবর্তীতে কমিশনের সভাপতি বিচারপতি হামুদুর রহমানের নামে পরিচিতি লাভ করে। এই কমিশন তাদের সুপারিশমালায় নারী-শিক্ষা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন :

> "মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অযৌক্তিক বলে সমাজের একশ্রেণীর লোক দাবি উত্থাপন করে আসছেন। কম বয়সী ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক কিছু বালিকা বিদ্যালয় থাকতে পারে। তবে মেয়েদের জন্য ভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পর সে ব্যাপারে সুদৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। যদি কোন এলাকায় অধিক সংখ্যক মহিলা কলেজে মেয়েরা অধিক হারে পড়াশুনা করে তবে সেখানে যদি স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠদানযোগ্য যন্ত্রপাতি সজ্জিত পরিবেশ থাকে তবে ঐ ধরনের কর্মক্ষম কলেজকে সমন্বিত করে উচ্চ শিক্ষার একটা কেন্দ্র চিহ্নিত করা যায়, যাতে ঐ পরিবেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা প্রতুল করে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করে, সেখানে মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন কমন রুম, ভিন্ন পাঠকক্ষ, ভিন্ন বাথরুম-এ মেয়েদের কর্মজীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি পড়াবার সৃষ্টি করা গেলে তাদের ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থাপনের দাবি অনেকাংশেই পূরণ করা সম্ভব হবে। তাদের জোরদার দাবি ছিল মেয়েদের জন্য ভিন্ন ছাত্রী আবাস। এ দাবি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ কমিশন অবশ্যই করবে।"[২০]

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শরীফ কমিশনের সুপারিশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বলা হয়েছিল :

www.pathagar.com

'আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজির বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক পড়া হিসেবে শিক্ষা দিতে হইবে।'[২১] এবং 'উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে।'

অন্যত্র, 'উর্দু ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।"[২২]

শরিফ কমিশন পাকিস্তানের একটি অভিন্ন বর্ণমালার জন্যও সুপারিশ করে। স্মর্তব্য যে, এর মাত্র সাত বছর আগে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। জাতীয় ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নে পূর্ব বাংলা তখনো সরগরম। শরীফ কমিশন অত্যন্ত সুকৌশলে বিতর্ক টেনে বলে যে :

'পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করিতেই হয় তাহা হইলে পবিত্র কোরান যাহাতে লেখা এবং যাহা সকল মুসলমানই পাঠ করে সেই আরবীয় (নাখ্‌স্‌) দাবি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।'[২৩]

খুব স্বাভাবিক কারণেই ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে। এমনিতেই সেই সময় বিভিন্ন প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ইস্যু পেলেই আইয়ুব খান তথা সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছিল। এমন একটা অবস্থায় শরীফ কমিশনের গণবিরোধী সুপারিশ ছিল 'ভিমরুলের চাকে খোঁচা' দেওয়ার মতোই।[২৪] এই আন্দোলনে ইডেন কলেজ সংসদের সহ-সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী ও নাজমা বেগম দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন। বাষট্টি সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শরীফ কমিশনের প্রতিবেদনবিরোধী যে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য পরের বছর ১৯৬৩ সালে এই দিনকে ছাত্র সমাজ 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এমনি পরিস্থিতিতে মোনায়েম খান গভর্নর হিসেবে পদাধিকারবলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগদান করলে ছাত্র সমাজ এর তীব্র প্রতিবাদ করে। তৎকালীন ছাত্র সমাজ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চ্যান্সেলর নিয়োগের দাবি জানান। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন ছাত্র সমাজ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের ২২ দফা রচনা করে। এই ২২ দফার ৮ নং দফার 'নারী-শিক্ষা' প্রসঙ্গে উল্লেখ ছিল। এতে বলা হয় :[২৫]

ক. প্রতি থানায় একটি করে সরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
খ. প্রতি জেলা সদরে মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
গ. আরো অধিক সংখ্যক ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করে মেয়েদের আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

মূলত এই ২২ দফার দাবির ও ছাত্র-আন্দোলনের কারণেই ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তাতন সরকার 'ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ' কমিশন গঠন করে। যে-কারণে রক্ষণশীল ইসলামপন্থী কমিশন 'নারী শিক্ষা' নামে একটি অনুচ্ছেদ রাখতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু আমরা এও অনুভব করতে পারি, হামুদুর রহমান কমিশনের 'নারী-শিক্ষা' অনুচ্ছেদে 'নারী-শিক্ষা'র মৌলিক অগ্রগতি প্রসঙ্গে কোনো সুপারিশ নেই। বরং 'নারী-শিক্ষা' প্রসঙ্গে তাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও অক্ষমতাই প্রকাশ করেছে সেই কমিশনের 'নারী-শিক্ষা' অনুচ্ছেদের সুপারিশে।

১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। এই সামরিক সরকার ১৯৬৯ সালে এয়ার ভাইস মার্শাল এম. নূর খানের নেতৃত্বে 'নতুন শিক্ষানীতি' নামে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের কোথাও 'নারী-শিক্ষা' প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ ছিল না। এই কমিশনও পূর্বের কমিশনগুলোর মতোই তাদের রক্ষণশীল মনোভাব দিয়ে দেশে 'শিক্ষানীতি'কে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আবারও জনাব শামসুল হককে সভাপতি করে 'পাকিস্তান সরকারের নতুন শিক্ষানীতি' নামে কয়েকটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের 'আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা' অনুচ্ছেদে বলা হয় :

> "... এই মর্মে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকীকালে (১৯৭০-৭৫) প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে প্রাথমিক স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের শতকরা ৭০ জনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য সকল প্রকার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে 'শিক্ষিকা নিয়োগ' বৃদ্ধি করতে হবে। এবং স্থানভেদে মেয়েদের জন্য ভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।"[২৬]

এ-ছাড়াও অন্যত্র 'মহিলা শিক্ষক নিয়োগ' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদে বলা হয় :

> "মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গ্রামীণ অঞ্চলে বেশ নজর দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে মহিলাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হবে এবং তাদের স্বল্পমেয়াদী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।"[২৭]

শামসুল হক শিক্ষা কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির প্রসঙ্গ এবং মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ওপর বেশ জোর দেয়া হয়েছিল। এতে করে পাকিস্তান শাসকবর্গের 'নারী-শিক্ষা'র প্রতি গভীর মমতাবোধের চাইতেও তৎকালীন 'ছাত্র-সমাজের ২২-দফা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শাসকবর্গ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে এই ধরনের শিক্ষানীতি প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং 'নারী-শিক্ষা' প্রসঙ্গে তাদের রক্ষণশীল মনোভাব ভেঙে কিছুটা শৈথিল্য প্রদর্শন করে। একথা স্পষ্ট যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ তাদের সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরের শাসনকালে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করেছিল; ঐ কমিশনগুলোতে নারীকে তার সার্বিক অস্তিত্বের আলোকে বিবেচনা করে 'নারী-শিক্ষা' প্রসঙ্গে কোনো সুপারিশ প্রণয়ন করেননি। বরং লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে ও ধর্মীয় অনুশাসনের নামে নারীসমাজের পায়ে বেড়ি বাঁধতে থাকে তারা। পাকিস্তানি শাসনামলে নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে পুরনো চলতি সামাজিক প্রথা ও

www.pathagar.com

রীতিনীতিতে আবদ্ধ রেখে শুধু পারিবারিক দায়িত্ব পালনের জন্যই উৎসাহিত করা হতে থাকে। নারীদের লেখাপড়ার উদ্যোগকে তারা ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে নানা ধরনের প্রচারণা করতে থাকে। নারী-শিক্ষা বিষয়ে আইয়ুবের শিক্ষানীতিতে বলা হয়, মা ও গৃহিণী হিসেবে নারীকে গড়ে তোলাই হচ্ছে নারী শিক্ষানীতির লক্ষ্য। মূলত পাকিস্তান শিক্ষা কমিশনের 'নারী-শিক্ষা'য় নারীর ক্ষমতায়নের চাইতে নারীকে মা ও গৃহিণী হিসেবে তৈরি করে অস্তিত্বহীন অন্তঃপুরবাসিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয়। আশার কথা পাকিস্তান আমল থেকেই এ দেশের নারীরা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করে আসছেন এবং এ ধারা এখনও অব্যাহত।

তথ্যনির্দেশ

১. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান [সম্পাদক], 'বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থায় ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ', "সম্পাদকের কথা", ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃ. IX

২. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নারী শ্রেণী ও বর্ণ', ম্যানাক্সিন্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, ২০০০, পৃ. ২৮

৩. ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী', বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, কলিকাতা, পূনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২, পৃ. ৮২-৮৫

৪. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নারী শ্রেণী ও বর্ণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯

৫. ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, 'নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য', ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৪

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৭. মালেকা বেগম, 'বাংলার নারী আন্দোলন', ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৬-৭

৮. Benoy Ghose, 'Iswar Chndra Vidyasagar', publication division, Ministr of Information and Broadcasting, Government of India, 1971, P. 51

৯. মালেকা বেগম, 'বাংলার নারী আন্দোলন', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৪

১০. বাংলাদেশের প্রথম মুসলমান মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৮ম বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ঢাকা

১১. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, 'যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ', জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৬৭

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

১৪. 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা', পূর্বোক্ত

১৫. বদরউদ্দিন উমর, 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৬৭

১৬. মালেকা বেগম, 'বাংলার নারী আন্দোলন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

১৭. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, 'যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩

www.pathagar.com

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫-৩১৬
২১. শরীফ কমিশন প্রতিবেদন, পৃ. ৩৪৯, দ্র. মোহাম্মদ হাননান 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, আগামি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৮৩
২২. শরীফ কমিশন প্রতিবেদন, পৃ. ৫১৯, দ্র. মোহাম্মদ হাননান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
২৩. শরীফ কমিশন প্রতিবেদন, পৃ. ৩৭০. দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
২৬. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, 'যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ,' পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

www.pathagar.com

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনে নারীশিক্ষা

সেলিনা হোসেন

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, মে, ১৯৭৪

যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ প্রতিফরলিত হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে যে কয়েকটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে সেখানে নারীশিক্ষাকে আলাদা অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় শিক্ষা নারী-পুরুষের সম-অধিকার হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে বিবেচিত নয় এবং শিক্ষায় নারীর প্রান্তিক অবস্থানের কারণে নারীশিক্ষাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

সামগ্রিকভাবে নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বৈষম্যের শিকার। সমতার দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে শিকার করা হয়েছে যে, 'আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরুষদের শিক্ষাব্যবস্থায় সমান গুরুত্ব অর্জন করেনি। বিদ্যালয়সমূহের ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় জীবনযাপন করেন। এ অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের জন্য নারী শিক্ষার বিস্তার সাধন একান্ত প্রয়োজন।'

দেখা যায় শেষ পর্যন্ত কমিশনের সুপারিশসমূহ বেশিরভাগই ফাইল-বন্দি থাকে। বাস্তবায়িত কমই হয়। ফলে পরিস্থিতির ইতিবাচক প্রত্যাশিত ফল লাভ করে না। এমনও দেখা গেছে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গৃহীত হওয়ার পরও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সচেতনতার অভাবে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। কখনো দুর্নীতির ফলে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

এই লেখায় কয়েকটি শিক্ষা কমিশন ও প্রতিবেদন থেকে নারীশিক্ষার অধ্যায়গুলো হুবহু উঠিয়ে দেয়া হয়েছে নারীশিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ দেশের আর্থ-সামাজিক

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে কতটা যথাযথ ছিল তা মূল্যায়নের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে এই কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তার রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেন ১৯৯৭ সালে। জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ প্রতিবেদন মোঃ মনিরুজ্জামান মিঁয়া কমিশন নামে উপস্থাপিত হয় ২০০৪ সালের মার্চ মাসে। প্রতিটি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে যে কোনো গবেষক দেশের নারীশিক্ষা এবং তার অগ্রগতি মূল্যায়ণ করার উপকরণ পাবেন।

তবে এটা সত্যি এইসব রিপোর্ট প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের কাগজ ও কাজ একরকম নয়। জনগোষ্ঠীর দুর্বল অংশের জন্য রাষ্ট্রের অনীহা আছে—সেজন্যই সুপারিশ কাগজে থাকে, বাস্তবে থাকে না।

অধ্যায় ২৪ নারী শিক্ষা

২৪.১. সমাজের সব মানুষের সকল বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে, গৃহের মান ও পরিবেশ উন্নতকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য নারী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। শিশু চরিত্র অংকুরিত ও বিকশিত হয় মাতৃ পরিবেশে। অথচ মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে কখনোই পুরুষদের শিক্ষায় সমান গুরুত্ব অর্জন করেনি। শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে পাথেয় করে সংসার জীবন নির্বাহ করেন। অনতিবিলম্বে এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

২৪.২. আধুনিক বিশ্বে নারীর কর্মজগত অত্যন্ত বিস্তৃত। অথচ আমাদের প্রাথমিক স্কুলে বর্তমানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগ, জুনিয়ার মাধ্যমিক স্কুলে ২০ ভাগ ও মাধ্যমিক স্কুলে মাত্র ১০ ভাগ। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং দেশ গড়ার কাজ দ্রুত ও সুষ্ঠভাবে সমাধান দ্বারা দেশের সমস্ত জনসমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার জন্য নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করছি :

২৪.৩. নারী শিক্ষার প্রসার করতে হবে আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে। মেয়েদের উপযোগী বৃত্তিমূলক এবং তাদের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে কাজে লাগে এরূপ বিষয়ে শিক্ষা যেন তারা পায় তা দেখতে হবে। এই জন্য প্রয়োজনবোধে মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা বিবেচনা করা দরকার।

২৪.৪. পল্লীগ্রামে বিদ্যালয়গুলির দুরত্ব বেশী থাকে এবং বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চল নদী-নালা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ এবং পথ-ঘাট সুগম নয় বলে মেয়েদের পক্ষে স্কুলের

www.pathagar.com

সুযোগ গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। একথা স্মরণ রেখে মেয়েদের বেলায় প্রয়োজনবোধে এক মাইলের কম দূরত্বেও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার দ্বারা এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

২৪.৫ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বিষয় তালিকার ছাত্রীদের জন্য কিছু বিশেষ বিষয় থাকা আবশ্যক। এই শিক্ষা তাদের সাংসারিক জীবন যাপনে ও জীবিকা অর্জনে সহায়তা করবে। অষ্টম শ্রেণীর লেখাপড়া শেষ করে আমাদের দেশের বহু মেয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায়না। সুতরাং তাদের পাঠ্য বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়সূচী থাকা একান্ত আবশ্যক : শিশুর যত্ন, রোগীর সেবা, স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যপুষ্টি, খাদ্যপ্রস্তুত, খাদ্য সংরক্ষণ, সূচী শিল্প ও পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী, পুতুল ও খেলনা তৈরী, বাঁশ, বেত ও পাট প্রভৃতি কাজ, পাটী ও মাদুর বোনা, হাঁস-মুরগী ও গৃহপালিত পশু পালন ইত্যাদি।

২৪.৬ পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা দানের দায়িত্ব মেয়েদের উপর অর্পন করা হয়ে থাকে। কারণ এ স্তরের শিক্ষাদানের দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেন তাদের ভেতর মাতৃস্নেহ সেবিকার নিষ্ঠা ও ধৈর্য এবং শিক্ষিকার গুণ আবশ্যক। সুতরাং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাঞ্চনীয়। এ জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

২৪.৭. বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে শিক্ষিকাদের আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিকাগণ এই শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকার হার প্রাথমিক স্তরে নগণ্য। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউটগুলিকে সম্প্রসারিত করে অধিক সংখ্যক শিক্ষিকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

২৪.৮. দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে পল্লীগ্রামে শিক্ষিকা পাঠাতে হবে। এই কথা চিন্তা করে সকল স্তরে বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

২৪.৯. অষ্টম শ্রেণীর পর মেয়েরা যেন প্রয়োজনমত মাধ্যমিক স্কুলগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য সহ-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। এতে কিশোরী ও তরুণীরা যে-সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সমাধান সম্ভব হবে।

২৪.১০. নারী শিক্ষার উপযুক্ত ও দ্রুত প্রসারের জন্য শিক্ষা বিভাগ ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অভিভাবকদের রক্ষণশীল মনোভাব যেন নারী শিক্ষা প্রসারের গতি শ্লথ না করে সেজন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন, বয়স্ক শিক্ষার দ্বারা অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূর করতে হবে এবং এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

২৪.১১. সচ্ছল জীবন ধারা নির্বাহের জন্য এবং দেশের মোট উপার্জন বৃদ্ধির যে সমস্ত কার্যে মেয়েরা সহজে যোগদান করতে পারে বা যে সমস্ত বৃত্তিতে মেয়েরা স্বভাবতই বেশী উপযোগী, যেমন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাসপাতালে, বিশেষ করে নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল কার্যে, ব্যাংক এবং অফিস ইত্যাদিতে সচিব, টাইপিষ্ট, টেলিফোন সংযোজক, অভ্যর্থনাকারক ইত্যাদি জাতীয় বিশেষ ধরনের কাজে মেয়েদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২৪.১২. বৃত্তিমুখী ও কারিগরি শিক্ষাসমূহ ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে প্রযোজ্য হবে। মেয়েরা ভবিষ্যতের জননী হবে সুতরাং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্কুলসহ প্রতিটি স্কুলে মেয়েদের জন্য ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, সাঁতার শেখার সুযোগ প্রভৃতি থাকা অত্যাবশ্যক। এই সকল শরীর চর্চা শিক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২৪.১৩. মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়সমূহে মেয়েদের জন্য বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। এছাড়া তাদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি থাকা দরকার। কারণ প্রতিটি মেয়েকেই গৃহ জীবন যাপন করতে হবে এবং সে বিষয় প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক। সুতরাং পরবর্তী কালে সুষ্ঠ, জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব রক্ষণে দক্ষতা অর্জনের জন্য 'গার্হস্থ্য হিসাবরক্ষণ' ব্যবস্থা পাঠ্যসূচীতে থাকা একান্ত আবশ্যক। একই সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পারিবারিক সেবাও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২৪.১৪. প্রাথমিক স্তরের ন্যায় মাধ্যমিক স্তরেও বিদ্যালয় পরিদর্শনে বর্তমানে পরিদর্শক ও পরিদর্শিকার প্রচুর অভাব দেখা যায়। ফলে বিদ্যালয় পরিচালনায় বহু ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক ও পরিদর্শিকা বাড়াবার সুপারিশ করা হচ্ছে।

২৪.১৫. শিক্ষাদান এবং প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান অধিকার দিতে হবে। সুতরাং যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নারীশিক্ষা সারাংশ

১. আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরুষদের শিক্ষাব্যবস্থার সমান গুরুত্ব অর্জন করেনি। বিদ্যালয়সমূহে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় জীবন যাপন করেন। এ অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের জন্য নারী শিক্ষার বিস্তার সাধন একান্ত প্রয়োজন। (২৪.১ ২৪.২.)

২. গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে দূরত্ব বা অনুরূপ কারণে মেয়েরা স্কুলের সুযোগ গ্রহণ থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। (২৪.৪.)

www.pathagar.com

৩. মেয়েদের শিক্ষা এমন হতে হবে যা তাদের দৈনন্দিন সাংসারিক কাজে লাগে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে শিশুর যত্ন, রোগীর সেবা, স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য, পুষ্টি খাদ্য সংরক্ষণ, সূচী শিল্প, পুতুল ও খেলনা তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষণ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি থাকা দরকার। (২৪.৩. ২৪.৫. ২৪.১৩)

৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকতায় অধিক সংখ্যায় মহিলা শিক্ষক—নিয়োগের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলিতে অধিক অধিক সংখ্যায় মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (২৪.৬. ২৪.৭.)

৫. মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অধিকতর সংখ্যায় মেয়েরা লেখা পড়া করবে। (২৪.৯)

৬. মেয়েদের জন্য তাদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যেমন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা, নার্সিং এবং প্যারামেডিকেল কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং অফিস আদালতে টাইপিং ও ষ্টেনোগ্রাফির কাজ, টেলিফোন অপারেটারের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (২৪.১১)

৭. শিক্ষাদান ও প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে নিযুক্তির জন্য মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। (২৪,১৪, ২৪.১৫.)

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ফাগুন. ১৩৯৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

ঝ. নারী শিক্ষা

ভূমিকা

৬.১. (ঝ) দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে নারী সমাজের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা বলার প্রয়োজন হয় না যে, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অশিক্ষিত ও উপেক্ষিত রেখে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পুরুষের অংশ-গ্রহণ অর্থবহ করার সাথে সাথে নারী সমাজের অংশগ্রহণকেও তাৎপর্যময় করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পূর্ববর্তী সকল শিক্ষা কমিশন ও কমিটি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। আমরাও এ ব্যাপারে তাদের সাথে একমত পোষণ করি।

বর্তমান অবস্থা

৬.২. (ঝ) নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ আশানুরূপ না হলেও তেমন অসন্তোষজনক নয় (সারণী দ্রষ্টব্য)। বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়েদের অংশ প্রাথমিক স্তরে শতকরা ৪০ ভাগ, মাধ্যমিক স্তরে ৩০ ভাগ, কলেজে ১৮ ভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ ভাগ।

www.pathagar.com

সারণী

ছাত্রীদের মোট শিক্ষার্থীর শতকরা হার

সাল	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮১	৩৮.৭৫	২৫.০৯	১৭.৮৮	১২.৪৫
১৯৮২	৩৯.৪৯	২৪.৭০	১৮.৫০	১৮.২১
১৯৮৩	৪০.১১	২৬.৩০	১৭.৫০	১৮.৪২
১৯৮৪	৪০.৬৩	২৮.৯৪	১৯.৮২	১৭.৮৪
১৯৮৫	৪০.৪৭	২৯.২৬	১৭.৪৭	১৭.৯৩

শিক্ষাবর্ষ ভিত্তিক

৬.৩. (ঝ) নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও কার্যকর করার জন্য নিচে কয়েকটি সুপারিশ করা হল :

১. প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অধিক সংখ্যক ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষালাভে উৎসাহ সৃষ্টি ও সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্রমহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

২. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেয়েদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। দূরত্ব অতিক্রম করার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রতিবেদন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অধ্যায় ১৭ নারী শিক্ষা

১. ভূমিকা

দেশ ও সমাজে উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এর মধ্যে দরিদ্র মানুষ যেমন বিশেষভাবে বঞ্চিত তেমনি তুলনামূলকভাবে সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারীও এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে। পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্যার কাজে নারীর শিক্ষা সীমাবদ্ধ রেখে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের জাতীয় উন্নয়নে নিষ্ক্রিয় রাখার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবণতা দূর করতে

www.pathagar.com

হবে। ১৯৭১ সালে আত্মনির্ভরশীল হতে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়ে ওঠে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রাখে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল হতে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়ে ওঠে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগহণ করে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১. নারীশিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
২.২. দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
২.৩. আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
২.৪. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।
২.৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন।
২.৬. দারিদ্র্য বিমোচন করে সমাজকে উন্নতির ধারায় প্রবাহিতকরণ।
২.৭. সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠন।
২.৮. জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির সংকোচন।
২.৯. যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরোধ।
২.১০. নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৩. নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। বাংলাদেশে এই সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার বিধান করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে।

৪. জাতীয় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম

গত কয়েক দশকে সারা বিশ্বে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সাত বছর পর্যন্ত শিক্ষার হার ৩২.৪। এর মধ্যে ছেলে ও মেয়ের আনুপাতিক শিক্ষার হার ৩৮.৯ : ২৫.৫। কন্যাসন্তানের চেয়ে

www.pathagar.com

পুত্রসন্তানকে স্কুলে পাঠাতে মাতাপিতা বেশি আগ্রহী। কারণ তারা মনে করে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান তাদের রোজগার করে খাওয়াবে। গ্রামাঞ্চলে পরিবারের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ কন্যাসন্তানের জন্য বরাদ্দ থাকে। তবু মেয়েদের স্কুলে যাবার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। তবে ঝরে পড়া সংখ্যায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি। ১৯৯৪-এর পরিসংখ্যানমতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার শতকরা ২৫ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শতকরা ২৫ জন ছাত্রী এবং শতকরা ১৪ জন শিক্ষিকা। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ কম। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীকে বিশেষ লক্ষ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সর্বশেষ পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষনজর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনায় (১৯৯১-২০০০), খসড়া অংশগ্রহণমূলক পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (১৯৯৫-২০১০) এবং পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) নারীর সর্ববিধ উন্নতি এবং বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে তার অগ্রগতির ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৫. নিরক্ষরতা দূর করে নারী শিক্ষার পথে যেসব বাধা আছে তা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে প্রচার করা দরকার। সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে কমিউনিটি ওয়ার্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কি পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার আদান প্রদান হচ্ছে, সমাজের লোকজন এই শিক্ষা বিষয়ে কতটুকু অবদান রাখছে, অভিভাবকগণ সন্তানের শিক্ষার জন্য কি পরিবেশ ও দৃষ্টান্ত রাখছেন—এসব পদ্ধতির মধ্যে যুক্ত হতে হবে।

৬. সুপারিশ

নারীশিক্ষা বিষয়ে বিবেচনা করতে গেলেই সংখ্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাই আরও অধিক সংখ্যায় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা আবশ্যক এবং সেই লক্ষ্যে যথার্থ অবকাঠামো ও স্কুলে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাও জরুরি। শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি এবং নারীর সমানাধিকারে বিবেচনার দাবি রাখে। সেই লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তিনটি স্তরে ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

৬.১ প্রাথমিক শিক্ষা

৬.১.১ স্কুলে শিক্ষকদের ব্যবহারে ছেলে ও মেয়ের প্রতি প্রথম থেকেই সমতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। এই বয়সে মেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতা সার্বিকভাবে দূর করতে হবে এবং ছেলেদের উঁচু মনোভাব দূর করতে হবে।

৬.১.২ ছেলেমেয়ে উভয়ই সমান এবং উভয়কেই সমাজ, পরিবার ও জীবনে সমান অংশীদার হিসেবে পরিপূরক ভূমিকা পালন করে উভয়ের বিকাশ সমানভাবে হওয়ার ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের সহযোগিতা করতে হবে।

www.pathagar.com

৬.১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের ঝরে পড়া বন্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং স্কুলের পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

৬.১.৪ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীর রচনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ের নারী-আন্দোলনের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়বস্তু সংযোজন করতে হবে। এই সকল নারী ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ নারীর জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের কথা তুলে ধরে দেশগঠনের ক্ষেত্রে নারীর অবদানের বিষয়টির প্রতি এই পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত।

৬.১.৫ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শুধু মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করার সরকারি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং সেই লক্ষ্যে যতদিন পর্যন্ত মহিলা শিক্ষকের সরকারি কোটা পূরণ না হবে ততদিন পর্যন্ত শুধু মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৬.১.৬ নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা, মেয়েদের আসা যাওয়ার সুবিধার্থে গ্রামের প্রয়োজনবোধে প্রতি এক মাইলের কম দূরত্বে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার এবং ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে খেলাধূলায় সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২ মাধ্যমিক শিক্ষা

৬.২.১ এ পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সব বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। না হলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মেয়েরা অঙ্ক বা বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় আর ছেলেরা সেলাই বা গার্হস্থ্য শিক্ষার প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হয় না। সমান সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ের সমানগুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ছেলেমেদের জন্য একই পাঠ্যসূচি গ্রহণ করা। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যবিষয়ে নারীপুরুষ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কোন ভিন্নতা বা বৈষম্য রাখা চলবে না।

৬.২.২ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায় থেকেই নাগরিক জীবনের আরও কিছু বিষয় পাঠ্যসূচিতে আনা আবশ্যক। গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সমনাগরিকত্ব বিষয় বিশেষ শিক্ষাক্রম তৈরি করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর প্রবন্ধ যেমন, নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলন, শিশুদের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের সচেতন করবে।

৬.২.৩ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা দরকার। বর্তমানে মেয়েদের জন্য মাত্র একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। পরবর্তীতে কোন ছাত্রী যদি উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী না হয় বা তারপক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ

www.pathagar.com

সম্ভব না হয় তাহলে সে যাতে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই সুযোগ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে রাখতে হবে।

৬.২.৪ মধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়াতে ছাত্রীদের সুবিধার জন্য যাতায়াত ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.২.৫ কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেরা মেয়েদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের আচরণ মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্কে সহজতর করার শিক্ষাদানের মধ্য দিয়েই তা রোধ করা সম্ভবপর হবে। নারী ও যৌন ও জ্ঞান সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া দরকার। এতে নারী—নির্যাতনের প্রবণতা কমবে বলে আশা করা যায়।

৬.২.৬ মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা, শিশু অধিকার সনদ, সিডো, নাইরোবি ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটেজি, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, স্থানীয় সরকার পরিষদ, জাতীয় সরকারের ভূমিকা, মৌলিক অধিকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিসমূহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.২.৭ বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মেয়েদের স্কুলে অধিকতর গবেষণাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬.৩ উচ্চ শিক্ষা

৬.৩.১ স্নাতক পর্যায়ে তত্ত্বশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীবাদ সম্পর্কে শিক্ষাদান আবশ্যক। আজকের দিনে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি যে কোন পাঠের ক্ষেত্রেই নারী—আন্দোলন—বিশ্লেষণ একটি মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন্স স্টাডিজ নামে আলাদা বিভাগ করা যেতে পারে।

৬.৩.২ প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসা এবং মাদ্‌রাসা স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানববিদ্যা সম্বন্ধে একটি কোর্স বাধ্যতামূলক করা দরকার। এই কোর্সে অবশ্য জেন্ডার বিশ্লেষণ অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৬.৩.৩ নারীশিক্ষার হার বাড়াতে হবে এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও সিডোর সনদের বাস্তবায়নের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে করতে হবে। প্রাইভেট সেক্টরকে এক্ষেত্রে অনুদান দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৩.৪ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৬.৩.৫ ঝরে পড়া ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।

www.pathagar.com

৬.৩.৬ মেয়েদের বর্তমানে প্রচলিত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও অসহায় ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন—২০০৩, মো: মনিরুজ্জামান মিয়া, মার্চ, ২০০৪ প্রতিবেদন

নারীকে শিক্ষার মূল ধারায় আনয়ন

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন নারীর জন্য সমতাভিত্তিক, গুণগত ও সমমানের শিক্ষা নীতিমালাসমূহ ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৯০ সালে জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত সার্বজনীন বিশ্বশিক্ষা সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে বেইজিং ঘোষণা এবং ২০০০ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং বর্তমান সরকারের শিক্ষা কমিশনে-২০০৩ এর নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে এই উপকমিটির সুপারিশমালা প্রনীত হলো।

উদ্দেশ্য

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে আটক নারীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সহায়ক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার মূলধারায় আনতে হবে। নারীকে ভিন্ন মানের শিক্ষাব্যবস্থায় আবদ্ধ না রেখে জাতীয় উন্নয়নে তাদের সমঅবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষা অধিকতর সুসমন্বিত করতে হবে যাতে নারী আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পুরুষের সমকক্ষ শিক্ষামান অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালায় নারীর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ডাকার কর্মপরিকল্পনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নারীশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, ডাকার কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন ধারা ও অনুচ্ছেদে নারীশিক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে ডাকার কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো, যাতে দেখা যায় নারীশিক্ষা প্রসারে ও নারীপুরুষ সমতা বিধানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর প্রতিটি রাষ্ট্র ও সমাজ। মোট ৬টি লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে প্রায় প্রতিটিতেই নারীশিক্ষার উল্লেখ রয়েছে। এবং ৫ নং লক্ষ্য সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্বারোপ করেছে, যেমন :

www.pathagar.com

২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে এ বিষয়ে সমতা অর্জন করতে হবে। মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা অর্জনে মেয়েদের পূর্ণ ও সমপ্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উপর জোর দিতে হবে।

আবার ৭. খ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের মধ্যে যাতে শিশু শিক্ষা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। মেয়ে শিশু, যেসব শিশু কষ্টকর জীবন যাপন করছে বা বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভুক্ত শিশু সকলেই যাতে বিনা ব্যয়ে মানসম্মত ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পায় এবং তা সম্পূর্ণ করতে পারে এটা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত নারীদের অন্তভূক্ত ২০১০ সাল নাগাদ বয়স্ক নিরক্ষরতার ৫০% দূর করতে হবে এবং সকল বয়স্ক ব্যক্তির জন্য মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা লাভের সমান প্রবেশাধিকার অর্জন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৭. ঘ ডাকার কর্মপরিকল্পনা)

বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার ফলে বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার গত ক' বছরে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির কথা বলা হলেও বিদ্যমান নীতিমালা বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি। এখনো নারী-পুরুষ বৈষম্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের সূচক লক্ষ্য করা গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট অনুল্লেখযোগ্য। সরকারের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা এখানে কতিপয় তথ্য সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পেয়েছি যা বিশেষ করে, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অবস্থানকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলবে। যেমন :

প্রাথমিক পর্যায়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা মাত্র ৩৬%। রেজিঃ বেসকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা মাত্র ২৬.৯%, নন-রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষায়িত্রীর সংখ্যা ৪৬.৫% এবং অন্যান্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০.৭%। অর্থাৎ দেখা যায়, ৭৮.১২৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের গড় শতকরা হার মাত্র ৩৬ ভাগ।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার শতকরা ৪৯.৩ ভাগ। রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৮.৯ ভাগ, অন্যান্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৬.৭%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে মেয়েদের ভর্তির শতকরা হার ৪৯.১ ভাগ।

মাধ্যমিক পর্যায়

মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারি মহিলা প্রতিষ্ঠান ১৪৭টি এবং ২০১৮টি বেসরকারি মহিলা প্রতিষ্ঠান। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হর ৪৫.৯% এবং বেসরকারি পর্যায়ে এই হার ৫২.৭% নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারি মহিলা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৫৬টি।

মাধ্যমিক শিক্ষার গ্রামীণ পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের হার শতকরা ১১.৯ ভাগ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৫৩.৬%। শহরাঞ্চলে এই হার যথাক্রমে ৩৪.৬% ও ৫১.৩%।

www.pathagar.com

নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের শতকরা হার ১৬.১ ভাগ, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৩৪.৯ ভাগ এবং বেসরকারি পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের হার ২৫.৭ ভাগ।

নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের (৬ষ্ট শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) ঝরে পড়ার হার ১৭.২% মাধ্যমিক পর্যায়ে (নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী) এই ঝরে পড়ার হার ৫৪.৮%।

কলেজ

উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের মাত্র ৭টি সরকারি কলেজ এবং ৩০৯টি বেসরকারি মহিলা কলেজ। সরকারি পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের হার ৩৭.৭% বেসরকারি পর্যায়ে ২০%। ছাত্রীসংখ্যার হার সরকারি পর্যায়ে ৬৭.৪% এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৫০.৫%।

ডিগ্রি (পাস) কলেজগুলোর মধ্যে সরকারি মহিলা কলেজ ৩৮টি এবং বেসরকারি মহিলা কলেজ ৯৬টি। মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা সরকারি কলেজে ১৮.৪% এবং বেসরকারি কলেজে ১৬.৬%। ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ৪২.৯% ও ৩৪.৮%।

ডিগ্রি (সম্মান) সরকারি মহিলা কলেজ ১২টি, এবং বেসরকারি মহিলা কলেজ ৩টি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মহিলা শিক্ষকের হার যথাক্রমে ১৬.৬% ও ২৩.১৭%। ছাত্রীসংখ্যা যথাক্রমে ৩৪.৬% ও ৩৬.৪%।

মাস্টার্স পর্যায়ে সরকারি মহিলা কলেজের সংখ্যা ৮টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৫টি। মহিলা শিক্ষকের হার যথাক্রমে ৩০.১% এবং ৩০%। ছাত্রীসংখ্যার হার যথাক্রমে ৩৬.৯% ও ২৬.৭%।

মাদ্রাসা

দাখিল, আলিম ও ফাজিল পর্যায়ে বেসরকারি মহিলা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ৭০১টি, ৬১টি ও ২১টি। মহিলা শিক্ষকের হার যথাক্রমে ৫.৪৮%, ৩.২৭% এবং ২.৬%। ছাত্রী হার যথাক্রমে ৪৯.৪%, ৪০.৪% এবং ৩২.২%। এবতেদায়ি (প্রাথমিক) পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির হর ৩৯.৯৭%। উল্লেখ্য, মাদ্রাসা শিক্ষার কোনো পর্যায়েই কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ১৩.৮% এবং সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের১৫.৯%, বেসরকারি পর্যায়ে ছাত্রী হার ২৬.৩% এবং সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হার ২৪%।

এ সব তথ্য ২০০১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী (সূত্র : বেনবেইস, জাতীয় শিক্ষা সমীক্ষা,নভেম্বর, ২০০২)।

www.pathagar.com

উল্লিখিত তথ্য প্রমাণাদিতে দেখা যায়, বিশেষ করে, নারীশিক্ষা প্রসারে তুলনামূলক চিত্র খুব আশাব্যঞ্জক নয়। উপরন্তু, সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে মেয়েশিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদি, ছাত্র-ছাত্রীদের আনুপতিক হার এখন পর্যন্ত আলাদাভাবে করা হয়নি। আশার কথা, এ পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং নারীকে শিক্ষার মূল ধারায় আনয়নের জন্য গঠিত উপকমিটির কার্যক্রম ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

নারীশিক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা কমিশনের পূর্বের রিপোর্ট সমূহের সারাংশ

পূর্বের সকল শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-বিশেষত ২০০০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষাকে একটি সেক্টোরাল ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে সমাধানকল্পে বিচ্ছিন্ন কিছু পদক্ষেপ নেবার সুপারিশ করা হয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যানের অভাবে তা কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যমূলক পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব ও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় এবং এসব অন্তরায় কীভাবে মোকাবেলা করা হবে সেজন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কৌশল পূর্বের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

নারীশিক্ষার মূলনীতি

ক. "নারীকে শিক্ষার মূলধারায় আনয়ন" নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শিক্ষার সকল সেক্টরের জন্য আবশ্যক বলে বিবেচিত হবে। এই উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তর ও শাখায় বৈষম্য ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনের লক্ষ্যে সময় ভিত্তিক (Time Frame) কৌশলাদি নির্ধারণ করা।

খ. বর্তমান শিক্ষা কমিটির প্রতিটি উপকমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশমালায় শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ও ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ নীতি, বিধান ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার দিকনির্দেশনা প্রস্তুত করা।

গ. ২০০৫ সালে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান শিক্ষাবৈষম্যের হার হ্রাস করা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি ও পাঠ শেষ করার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন করে সমতা আনার ঘোষনা দেওয়া এবং তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া।

ঘ. কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলি স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরি, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমতা নিশ্চিত করা।

ঙ. শিক্ষার সকল স্তরে (প্রাথমিক থেকে উচ্চতম পর্যায়) ও সকল শাখায় মানবিক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পেশামূলক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি) নারীর অবস্থানগত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনের জন্য বাস্তবভিত্তিক

www.pathagar.com

পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশগম্যতা (accessibility) নিশ্চিত করা।

চ. শিক্ষার সকল পর্যায়ে বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য সময়রেখা (Time Frame) নির্ধারণ করা।

ছ. বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচি, বিশেষ করে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান যে-কোনো দূরত্ব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিসমূহে সম সুবিধা নারীকে প্রদান করা।

জ. নরীসমাজকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সমঅধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা; সাধারণ শিক্ষাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য সকল প্রকার আনুষঙ্গিক সুবিধা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

ঝ. নারীশিক্ষার প্রকৃত অগ্রগতি নির্ধারণ শিক্ষার প্রতিটি শাখায় লিঙ্গভিত্তিক উপাত্ত (Gender Desegregated data) তৈরি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

কাঠামোগত সমস্যা নিরসন

ক. 'মেয়ে শিক্ষার্থী বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শুধু মেয়েদের স্কুলে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। শিক্ষার্থীর অনুপাতে মেয়েদের জন্য স্কুলের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

খ. সকল ছাত্রাবাস ও হোস্টেলের মধ্যে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ হোস্টেল নারী শিক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ করতে হবে যাতে নারী সেই সকল শিক্ষালয়ে পড়াশোনা করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীসময়ে প্রয়োজনবোধে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেলের সংখ্যা সমান করতে হবে।

গ. প্রত্যেক শিক্ষালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে তাদের টয়লেটের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সেগুলোতে মেয়েদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. প্রাথমিক পর্যায়ে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ন্যূনতম ৬০ শতাংশ নারীশিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, তাদের জন্য বাসস্থান এবং যথাযথ নিরাপত্তা ও প্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. সকল বিদ্যালয়ে মেয়েদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় বিশেষ সুবিধা থাকতে হবে। মেয়েরা যেহেতু ভবিষ্যতের মা এবং বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মা অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার, সুতরাং প্রতি বিদ্যালয়ে মেয়েদের পর্যাপ্ত খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক সচেতন হতে পারে।

www.pathagar.com

নারীশিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত নিম্নলিখিত ইস্যুগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

ক. আধুনিক গণমাধ্যম এবং লোকায়ত জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার (Indigenous Knowledge and Traditional Method) মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে নারীশিক্ষার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা।

খ. ছাত্রীদের শিক্ষায়তন থেকে ঝরে পড়া রোধের জন্য পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, শিক্ষালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান ও ক্ষেত্রবিশেষে বৃত্তিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

গ. পরিবারের নারীনির্যাতন ও শিক্ষালয়ে যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও সম্ভাব্য যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে শিক্ষক/কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে।

পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

ক. প্রতি বিষয়ের শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও সার্বিক শিক্ষার মান পর্যালোচনা ও পরীক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কমিটি/উপ-কমিটিতে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে করে শিক্ষার বিষয়বস্তুতে নারীর পরিপ্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়।

খ. শিক্ষার সকল স্তরে বিশেষ করে ইংরেজি, বাংলা ও সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করে লিঙ্গ বৈষম্য সূচক ভাবধারা বা নারীর সমঅধিকারের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বহন করে অনুরূপ বিষয়সমূহ পরিবর্তন করে নারীর প্রতি ইতিবাচক সমঅধিকারমূলক ও সমাজে নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা ও দায়িত্বের প্রতিফলন করতে হবে।

গ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অধিক সংখ্যক মহিয়সী নারীর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

ঘ. উপমহাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম মাধ্যমিক পাঠের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

নীতি নির্ধারণ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMC)

ক. শিক্ষাসংক্রান্ত সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে যথা মন্ত্রণালয় থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড/কমিটি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে অধিক মহিলা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকের নিয়মিত শিক্ষা প্রদান এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষার মান ইত্যাদি পরিবীক্ষণের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (SMS) ও অন্যান্য মনিটরিং কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম। অনুরূপভাবে, যে কোনো কমিটিতে বিশেষত

www.pathagar.com

মেয়েদের স্কুলে চারভাগের তিনভাগ সদস্য শিক্ষার্থীদের মায়েদের মধ্য নির্বাচন করতে হবে।

গ. বর্তমানে অভিভাবক হিসেবে পিতার নামের পাশে নাম লেখার বিধান চালু হলেও মাকে অভিভাবকের কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এমন কি পিতার অবর্তমানেও ভাই কিংবা পরিবারের অপরাপর পুরুষ সদস্যকে শিক্ষার্থীর অভিভাবক রূপে গণ্য করা হয়। এই নীতির পরিবর্তন করে মাতা ও পিতাকে শিক্ষার্থীর যুগ্ম অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পিতার অবর্তমানে মাকে মুখ্য অভিভাবক রূপে গণ্য করতে হবে।

অন্যান্য প্রেরণামূলক ব্যবস্থা

ক. সরকারি নীতি অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক হলেও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অনেক মাতাপিতা মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে দরিদ্র পরিবারের ছাত্রীকে বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ. গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের অংশ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১.২৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থী। এ ধরনের শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মেয়ে। এই বিরাট সংখ্যক মেয়ে যাতে পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগ পায় তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট নীতি থাকতে হবে এবং মন্ত্রণালয়কে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, সরকারি ও নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিনা মূল্যে সরকারি বই বিতরণের ব্যবস্থা আছে। অনুরূপভাবে এ সকল শিক্ষাব্যবস্থায় অধীনস্থ শিক্ষার্থীরাও যেন বিনামূল্যে বই পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. মেয়েদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও পেশাদারি শিক্ষায় (যথা-সাধারণ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কম্পিউটার ইত্যাদি) উৎসাহী করার জন্য বিশেষ বৃত্তি তহবিল গঠনের জন্য ব্যক্তি খাতকে (যেমন : ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) অন্যান্য দেশের মতো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা শিক্ষা তহবিলে প্রদত্ত অনুদানকে Tax Rebate-এর আওতায় এনে অনুপ্রাণিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

মাদ্রাসা শিক্ষায় নারী

ধর্মীয় শিক্ষার বর্তমান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পুরুষের পাশাপাশি বাংলাদেশে বহু মেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। বলা যায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার আলোকে পূর্বের বিভিন্ন শিক্ষা

www.pathagar.com

কমিশনসহ বর্তমান শিক্ষা কমিশনও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জীবনধারণ ও পেশা সংক্রান্ত কাজকর্মে পারদর্শী হবার ও বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জনের পরামর্শ দিয়েছে। এই কমিটিও তার সঙ্গে একমত পোষণ করে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েদেরও পুরুষের অনুরূপ জীবিকা অর্জনে আত্মনির্ভরশীল হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীরা অবহেলিত এবং যথাযথ মানের শিক্ষা অর্জন থেকে তারা বঞ্চিত। বর্তমান কমিশনের সদস্যগণ মহিলা মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবেশ ও মান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন মহিলা মাদ্রাসা পরিদর্শনের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উদ্বেগ ও সমস্যা চিহ্নিত করে যার আশু সমাধান করা প্রয়োজন।

মহিলা মাদ্রাসা পরিদর্শন করে বর্তমান উপকমিটি বিশেষ কিছু উদ্বেগ (Concern) চিহ্নিত করে

ক. ছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে মাদ্রাসা বিশেষত আবাসিক মাদ্রাসাগুলোতে ক্লাস ঘর ও বাসস্থান অত্যন্ত অপ্রতুল।

খ. ছেলেদের মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ থাকলেও মেয়েদের মাদ্রাসায় অনুরূপ সুযোগ না থাকায় ভবিষ্যতে ছাত্রীরা চিকিৎসা বা বিজ্ঞানের কোন শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভে সক্ষম হয় না।

গ. দাখিল ও আলিম পাঠ্যক্রম ইংরেজি শিক্ষা এস. এস. সি এবং এইচ, এস, সি সমমানের করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ঘ. মহিলা মাদ্রাসায় কোন লাইব্রেরি না থাকায় মেয়েদের রেফারেন্স বই ব্যবহার ও সাধারণ জ্ঞান লাভের সুযোগ নেই।

ঙ. মাদ্রাসার মেয়েদের টিভি প্রোগ্রাম দেখতে দেওয়া হয় না, যা তাদের শুধু বাস্তবে জীবন বিচ্ছিন্ন ও জ্ঞানহীন করে তাই নয়, কোন প্রকার বিনোদনেরও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটিই সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের পরিপন্থী।

উপযুক্ত বিষয়গুলো বাস্তবতার আলোকে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ কর্তৃক সমস্যা সমাধানের জন্য অত্র উপ-কমিটি সুপারিশ করছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নারীশিক্ষার বিষয়টি এখন পর্যন্ত বৈষম্যমূলক। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে নারীর অগ্রগতি সাফল্য লাভ করেনি। পারিবারিকভাবে জনসচেতনতা নারীশিক্ষাকে খানিকটুকু এগিয়ে দিয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা খানিকটুকু এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপক উদ্যোগ নিয়ে তৈরি করা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনের সহায়ক শক্তি হয়েছে তা কোনোভাবেই বলা যাবে না।

www.pathagar.com

শিক্ষাক্ষেত্রে পারিবারিক বিনিয়োগ ও লিঙ্গবৈষম্য

মোঃ আবুল বাশার

ভূমিকা

শিক্ষার পিছনে ব্যয়কে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে আর নিতান্তই ভোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না; বরং মানবসম্পদ উন্নয়নে এটি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে শিক্ষাকে দেখা হয় নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে প্রকৃত মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন তৈরির অন্যতম উপায় হিসেবে।

ক্রমশ বিকাশমান অর্থনীতি শাস্ত্রের গোড়া থেকেই শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মার্শাল প্রভৃতি ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর জোর গুরুত্ব প্রদান করেছেন, আর এই মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষা। নয়া-ধ্রুপদী (Neo-classical) অর্থনীতিবিদরা প্রথম দিকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ১৯৫০-এর দশকে অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্যতম বিষয় ছিল Harod-Domar Growth মডেল। এই মডেল অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে মূলধনের ওপর। বিদ্যমান কারিগরি এবং প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির উৎস হচ্ছে পুঁজি পুঞ্জীভূতকরণ (capital accumulation)। প্রায় সমসাময়িককালে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে Arthur Lewis-এর dual-economy মডেলের প্রভাবও বাড়তে থাকে। এই মডেলের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষি খাতে উদ্বৃত্ত শ্রমিক বিরাজ করে এবং কৃষি খাত থেকে উৎপাদনের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে শ্রমিককে শিল্প খাতে নিয়োগ দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। যেহেতু এসব দেশে শিল্পায়নের পথে বড় বাধা ছিল পুঁজির অভাব সেহেতু এই মডেলের প্রক্ষাপটে মূলধন পুঞ্জীভূতকরণকে লক্ষ্য করেই সকল অর্থনৈতিক পলিসি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু মোট প্রবৃদ্ধিকে উপাদানভিত্তিক আয়ের (factor earning) যোগফল গণ্য করে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেল মোট প্রবৃদ্ধির এক বড় অংশের উৎসকে পুঁজি বা শ্রম আয়ের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

Abramovtiz, Solow প্রভৃতি অর্থনীতিবিদরা প্রবৃদ্ধির এই অচিহ্নিত-অসংজ্ঞায়িত উৎসের নাম দেন 'Residual' উৎস। কিন্তু Schultz ১৯৬১ সালে দেখান যে, শিক্ষা হচ্ছে প্রবৃদ্ধির 'Residual' উৎসের অন্যতম প্রধান অংশ। এরপর থেকে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে একে পরিমাপও করা হয়েছে (Becker 1964, Blaug 1965)।

এসব পরিমাপক বা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Quantative Analysis)-এর আলোকপাত হচ্ছে শিক্ষার ভূমিকা বা ফলাফলের (output) ওপর, কিন্তু কি কি বিষয় শিক্ষার ব্যক্তিগত চাহিদা (private demand)-কে প্রভাবিত করে তা এসব বিশ্লেষণের বিষয় ছিল না। তাই এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরা গেলেও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গবৈষম্য, আঞ্চলিক তারতম্য এবং গ্রাম ও শহরের পার্থক্য ও শিক্ষায় ব্যক্তিগত বিনিয়োগের নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে, বিশেষত বাংলাদেশে, শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য (সংযোজনী ১ (ক) ও ১ (খ) দেখুন), গ্রাম ও শহরের তফাৎ (সংযোজনী–২– এবং আঞ্চলিক তারতম্য (সংযোজনী-৩) সর্বজন বিদিত। আন্তঃবংশীয় (Inter-generational) উপযোগ ধারণাটির প্রেক্ষাপটে একথা অনস্বীকার্য যে, পিতামাতা তাদের সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এবং পারিবারিক উপযোগ সর্বাধিকীকরণ প্রক্রিয়া কোনভাবেই নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না যে, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাস্তর নির্ধারিত হতে হয় তাদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে অথবা পারিবারিক সম্পদে মালিকানা বা অধিকারের (Property right) ভিত্তিতে। উন্নয়নশীল দেশে দেখা যায় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে পারিবারিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়েরা সর্বদাই উপেক্ষিত। প্রধানত Garry Becker-এর রচনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা "New Household Economics"-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে পরিবারের সকল সদস্যের একটি যৌথ উপযোগ অপেক্ষক বিরাজ করে। এই উপযোগ সর্বাধিকীকরণের প্রক্রিয়ায় পরিবার বিনিয়োগের মাধ্যমে Qualified Adults উৎপন্ন করে। সুতরাং প্রশ্ন হলো, Qualified Adults তৈরির ক্ষেত্রে পরিবার অবিবেচকস্বরূপ মেধা ও বুদ্ধিমত্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে লিঙ্গভেদকেই এত গুরুত্ব প্রদান করে কেন? বর্তমান রচনায় একটি সহজ মডেলের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাইভেট (পারিবারিক) বিনিয়োগের নিয়ামকসমূহ এবং লিঙ্গ ও অন্যান্য বৈষম্যের অর্থনৈতিক কারণসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

মডেল

ধরা যাক 'n' সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট কোন পরিবারের মোট সম্পদের পরিমাণ 'R' তার মধ্যে জীবন ধারণার্থ প্রয়োজনীয় (Subsistence) সামগ্রীর পিছনে খরচ S (n), সুতরাং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী সম্পদের পরিমাণ, NS (n)R-S(n)

www.pathagar.com

NS (n) শিক্ষাসহ অন্যান্য বিনিয়োগমূলক কাজে অথবা non subsistence ভোগ্য সামগ্রী ক্রয়ের পিছনে ব্যয় হতে পারে। শিক্ষাসহ অন্যান্য বিনিয়োগমূলক কাজ এবং ভোগের কাজে NS (n)-কে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত আসলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরই নামান্তর। কারণ শিক্ষা আসলে ভবিষ্যৎ ভোগের সুযোগকেই প্রশস্ত করে। পরিবার সব সময়েই তার সম্পদকে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উপযোগ সর্বাধিকীকরণের জন্য ব্যবহার করে। প্রত্যেক পরিবারের একটি Inter-temporal নিরপেক্ষ রেখা থাকে যা প্রধানত ঐ পরিবার ভবিষ্যৎ-প্রাপ্তিকে কিভাবে মূল্যায়ন করে তার ওপর নির্ভর করে। ধরা যাক কোন পরিবার ভবিষ্যতের প্রাপ্তির চেয়ে বর্তমানের প্রাপ্তিকে 'A' গুণ বেশি গুরুত্ব দেয়। এবং প্রতি একক শিক্ষার ফলে 'W' পরিমাণ ভবিষ্যৎ প্রতিদান (return) পাওয়া যায়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে বাজার ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি থাকে। মুনাফা সর্বাধিকীকরণই এখানে একমাত্র অর্থনৈতিক-নিয়ামক শক্তি নয়। শিক্ষার প্রতিদান এখানে আংশিকভাবে নির্ভর করে পরিবারের সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান, তথ্যের প্রাপ্যতা ইত্যাদির ওপর। নয়া-ধ্রুপদী অর্থনৈতিক মতবাদ যে 'মুনাফা সর্বাধিকীকরণ' অনুমতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা প্রায়শই পক্ষপাতিত্ব, (nepostsm), জ্ঞাতি সম্পর্ক (kinship) প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মুনাফা সর্বাধিকীকরণের ভিত্তিতে কেন একটি বেসরকারি ফার্মের মালিক অনেক যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও তার অযোগ্য শ্যালক (brother-in-law)-কে নিয়োগ প্রদান করে তা ব্যাখ্যা করা যায় না। ধরা যাক শিক্ষার প্রতিদানের ওপর এসব বিষয়ের প্রভাবকে 'x' দ্বারা প্রকাশ করা যায়, এবং উচ্চতর সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান এবং অধিক তথ্যের প্রাপ্যতার জন্য 'x'-এর মান বড় হবে। সুতরাং গৃহীত শিক্ষার স্তর যদি 'E' হয় তবে শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ আয় হবে x.W.E। শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ আয় এবং পরিবার কি হারে ভবিষ্যৎ আয়কে বর্তমান আয়ের সমতুল্য করে মূল্যায়ন করে তার ওপর নির্ভর করে পরিবারের শিক্ষা এবং অন্যান্য non-subsistence দ্রব্যের মধ্যকার নিরপেক্ষ রেখার রূপ কি হবে। শিক্ষার খরচের দুটি অংশ আছে—একটি হচ্ছে স্কুল বা কলেজের বেতন, অন্যটি হচ্ছে বইপত্রসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদির ওপর ব্যয়কৃত খরচ।

শিক্ষার স্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে এই দু'প্রকার খরচই বৃদ্ধি পায়, তাই শিক্ষার খরচ অপেক্ষক আসলে non-linear হবে। ধরা যাক, এই খরচ অপেক্ষক হচ্ছে

$$C(E) = bE^q$$

b,q হচ্ছে স্থির রাশি যেখানে b>o এবং q>।

যদি Non-subsistance দ্রব্যের মূল্য 'Px' হয় তবে উপযোগ সর্বাধিকরণের ক্ষেত্রে উক্ত পরিবার নিম্নোক্ত খরচ রেখার মুখোমুখি হবে

$$bE^q + PxX = NS(n)$$

যেখানে X হচ্ছে ক্রয়কৃত মোট non-subsistence দ্রব্য।

www.pathagar.com

উপযোগ সর্বাধিকরণ এবং শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ

নিম্নের চিত্রে শিক্ষাকে উল্লম্ব অক্ষে এবং non-subsistence দ্রব্যের ভোগকে আনুভূমিক অক্ষে চিত্রিত করা হয়েছে। XE রেখাটি উপরে বর্ণিত খরচ অপেক্ষকের ভিত্তিতে অংকিত এবং উক্ত রেখাটি NS (n)-এর ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ শিক্ষা বা অন্যান্য non-subsistence দ্রব্য ভোগ করা যাবে এবং এক একক শিক্ষা বেশি গ্রহণ করার জন্য কতটুকু ভোগ কমাতে হবে তা দেখায়। X বিন্দু থেকে E বিন্দুতে স্থানান্তরের XE প্রাক্কালে লেখাটির ক্রমহ্রাসমান ঢাল আসলে শিক্ষার খরচ অপেক্ষকের ক্রমবর্ধক গুণাগুণকেই তুলে ধরে।

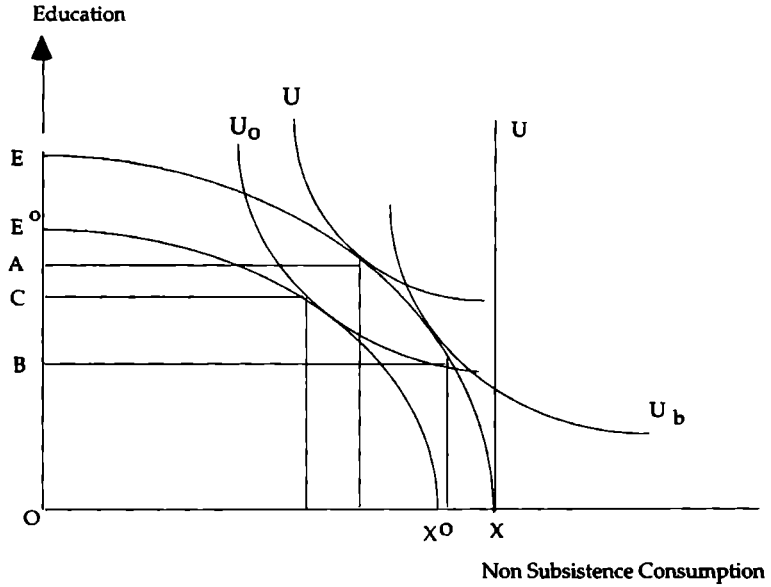

যদিও XE এর আকার বাজার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধমে নির্ধারিত হয়ে থাকে, প্রত্যেক পরিবারের জন্য XE এর অবস্থান নির্ভর করে ঐ পরিবারের মোট NS(n)-এর উপর। একইভাবে একটি পরিবারের নিরপেক্ষ রেখার আকার এবং অবস্থান নির্ভর করবে ঐ পরিবারের 'x' এবং 'a'-এর মানের ওপর। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের কথা এক্ষেত্রে আলোচনা করা যাক।

ধরা যাক পরিবার 'A' এবং 'B' পরিমাণ সম্পদ NS (n) non-subsistence কাজে ব্যয় করতে সমর্থ। কিন্তু 'A' এর চেয়ে 'B' এর 'a' বড় এবং 'x' ছোট। উপরের চিত্রে 'A' এর নিরপেক্ষ রেখা হবে Ua এবং 'B' এর নিরপেক্ষ রেখা হবে Ub নিরপেক্ষ রেখার সাথে 'XE' রেখার স্পর্শবিন্দুই হচ্ছে কোন পরিবারের ভারসাম্য বিন্দু যার মাধ্যমে বর্তমান non-subsistence ভোগ এবং শিক্ষার মধ্যে NS(n)-এর বণ্টন নির্ধারিত হয়। ভারসাম্য বিন্দুর ভিত্তিতে দেখা যায় যে, 'A' মোট 'AO' এবং 'B' মোট 'BO' পরিমাণ শিক্ষা গ্রহণ করবে যেখানে OA>BO, অর্থাৎ 'A' শিক্ষার পিছনে 'B'-এর

www.pathagar.com

বেশি সম্পদ ব্যয় করবে। এবং 'AB' হচ্ছে 'a' এবং 'x' এর ভিন্নতার ফলাফল। একইভাবে ধরা যাক 'C'-এর ক্ষেত্রে 'A' এবং 'x' 'A' এর সম্মান কিন্তু তার মোট সম্পদ NS(n) 'A' এর চেয়ে কম। তাই 'C'-এর XE 'A' এবং 'B' এর XE এর নিচে 'XE' অবস্থান করে। 'C' এর মোট শিক্ষাস্তর এবং শিক্ষার পিছনে ব্যয় হবে যথাক্রমে OC এবং b $(OC)^q$ যেখানে OC<OA এবং b $(OC)^q$ < b $(OA)^q$। যদি কোন পরিবারের কাছে বর্তমানে ভোগের গুরুত্ব অসীম হয়, তবে তার নিরপেক্ষ রেখা হবে উল্লম্ব (চিত্রে XU) এবং ঐ পরিবার শিক্ষার পিছনে কোন সম্পদই বিনিয়োগ করবে না। দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত পরিবারের ক্ষেত্রে উল্লম্ব নিরপেক্ষ বিরাজ করে।

শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ বা ভর্তুকি প্রধানত শিক্ষার খরচ অপেক্ষককে প্রভাবিতকরণের মাধ্যমে XE কে উপরের দিকে স্থানান্তর করে। ফলে পরিবারের মোট NS(n)-এর পরিবর্তন না হলেও শিক্ষার পিছনে বিনিয়োগ বাড়তে পারে। অবশ্য অনেক সময় তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, ভৌত সুবিধার অভাবেও ভর্তুকি বা সরকারি বরাদ্দ শিক্ষার পিছনে পারিবারিক বিনিয়োগকে প্রভাবিত করতে পারে না। ধরা যাক Es হচ্ছে সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা স্তর এবং এ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার যাবতীয় উপকরণাদি সরকার সরবরাহ করে। তাহলে খরচ অপেক্ষককে আমরা নিম্নোক্তভাবে লিখতে পারি :

$C(E) = b(E)—(Es)^q$ যেখানে

a = 1, যখন কোন পরিবার Es স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত না হয়।

a = 0, যখন কোন পরিবার কোন কারণে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত না হয়।

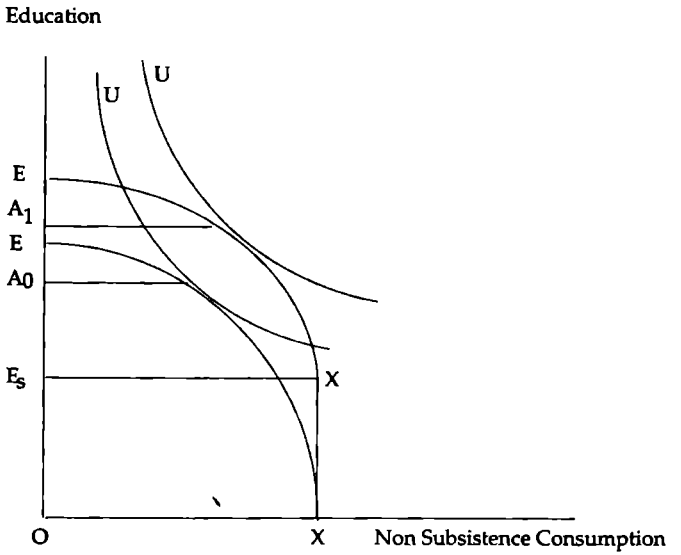

www.pathagar.com

উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন এলাকায় অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকে তবে ঐ এলাকার পরিবারসমূহের জন্য a = 0 হবে।

শিক্ষার সকল স্তরে প্রদত্ত ভর্তুকি হয় 'b' অথবা, 'q' অথবা উভয়েরই মান কমিয়ে শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি করবে।

উপরোক্ত চিত্রে দেখা যায় যে, অবৈতনিক শিক্ষা স্তর Es-এর ফলে একই পরিমাণ Ns(n) হওয়া সত্ত্বেও যে পরিবারের a-1, তার XE, মূল অবস্থান থেকে উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে 'XE' হবে এবং a = 0 হলে তা মূল অবস্থানেই থেকে যাবে। ফলে দু'পরিবারের Ns(n) এবং নিরপেক্ষরেখা একই হলেও শিক্ষার চাহিদা পরিবর্তন হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য

উপযোগ সর্বাধিকীকরণের প্রক্রিয়ায় একটি পরিবার আসলে নির্ধারণ করে কি পরিমাণ সম্পদ সে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে। এবং তারপর নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব (Comparative Advantage Theory) অনুযায়ী, যদি সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য পরিবারের সকল সদস্যের শিক্ষা খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তবে সীমিত সম্পদ সদস্যদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বা তুলনামূলক দক্ষতা (relative efficiencey)-র ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। কিন্তু এরূপ আন্তঃসদস্য বণ্টন ব্যবস্থা প্রায়শঃই অন্যান্য কিছু কাঠামোগত বিষয় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশসমূহে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের উদ্ভব হয়।

বাংলাদেশ সহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে, পিতামাতা তাদের বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের সাথে বসবাস করেন। এজন্য পুত্রের ভবিষ্যৎ আয় বাড়ানোর জন্য তাঁরা যা কিছু বিনিয়োগ করেন তা আসলে তাদের বৃদ্ধ বয়সের ইন্স্যুরেন্স (old-age insurance) স্বরূপ। আর এজন্য কন্যার চেয়ে পুত্রের শিক্ষার দিকেই তাদের নজর এবং যত্ন বেশি থাকে। আর পুত্রের শিক্ষার প্রতি এই অধিকতর যত্ন এবং নজরই পরিবারের যৌথ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। যেহেতু কন্যার বিবাহোত্তর আয়ে পিতামাতার অধিকার সাধারণভাবে স্বীকৃত নয় এবং যেহেতু পিতামাতা আগে থেকেই জানেন না কন্যার পিছনে বিনিয়োগকৃত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ আয় পুরোপুরি তাদের ভাবী পুত্রবধূর আয় দ্বারা পূরণ হবে কিনা, সেহেতু নিরাপদ কৌশল হিসেবে তারা পুত্রের শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ যেহেতু তাদের ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে তারা আগে থেকেই অবগত নন এবং তার পিতামাতার সাথে পূর্ব থেকেই কোন সন্ধিতে আসা সম্ভব নয় সেহেতু এক্ষেত্রে Isolation Paradox (Sen 1984)-এর কারণে পিতামাতার পক্ষপাত পুত্রের দিকেই যায়। ধরা যাক, দুটি পরিবার 'P' 'O' অপেক্ষা শিক্ষা খাতে বেশি বিনিয়োগ করে। ধরা যাক 'P' যদি পুত্রের শিক্ষা খাতে মেয়ের চেয়ে বেশি সম্পদ বিনিয়োগ করে এবং ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আয় হবে যথাক্রমে psb এবং pdb যেখানে psb > Pdb। কিন্তু 'p' যদি তার পুত্র এবং মেয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না

www.pathagar.com

করে উভয়কে সমান গুরুত্ব দেয় তবে তাদের ভবিষ্যৎ আয় হবে Pu, যেখানে, Psb > Pu>Pdb। একইভাবে 'O' যদি পুত্র এবং মেয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কৌশল গ্রহণ করে তবে তাদের ভবিষ্যৎ আয় হচ্ছে যথাক্রমে Osb এবং Odb যেখানে Osb > Odb এবং Osb < Psb, Odb < Pdb, কিন্তু O এর অবৈষম্যমূলক কৌশলের ফলে পুত্র এবং কন্যা উভয়েরই ভবিষ্যৎ আয় হবে Ou এবং যেহেতু এর চেয়ে বেশি সম্পদ শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করে তাদের উভয়ের 'x' কে একই ধরে নিয়ে বলা যায় Pu > Ou, উপরোক্ত কৌশল এবং আয়সমূহকে নিচের টেবিল দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

পরিবার	লিঙ্গ	ভবিষ্যৎ আয়	
		বৈষম্যমূলক কৌশল	অবৈষম্যমূলক কৌশল
P	পুত্র	Psb	Pu
	কন্যা	Pdb	Pu
O	পুত্র	Osb	Ou
	কন্যা	Odb	Ou

যদি এই দু'পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তবে উভয় পরিবারের ভবিষ্যৎ আয় হবে নিম্নরূপ :

		P	
O	বৈষম্যমূলক কৌশল	বৈষম্যমূলক কৌশল	অবৈষম্যমূলক কৌশল
		(Osb+Pdb), (Psb+Odb)	(Pu+Osb), (Pu+Odb)
	অবৈষম্যমূলক কৌশল	(Osb+Pdb), (Psb+Ou)	(Ou+Pu), (Ou+Pu)

যদি উভয় পরিবার বৈষম্যমূলক কৌশল গ্রহণ করে তবে 'P' এর ভবিষ্যৎ আয় হবে (Psb+Odb) এবং 'O' এর ভবিষ্যৎ আয় হবে (Osb+Pdb)। যদি 'O' বৈষম্যমূলক কৌশল গ্রহণ করে এবং 'P' এর ভবিষ্যৎ আয় হবে (Pu+Odb)। যেহেতু Psb > Pu, (Psb+Pdn) > Pu+Odb), সুতরাং 'O' এর বৈষম্যমূলক কৌশলের প্রেক্ষাপটে 'P' এর লাভজনক কৌশল হবে বৈষম্যমূলক কৌশল। যদি 'O' এর অবৈষম্যমূলক কৌশল গ্রহণ করে এবং P যদি বৈষম্যমূলক কৌশল গ্রহণ করে তবে তার ভবিষ্যৎ আয় হবে (Psb+Ou)। কিন্তু 'O' ও যদি বৈষম্যমূলক কৌশল গ্রহণ করে তবে 'P' এর ভবিষ্যৎ আয় হবে (Ou+Pu)। যেহেতু Psb > Pu, (Psb+Ou) > (Ou+Pu)। তাই 'O' এর অবৈষম্যমূলক কৌশলের প্রেক্ষাপটেও 'P' এর প্রধান ও লাভজন (dominant) কৌশল হবে বৈষম্যমূলক কৌশল। একইভাবে দেখানো যায় যে, 'P' এর বৈষম্যমূলক কৌশলের ক্ষেত্রে 'O' এর লাভজন কৌশল হবে বৈষম্যমূলক কারণ (Osb+Pdb) > (Ou+Pdb)। এবং যেহেতু (Pu+Osb) > (Pu+Ou), 'P' এর অবৈষম্যমূলক কৌশলের ক্ষেত্রে 'O' এর লাভজনক কৌশল হবে বৈষম্যমূলক। তাই 'P'

www.pathagar.com

এবং 'O' এর জন্য প্রাপ্ত Nash equilibrium হবে পুত্র এবং কন্যার শিক্ষা খাতে বৈষম্যমূলকভাবে সম্পদ বিনিয়োগকরণ।

যদি 'P' এবং 'O' একই পরিমাণ সম্পদ শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করে এবং উভয়ের জন্য 'X' এর মান যদি একই হয় তবে

$Psb = Osb$

$Pdb = Odb$

$Pu = Ou$

এবং যদি ধরে নেয়া হয় যে, 'x' এর মান লিঙ্গ-ভেদের সাথে মোটেও সম্পর্কিত নয় তবে বলা যায় যে,

$Psb = Osb = Pdb = Odb = Pu = Ou$

এ ক্ষেত্রে

$(Psb+Odb) = (Pu+Odb)$

$(Psb+Ou) = (Ou+Pu)$

$(Osb+Pdb) = (Ou+Pdb)$ এবং $(Pu+Osb) = (Pu+Ou)$

এমতাবস্থায় শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের কোন অর্থনৈতিক কারণ থাকবে না। কিন্তু আয়ের বৈষম্য এবং অ-অর্থনৈতিক কারণসমূহের উপস্থিতির ফলে 'x' এর মান পরিবার এবং লিঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয় বলে উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যহীন পারিবারিক কৌশল আশা করা যায় না।

প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

এ পর্যায়ে উপরে বর্ণিত মডেলের আলোকে বাংলাদেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান লিঙ্গবৈষম্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপরোক্ত মডেলের ভিত্তিতে বলা যায় যে, যেহেতু শিক্ষার স্তর বাড়ার সাথে সাথে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে শিক্ষার খরচও বাড়ে সেহেতু শিক্ষার স্তর বাড়ার সাথে সাথে অধিক সংখ্যক নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে মেয়ের শিক্ষার পিছনে বিনিয়োগ ছেলের শিক্ষার পিছনে বিনিয়োগের বহিষ্কারক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শিক্ষার নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে লিঙ্গবৈষম্য অধিক মাত্রায় প্রতিভাত হবে।

সারণী—১ বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা এবং ছাত্রের শতকরা হিসাবে ছাত্রীর সংখ্যা দেখাচ্ছে। মডেলে যেরূপ আশা করা হয়েছিল, সারণী—১ ঠিক সেরকমের লিঙ্গবৈষম্যই তুলে ধরছে। প্রাথমিক স্তরে লিঙ্গবৈষম্য সর্বনিম্ন এবং অন্যান্য স্তরের তুলনায় ঐ বৈষম্য অনেক কম। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার ফলে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গামীদের সময়ের মূল্য (opportunity cost) খুব একটা বেশি না হওয়ার কারণেই এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন লিঙ্গবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

সারণী ১ থেকে দেখা যায় যে, প্রাথমিক স্তরে ছাত্রের সংখ্যার প্রায় শতকরা ৮১ ভাগ ছাত্রী বিদ্যালয়ে গেলেও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যার মাত্র শতকরা

www.pathagar.com

৫১ ভাগ। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা আরো কমে ছাত্রের সংখ্যার শতকরা ৩২.৫৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। কারণ

সারণী ১

বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৯১)

	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্রের% হিসেবে ছাত্রীর সংখ্যা
প্রাথমিক	১০০১৯২৪	৮০৯৭৩২	৮০.৮২
মাধ্যমিক	১৮১৯২৫৯	৯২৯০৯১	৫১.০৭
উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক কলেজ	৬২১৬১০	২০২৩০২	৩২.৫৫
বিশ্ববিদ্যালয়*	৫০৬৮৭	১৬০২৯	১৩.২৯

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অভ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ১৯৯২ ও বাংলাদেশ ব্যুরো অভ স্ট্যাটিস্টিকস ১৯৯৭।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে খরচের আধিক্যের কারণে মেয়ের শিক্ষা অনেক নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্যই দুরূহ বা ছেলের শিক্ষার বহিষ্কারক হয়ে দাঁড়ায়। লিঙ্গবৈষম্যের সবচেয়ে হতাশাজনক চিত্র পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা স্তরে। ১৯৯৫/৯৬ সালে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যার মাত্র শতকরা ১১.৬২ ভাগ।

একই শিক্ষা স্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পিছনে ব্যয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজি মাধ্যমে অধীত ছাত্রের 'O' লেভেল পর্যন্ত শিক্ষার পিছনে ব্যয় বাংলা মাধ্যমে অধীত ছাত্রের সমস্তর পর্যন্ত শিক্ষার পিছনে ব্যয়ের কয়েক গুণ বেশি। একইভাবে সরকারি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের শিক্ষা খরচ বেসরকারি কলেজ বা বিশ্বিবিদ্যালয়ের ছাত্রের চেয়ে অনেক কম। সুতরাং আশা করা যায় যে, একই শিক্ষা স্তরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গবৈষম্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম হবে। তবে সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে (বিশেষ করে উচ্চস্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে) সাধারণত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েরাই পড়াশোনা করে। সেক্ষেত্রে পিতামাতা তাদের ছেলে-মেয়ের শিক্ষার পিছনে বিনিয়োগকে তাদের বৃদ্ধ-বয়সের ইন্সুরেন্স হিসেবে নাও দেখতে পারে অথবা মেয়ের শিক্ষার পিছনে ব্যয় সবসময় ছেলের শিক্ষার বহিষ্কারক নাও হতে পারে। সুতরাং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক পারিবারিক অবস্থার কারণে সবসময়ই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের লিঙ্গবৈষম্য প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি নাও হতে পারে।

সারণী—২ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভেদে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তুলে ধরছে। সারণী—২ থকে সুস্পষ্ট যে, প্রাথমিক স্তরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে

* ১৯৯৫/৯৬ সালের জন্য

www.pathagar.com

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা লিঙ্গবৈষম্য বেশি। সরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যার শতকরা ৭৮.৫ ভাগ কিন্তু সরকারি পর্যায়ে তা ৮৮.৪১ ভাগ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেসরকারি পর্যায়ে অনেক এন.জি.ও. স্কুল কাজ করছে যারা মেয়েদের শিক্ষাকে সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

সারণী ২

বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৯১)

	সরকারি			বেসরকারি		
শিক্ষাস্তর	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্রের % হিসাবে ছাত্রীর সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্রের % হিসেবে ছাত্রীর সংখ্যা
প্রাথমিক	৫৫২৫৩৯২	৪৩৪১৪৩২	৭৮.৫৭	৮৯৯৩৬৬	৭৯৫১৪০	৮৮.৪১
মাধ্যমিক	১০৭৭৫৬	৮৭০৭৯	৮০.৮১	১৭১১৫০৩	৮৪২০১২	৪৯.২০
উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক	২৪৯৪৬৩	৭৯১৪৬	৩১.৭৩	৩৭২১৪৭	১৩৯৯৭২	৩৩,০৯

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অভ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ১৯৯২ ও বাংলাদেশ ব্যুরো অভ স্ট্যাটিস্টিকস ১৯৯৭।

মাধ্যমিক স্তরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গ বৈষম্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক কম। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যার শতকরা ৮০.৮১ ভাগ হলেও বেসরকারি পর্যায়ে তা মাত্র ৪৯.২০। মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দৃষ্ট লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যে খুব একটা তফাৎ দেখা যায় না।

সারণী ৩

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৯৫/৯৬)

বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্রের % হিসাবে ছাত্রীর সংখ্যা
ঢাকা	১৪৩৮০	৬৪৮৩	৪৫.০৮
রাজশাহী	১১১৫০	৩৩৮৪	১০.৩৫
চট্টগ্রাম	৭৪৪৫	২৬০৬	৩৫.০০
জাহাঙ্গীরনগর	৩২৩০	১৩০২	৪০.৩১
বুয়েট	৪৪৬৬	৫৬৬	১২.৬৭
কৃষি	৪২২০	৬১৯	২৪.৬৭
ইসলামী	৪০১৬	৫৩৬	১৩.৩৫
শাহজালাল	১৩৩০	১৮৩	১৩.৭৫
খুলনা	৬৩০	১২৪	১৯.৬৮
মোট	১১৭৬৬৭	১৫২৬৭	১২.৯৮

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অভ স্ট্যাটিসটিকস ১৯৯৭।

www.pathagar.com

সারণী ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৯৫/৯৬)

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্রের % হিসেবে ছাত্রীর সংখ্যা
নর্থ-সাউথ	২৩২	৮৭	৩৭.৫
সেন্ট্রাল উইমেন্স	৯৯	০	০
ইনডিপেন্ডেন্ট	২৩৭	১০৪	৪৩.৮৮
দারুল আহসান	৩৭৫	৭৫	২০
ইসলামিক	২৬৪	০	০
আহসানউল্লা	২১৪	৩১	১৪.৪৯
কুমিল্লা	১৬	২	১২.৫
এশিয়ান ইউনিভারসিটি অভ বাংলাদেশ	৫১০	৫৭	১১.১৮
আই.ইউ.বি.এ.টি	২৮৫	৩৬	১২.৬৩
ইস্ট-ওয়েস্ট	৯৬	৩১	৩২.২৯
কুইন্স	৪৬	১৫	১২.৬০
ইউনিভার্সিটি অভ এশিয়া প্যাসিফিক	৭	১	১৪.২৯
ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি	৬০৫	৩২৩	৪৩.৩৯
মোট	২৯৮৬	৭৬২	২৫.৫২

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অভ স্ট্যাটিসটিকস ১৯৯৭।

সারণী-৩ ও ৪ বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী ১৯৯৫/৯৬ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দেখাচ্ছে। উভয় প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ে লিঙ্গবৈষম্যের চিত্রটি খুবই সুস্পষ্ট। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচ অনেক বেশি হলেও উভয় ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য খুব একটা তফাৎ করে না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বেশি হওয়ার কারণেই শুধু সচ্ছল পরিবারই তা বহন করতে পারে যাদের পক্ষে মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালানোও সম্ভব। এজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বরং লিঙ্গবৈষম্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম।

উপসংহার

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের প্রশ্নটি আসলে পরিবারের সামগ্রিক উপযোগ সর্বাধিকরণ প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরিবার শিক্ষার সামাজিক গুরুত্বের প্রশ্নটিকে বিবেচনায় না এনে শুধু ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন খাতে (খাত বলতে এক্ষেত্রে পরিবারের বিভিন্ন সদস্যকে বুঝানো হয়েছে) সীমিত সম্পদ বণ্টন করে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ শিক্ষার খরচ এবং শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

আয় এবং ভবিষ্যৎ আয়ের জন্য বর্তমান ভোগকে বর্জন করার সামর্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধাপের সাথেও শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে যা আবার শিক্ষার সাথেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত না করে শুধু উচ্চশিক্ষার পিছনে ব্যয়কৃত ভর্তুকি আসলে অর্থনৈতিক বৈষম্যই তৈরি করবে। কারণ দরিদ্র ঘরের মেধা ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সন্তানরাও সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাস্তর অতিক্রম করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে শুধু উচ্চ শিক্ষার ভর্তুকি প্রদান অপেক্ষাকৃত ধনীদেরই ভর্তুকি প্রদানের শামিল হবে। ভর্তুকির প্রশ্নটি বাজার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে ধরনের শিক্ষার চাহিদা বাজারে বিদ্যমান শুধু সে ধরনের শিক্ষাকেই পৃষ্ঠপোষকতা না করলে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবার থেকে অনেক বেকার শিক্ষিত শ্রেণীই তৈরি হবে। বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোতে পিতামাতা-কন্যার বিবাহোত্তর আয় ভোগ করতে পারে না বিধায় শিক্ষা খাতে সম্পদ বিনিয়োগে পিতামাতা কন্যার চেয়ে ছেলের শিক্ষাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। যখন ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার পিছনে বিনিয়োগ একটি আরেকটির বহিষ্কারক (mutually-exclusive) হয়ে দাঁড়ায় তখন ছেলের শিক্ষার প্রশ্নটিই অগ্রাধিকার পায়। এই অর্থনৈতিক বিবেচনাই শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্যের উদ্ভাবক। যদি পরিবারের সকল সদস্যের শিক্ষার পিছনে ব্যয় করার মতো যথেষ্ট সম্পদ বিদ্যমান থাকে তাহলেই কেবল মেয়েদের এই লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতে হবে না। অথবা সরকারের রাজস্বনীতি মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণকে যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ব্যয়মুক্ত করতে পারে তা'হলে তা ছেলের শিক্ষার বহিষ্কারক হবে না—তাহলে কেবল মেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হবে না।

সংযোজনী ১

সারণী ১ ক

বছর	শিক্ষিতের হার			
	সব বয়সের		সাত বছর এবং তদূর্ধ্ব	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	২৬.০	৮.৬	৩১.৪	১০.৭
১৯৭৪	২৭.৬	১২.২	৩৬.৬	১৬.৪
১৯৮১	২৫.৮	১৩.২	৩৩.৮	১৭.৭
১৯৯১	৩০.০	১৯.৫	৩৮.৯	২৫.৫

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অভ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ১৯৯২।

www.pathagar.com

সারণী ১ খ

বছর	ন্যূনতম প্রথম ডিগ্রিপ্রাপ্তদের হার			
	সব বয়সের		সাত বছর এবং তদূর্ধ্ব	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	২১.৯	৭.১	২৬.৫	৮.৮
১৯৭৪	২৩.৬	১০.২	৩১.০	১৩.৮
১৯৮১	৩৪.৩	১৯.৬	৪৫.৯	২৬
১৯৯১	৪০.৩	২৮.৬	৫২.১	৩৭.৩

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অভ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ১৯৯২।

সংযোজনী ২

সারণী ১

বছর	গ্রাম ও শহরের লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষিতের হার			
	গ্রাম		শহর	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	২৪.৫	৭.৮	৪৭.৭	২৬.১
১৯৭৪	২৫.৭	১০.৮	৪৫.৩	২৭.৯
১৯৮১	২২.৬	১১.২	৪২.৩	২৫.৫
১৯৯১	২৫.৮	১৬.৩	৪৬.২	৩৩.৩

উৎস : বাংলাদেশ ব্যুরো অভ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ১৯৯২।

সংযোজনী ৩

শিক্ষিতের হার (সাত বছর ও তদূর্ধ্ব) ১৯৯১

জিলা	পুরুষ	মহিলা	জিলা	পুরুষ	মহিলা
বরগুনা	৪৫.১৫	৩৫.০৫	শরীয়তপুর	৩০.৩১	১৮.৪৫
বরিশাল	৪৭.৮৯	৩৭.৯১	শেরপুর	২৪.৬৩	১৪.০৯
ভোলা	২৮.৫৮	১৯	টাঙ্গাইল	৩৬.১৩৩	২২.৪২
ঝালকাঠি	৫৫.৮৭	৪৬.৪৫	বাগেরহাট	৪৯.৫৪	৩৮.৮৬
পটুয়াখালী	৪২.৫৭	৪৫.২৭	চুয়াডাঙ্গা	৩০.৫১	১৯.৫৬
পিরোজপুর	৫২.৮৯	১৩.৪৬	যশোর	৪১.০২	২৫.০৭
বান্দরবান	৩২.১৯	২০.৩২	ঝিনাইদহ	৩২.৩৪	১৮.৯০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩২.৬৬	৩২.৯৯	খুলনা	৫২.১৬	৩৪.৫৬
চাঁদপুর	৪২.৭২	৩৪.৯৯	কুষ্টিয়া	৩০.৮৫	২০.২৮
চট্টগ্রাম	৫০.২৮	২৬.০৩	মাগুরা	৩৫.২৩	২০.৮৬

www.pathagar.com

জিলা	পুরুষ	মহিলা	জিলা	পুরুষ	মহিলা
কুমিল্লা	৪০.২০	১৪.৯০	মেহেরপুর	২৭.৩৬	১৮.৬২
কক্সবাজার	২৮.১৬	৩৩.১৫	নড়াইল	৪২.২৩	২৮.৯৩
ফেনী	৪৮.২১	১৮.৫৪	সাতক্ষীরা	৩৯.৭৩	২১.০০
হবিগঞ্জ	৩০.৪১	১৬.৮৬	দিনাজপুর	৩৭.৭৮	২১.২৭
খাগড়াছড়ি	৩৪.৬৪	২৯.৭৪	গাইবান্ধা	৩১.৬৩	১৬.৯৩
লক্ষ্মীপুর	৩৮.৭৯	২৪.৫৬	জয়পুরহাট	৩৭.৪৭	২২.১৯
মৌলভীবাজার	৩৬.৮৩	৩১.৪৮	কুড়িগ্রাম	২৯.৮৬	১৪.৭০
নোয়াখালী	৪২.৯৫	২৪.৬৮	লালমনির হাট	৩১.৪০	১৫.৬৯
রাঙ্গামাটি	৪৫.৮২	১৬.৭৩	নওগাঁ	৩৫.৯৩	২০.৪৪
সুনামগঞ্জ	২৭.৫৫	২৭.৪৯	নাটোর	৩২.৯৯	২০.৫৫
সিলেট	৩৯.৮৭	৪৫.৯৩	নওয়াবগঞ্জ	২৮.৪৫	১৯.১০
ঢাকা	৬০.১১	২০.৭৫	নীলফামারী	৩৩.১৬	১৬.৯৮
ফরিদপুর	৩৪.৬১	২৯.৩৫	পাবনা	৩১.৭৯	২১.৪৬
গাজীপুর	৪৪.৭৩	৩১.৬৪	পঞ্চগড়	৩৯.৮৩	২০.৭৯
জামালপুর	২৬.৬৪	১৬.০০	রাজশাহী	৩৭.৬৪	২৩.১৬
কিশোরগঞ্জ	২৮.৪৬	১৭.৮৪	রংপুর	৩৩.৫২	১৯.৪০
মাদারীপুর	৩৯.৯৬	২৪.৮৯	সিরাজগঞ্জ	৩৩.৪১	২০.১৭
মানিকগঞ্জ	৩৩.৬৮	২০.০৭	ঠাকুরগাঁও	৩৬.৮	১৭.১৬
মুন্সীগঞ্জ	৪০.২৫	৩১.১৪	বগুড়া	৩৫.৪০	২১.০০
ময়মনসিংহ	৩০.৭০	১৯.৯৫	নারায়ণগঞ্জ	৪৬.২৩	৩২.২৪
নরসিংদী	৩৫.০৩	২৩.৬৬	নেত্রকোনা	৩১.২২	২০.৪৪
রাজবাড়ি	৩২.৭০	১৯.৬৮	গোপালগঞ্জ	৩৪.৭১	২৪.৬৮

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯৭।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

Abramovitz 1956 : M. Abramovitz, 'Resource and Output, Trends in the United States Since 1870' : *American Economic Review.*

Becker 1957 : G. S. Becker, *The Economics of Discrimination* : The University of Chicago Press.

—' 1964 : 'Human Capital' : Colombia University Press.

—' 1981 : *A Treatise on the Family* : Cambridge Mass: Harvard University Press.

Blaug 1965: M. Blaug. *The Rate of Return on Investment in Education in Great Britain;* Manchester School, September.

www.pathagar.com

Cohn 1979: E. Cohn, *The Economics of Education*, Cambridge Mass : Ballingar Pub. Co.

Domar 1947 : E. Domar, 'Expansion and Employment'; *American Economic Review*, March.

Harberger 1983 : A.C. Harberger, 'The Cost-Benefit Approach to development Economics'; *World Development*, Vol. 11, No. 10.

Harnquist 1978: 'Individual Demand for Education'; Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.

Harrod 1948: R. *Harrod Towards a Dynamic Economics;* Macmillan, London.

Lewis 1954: A. Lewis, *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour;* Manchester School, May.

Sen 1984: A. K. Sen, *Resources, Values, and Development*, Basil Blackwell.

Schultz 1984 : T.W. Schultz, 'Investment in Human Capital'; *American Economic Review*, March.

Solow : R. Solow, 'Technical Change and Aggregate Production Function'; *Review of Economic and Statistics;*

www.pathagar.com

নারী শিক্ষায় উন্নয়ন : আমরা কি লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট তৈরি করব?

অজয় রায়

আমি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত বাজেট নিয়ে মাথা ঘামাই না। বাজেট মানে আরও কিছু জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি-প্রবৃদ্ধির নামে অযথা চেঁচামেচি। এই প্রবৃদ্ধিতে যে আমার অবস্থার উন্নতি হয় না, আরও কষ্ট বাড়ে—বিদ্যুৎ না পেলেও বিদ্যুতের দাম বাড়ে, গ্যাসের দাম বাড়ে, বাড়ে যানবাহনের ভাড়া। যারা বাজেট তৈরি করেন তারা উচ্চ স্বরে জানান দেন, এ বাজেট গরিবী তাড়ানোর বাজেট, তবে এটা নিশ্চিত গরিবী হঠানো না গেলেও গরিবকে হঠান যায় অক্লেশে—তাদের বাস্তুভিটা দখল করা যায় উন্নয়নের নামে, খাস জমি থেকে পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী দুর্বল মানুষদের মেরে তাড়িয়ে দেয়া যায় অক্লেশে আদর্শ গ্রাম বসানোর মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এ কারণে বাজেট যেদিন খবরের কাগজের পাতায় আসে ঐ পাতাটা বাদে আর সব খবর পড়ি। কস্মিনকালেও অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা পড়ি না। কিন্তু এবারে ব্যতিক্রম। হঠাৎ করেই 'স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট' নামে একটি সংস্থার পরিচালক অনুরোধ জানালেন তাদের আশু তিনদিনের এক বাজেট সম্পর্কিত সেমিনারে আমি যেন শিক্ষা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ উত্থাপন করি যাতে বাজেট ও মহিলাদের ব্যাপারটা যেন আসে। অনেক চেষ্টা করেও অনুরোধ উপেক্ষা করা গেল না। তারই প্রতিফলন ঘটেছে বর্তমান প্রবন্ধটিতে—আমার কিছু এলোমেলো ও অগোছালো চিন্তার আর কথাগুচ্ছের। কিন্তু ভূমিকা থাক।

কোথা থেকে শুরু করব?

> "কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, ...
> যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
> আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

আমাদের ছোট বেলায় বাংলা রচনায় একটি প্রিয় বিষয় ছিল *স্ত্রীশিক্ষা বা নারী শিক্ষা*। সে সময় আমার আদর্শ মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই আমি হন্যে হয়ে

www.pathagar.com

খুঁজতাম রবীন্দ্র রচনায় কোথায় তিনি নারী শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন। বিবেকানন্দ বা অরবিন্দ আমার অনুপ্রেরণা তখন ছিল না। তবে হ্যাঁ বেগম রোকেয়া সম্পর্কে শুনেছিলাম যে, তিনি বাঙালি নারীদের, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের নারীদের শিক্ষার জন্য নিজের জীবনকে নিবেদন করেছেন। কিন্তু ছোট বয়সে রোকেয়া রচনা সংগ্রহ করতে পারি নি। যা কিছু শুনেছি পিতৃদেবের কাছ থেকে। দিনাজপুরে 'আর্য পাঠাগারে' বেগম রোকেয়ার বই দেখি নি, তবে রবীন্দ্রনাথের অনেক বই ছিল, যা থেকে শিক্ষা বিষয়ক উদ্ধৃতি সংগ্রহ করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি। এর মধ্যে তাঁর স্ত্রীশিক্ষার প্রবন্ধটিও ছিল। এটি বাংলা ১৩২২ সালে ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—আমাদের বাসায় এটি রাখা হত। বাবা আমাকে পুরানো সবুজপত্র থেকে বের করে দিয়েছিলেন। স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সারকথাটি এখানে উল্লেখ করলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীযুক্তা লীলা মিত্র নামে এক ভদ্রমহিলা সে সময় কবিকে নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি পত্র দিয়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল :

"একদল লোক বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।"

শ্রীযুক্তা মিত্র আরও বলেছেন,

"আবার আর-এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষেরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘরসংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।"

প্রায় ৯০ বছর আগে বলা কথাগুলোর তাৎপর্য কিন্তু ফুরিয়ে যায় নি। উপরের দুটি বক্তব্যই কিন্তু পুরুষের প্রয়োজনে, পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হয়েছে—'দুদলই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন'। উপরের বক্তব্যে পুরুষতান্ত্রিকতার যে স্পষ্ট রূপটি ধরা পড়ে আজকে, বিশেষ করে, বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় এই মনোভাবের কি পরিবর্তন ঘটেছে? আমরা 'সুন্দরী ও শিক্ষিতা' সহধর্মিণী সন্ধান করি সমাজে মর্যাদা বাড়ানোর জন্য, তাকে ফুলদানির মত সাজিয়ে রাখার মানসিকতা আজকের পুরুষের মধ্যেও প্রকট। স্ত্রীর স্বতন্ত্র মানব সত্তা সম্পর্কে ভাবি না, তাঁর মেধা ও মননকে কাজে লাগাই না। এর ফলে আমাদের এই সমাজ মেধাবী এক জনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠির বক্তব্য ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি ইতোমধ্যেই শিলাইদহ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম নামের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলা ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ তারিখে (১৯০১, ২২ ডিসেম্বর), কিন্তু তখনও বালিকাদের জন্য ঐ আশ্রমে ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি নানা কারণে, তাছাড়া ছিল সামাজিক অনেক বাধা বিপত্তি যা রবীন্দ্রনাথকেও থামিয়ে দিয়েছিল। তবে প্রথমে আশ্রমনিবাসী পরিবারের গুটিকয়েক কন্যাসন্তান নিয়ে অনেকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছলেই একটি স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয়ের নিউক্লিয়াস পত্তন হয় ১৯০৮ সালে। কিন্তু মূলত প্রশাসনিক জটিলতার কারণে দুবছর পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ ১২ বছর পরে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী পর্বে ১৯২২ সালে মেয়েদের জন্য তিনি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা চালু

www.pathagar.com

করেছিলেন একই বিদ্যায়তনে সহশিক্ষা প্রচলনের মধ্য দিয়ে। মেয়েদের জন্য তৈরি হল আবাসিক ভবন বা বোর্ডিং। শ্রীযুক্তা মিত্রের এই চিঠিটি কবিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল কিনা জানা যায় নি, তবে একথা মনে রাখলে আমাদের ভাবতে সুবিধা হয়—শ্রীযুক্তা মিত্র চিঠিটি লিখেছিলেন বাংলা ১৩২২ সালে আর ১৩২৫ সালে বিশ্বভারতীর কার্যক্রম শুরু হয়।

এচিঠি প্রসঙ্গে কবি লিখেছিলেন, "*এই চিঠির কথাটি আমি মানি।* যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নহে।" রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে দুভাগে ভাগ করেছেন, একটি হল বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অন্যটি ব্যবহারিক। কবির কথায়, '*যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা মানতে দোষ কী*'। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, বিধাতা যে মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন তা যেমন জীবতাত্ত্বিকভাবে সত্য তেমনি মনোগত দিক থেকেও সত্য, আর এটির ফলে, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, 'একটি প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল মাস্টার কিম্বা টেক্সটবুক-কমিটি এক্সারসাইজের খাতা কিংবা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়ে এই শক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না।' তাঁর ভাবনার সার কথা হল মেয়েরা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে যেমন মানুষ হবে, হবে ঠিক তেমনি নারী জাতির যে বৈশিষ্ট্য- তাঁর স্বত-উৎক্ষরিত ভালবাসার ঝরনা, স্বাভাবিক সৌন্দর্যপ্রিয়তা, স্নেহপরায়ণতাকে ... ইত্যাদিকে বিসর্জন দিয়ে নয়, এমন শিক্ষার আয়োজন যেন আমরা না করি যাতে করে পুরুষ-নারীর স্ব স্ব চরিত্র হারিয়ে যায়। তাঁর সার কথা হল, 'আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি বা কান্ট হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর ছাই করিবে না'। তাঁর মত হল, 'মেয়েদের শরীর এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে।' পুরুষতন্ত্র মনে করে 'দাসীত্ব' মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবণতা, তাই যুগে যুগে নারীরা পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করে পুরুষ সমাজের সেবায় নিয়োজিত। রবীন্দ্রনাথ পুরুষের এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছেন," ... যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মাথা তুলিতে পারিত না। ... আসল কথা এই স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। এখানে প্রসঙ্গত বলা ভাল যে, নারীর সৌন্দর্য বলতে কবি তাঁর অন্তরের সৌন্দর্যকে বুঝিয়েছেন, নারীর বহিরঙ্গকে নয়। আর নারী পুরুষ নির্বিশেষে অন্তসৌন্দর্য বিকশিত হয় শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ওপর সবচাইতে জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে উদ্দিষ্ট করে শ্রীমতী লীলা মিত্র তাঁর চিঠিটি শেষ করেছেন এভাবে—যেখানে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর উষ্মা ও বিদ্রোহকে লুকান নি :

www.pathagar.com

"বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে তাদেরকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

... যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্য সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন, তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

... অতএব গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই মাঠে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্ত্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

... কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোক যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথাকে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন। *তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী, সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।* ..."

আমি জানি না রবীন্দ্রনাথ কি এই চিঠি পড়েই পরবর্তীকালে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের নায়িকা 'চিত্রাঙ্গদা' সৃষ্টি করেছিলেন, অথবা চিত্রাঙ্গদা কাব্যই লীলা মিত্রকে প্রণোদিত করেছিল চিত্রাঙ্গদার ভাষায় কবিকে চিঠি লিখতে, যেখানে চিত্রাঙ্গদা, যিনি 'স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ', শ্রীযুক্তা মিত্রের মতই দৃঢ়চিত্তে বলতে পারেন তাঁর পুরুষসঙ্গীকে উদ্দিষ্ট করে—

পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি
কর কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

তবে শেষোক্তটিই সত্যি, কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রাঙ্গদা প্রকাশ করেছিলেন ১৮ই ভাদ্র, ১২৯৯, তারিখে আর শ্রীমতী মিত্র কবিকে লিখেছিলেন ১৩২২ সালে।

আমার মায়ের বেদনার্ত মুখ

আমার ছোট বেলার আর একটি ঘটনার কথা এখনও দিব্যি মনে আছে। তখন ক্লাস সেভেন অথবা এইটে পড়ি, বাংলার মাস্টার মশাই আমাদের 'স্ত্রী-স্বাধীনতা'র ওপর একটি রচনা লিখতে দিয়েছিলেন—হোম টাস্ক হিসেবে। সে সময় মেয়েদের বোঝাতে স্ত্রীজাতি কথাটিই বেশি ব্যবহার করা হত, এখনকার 'নারী বা নারীজাতির' পরিবর্তে। মনে আছে ক্লাসে দাঁড়িয়ে স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম স্যার 'তাহলে কি মেয়েরা বন্দী,

www.pathagar.com

কই আমাদের সহপাঠী মেয়েরা তো বন্দী নয়, বেশ তো আমাদের মতই দিব্যি চলাফেরা করছে—তাদেরকে তো বন্দী বলে মনে হয় না।' স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বিন্দু মাত্র বিরক্ত না হয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, বন্দী সংসারের ও সমাজের কঠিন শেকলে, কঠিন নিয়মে।' তারপর মেয়েদের উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'তোমরা কি স্বাধীন?' আমাদের ক্লাসে ৪-৫টি মেয়ে পড়ত, তারা উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলে উঠেছিল, 'না স্যার আমরা স্বাধীন নই। আমরা ছেলেদের মত যা ইচ্ছে করতে পারি না, যেখানে খুশি যেতে পারি না। মা বাবা সবসময় আমাদের ওপর খবরদারি করেন; এমনকি স্কুলেও আমাদের নানা বিধি-নিষেধের মধ্যে থাকতে হয়। এখানেও আমরা ছেলেদের মত মুক্ত নই।' ক্লাস শেষে স্যার আমাকে ডেকে একান্তে বললেন, মেয়েরা স্বাধীন কিনা তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো। সে সময় মা'ই আমার কাছে ছিলেন জ্ঞানদাত্রী। সেদিন সন্ধ্যেবেলা মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মা স্ত্রী-স্বাধীনতা কী?" 'হঠাৎ প্রশ্ন কেন? জবাবে বলেছিলাম, "না, স্যার স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে একটি রচনা লিখতে বলেছিলেন তাই।" "ও তাই বল, ও তুই নিজে যা বুঝিস লিখে নিয়ে যাস।" মা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন, হয়তো বা আমার বয়স বিবেচনা করে। আমি মাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, এবার সরাসরি—"মা, সত্যি করে বল তুমি কি বন্দী?" মা মলিন হেসে বললেন, "বড় হ' তখন বুঝবি, মেয়েদের কত জ্বালা।" তারপর অপার স্নেহে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, "না বাবা, আমি স্বাধীন নই, আমার ইচ্ছেতে কোন কাজ হয় না। আমরা মেয়েরা, সংসারের জালে বন্দী। তোর বাবার মত'ই সবাইকে মেনে চলতে হয়। বোধ হয় এটিই সংসার আর সমাজের নিয়ম, আর বিধির অমোঘ বিধান।"

স্বল্প শিক্ষিতা আমার মায়ের সেই বেদনার্ত সজল চোখের মুখটি আমি ভুলিনি। ঐ অল্প বয়সেই আমার বোধোদয় হয়েছিল মা'র অন্তরে সংসার ও সমাজের বিরুদ্ধে অকথিত কী বিপুল জ্বালা, অথচ বাইরে তার প্রকাশ নেই, সব সয়ে সংসারের রথটিকে হাসিমুখে টেনে চলেছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতীক বিশ্বের যে কোন দেশের পুরুষ জাতি আমাদের মায়েদের ও মেয়েদের এই অন্তর্জ্বালা। আজও বুঝতে অক্ষম। নইলে আজকে বাজেটে নারীর অধিকার ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা সভার প্রয়োজন ছিল না। আমার মা ও রবীন্দ্রনাথের কাল আমরা অনেক কাল পেরিয়ে এলেও, নারীদের অধিকার সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা সে যুগের সমাজের চিন্তাচেতনাকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারি নি। একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও আমাদের বিশ্বের নারীদের সাথে বাংলাদেশের নারীসমাজকে নারীমুক্তির আন্দোলন করতে হয়, বিশ্বকে তৈরী করতে হয় ইউএনও প্রণোদিত মানবাধিকার চার্টার, যেখানে নারী অধিকার সংরক্ষণ লিপিবদ্ধ, ঘোষণা করতে হয় 'সিডও' (CEDAW) সনদ, আর সাম্প্রতিক কালে বহুল কথিত ও প্রচারিত এমডিজি'র (MDG) উদ্ভাবন—যাকে অভিহিত করা হচ্ছে 'নারী মুক্তির সনদ' হিসেবে। কিন্তু এত করেও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে নারী-পুরুষ নিরপেক্ষ একটি সমসমাজ কাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশ্ব মানবজাতি পৃথিবীর কোথাও প্রতিষ্ঠা করতে পারল না আজও। এ লজ্জা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানবজাতির।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালেও একশ্রেণীর নারীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন বিদ্রোহী আত্মা, সেই বিদ্রোহ ক্রমে কালের পথ বেয়ে রূপ নিয়েছে নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি, নারী অধিকার আন্দোলন নামে বিশ্বের সর্বত্র। পাশ্চাত্য বিশ্বে এর পরিচিতি পেয়েছে 'ফেমিনিজম বা নারীবাদী' নামে। আমাদের দেশও পিছিয়ে ছিল না-আমাদের নারী সমাজের পথিকৃৎ এবং আলোকবর্তিকা হিসেবে নারীসমাজের মুক্তির লক্ষ্যে, বেগম রোকেয়া, লীলা রায়, ইলা মিত্র, পদ্মজা নাইডু, বেগম সুফিয়া কামাল, মহাশ্বেতা দেবী, ফুলরেনু গুহ, বেগম শামসুন্নাহার, সুহাসিনী দেবী, রাশিমণি হাজং, মনোরমা বসু ... প্রমুখ বেরিয়ে এসেছিলেন পরিবারের গণ্ডী পেরিয়ে, তবে পরিবারকে ভেঙে নয়—পুরুষরা যা নিয়ে অভিযোগ করেন সতত। সেই পথ ধরেই বাংলাদেশের স্ত্রীজাতি আজও আন্দোলন করছেন বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের মধ্য দিয়ে এবং ব্যক্তি পর্যায়েও। এর ফলে নারী সমাজ এগিয়েছে অনেক, সচেতন হয়েছে নিজেদের অধিকার ও সমাজে অবস্থান নিয়ে। তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে—পাশ্চাত্য দেশে এবং আমাদের দেশেও, ক্ষুদ্র হলেও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, একটি প্রভাবশালী ভোগবাদী গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছে সদর্পে যারা নারীকে শুধু পুরানো চিন্তাশ্রয়ী দাসী করেই রাখতে চায় না, নারীকে তারা পণ্যে পরিণত করেছে, পরিণত করতে চায় বিলাসের সামগ্রী হিসেবে। এই নব আবির্ভূত গোষ্ঠীটি কেবল নারীকে নয়, সেবাদায়ী নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বাণিজ্যকরণ ও বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করতে চায়। এর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, ... ইত্যাদি পণ্যে পরিণত হয়েছে। এখন অর্থ যার শিক্ষা *তার, অর্থ যার চিকিৎসা তার*—এই নীতিতেই দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। অনেকদিন আগে তথাকথিত মুক্তবিশ্বে যখন মুক্তবাজারভিত্তিক অর্থনীতি চালু হল, অধ্যাপক গলবেইথ তাঁর একটি পুস্তকে ক্ষুব্ধ হয়ে এই নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, এর ফলে আমেরিকার সমগ্র সম্পদ ও অর্থ কতিপয় গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হবে, শুধু দরিদ্ররা দরিদ্রতর হবে না, মাঝারি ধনিক শ্রেণীও বিপদাপন্ন হবে। এখন মনে হয়, কী চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন। বাংলাদেশ এর একটি চমৎকার উদাহরণ।

আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। নারীমুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বে এবং আমাদের দেশের নারী নেতৃত্ব এবং মহিলা সংগঠনগুলো কী সব প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে দেশজ ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং স্ব স্ব দেশের রাষ্ট্র ও সরকারকে কার্যকর প্রস্তাব নিতে বলা হয়েছে। সেগুলোর চুম্বক সুপারিশগুলো একটু দেখে নেয়া যাক। এই সুপারিশ ও প্রস্তাবগুলো সুধীসমাজ সম্যক অবগত আছেন। তবুও সম্পূর্ণতার তাগিতে পুনরুল্লেখ দোষণীয় হবে না হয়তো।

১. 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'

প্রথমেই আমাদের নারীসমাজের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবগুলো আলোচনায় আনা যাক। কয়েক বছর আগে নারীসমাজের দাবিতেও সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

নারীর সার্বিক মুক্তি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি ১৪ দফা সনদ রচনা করে এবং বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করে। এটি প্রণয়নের পশ্চাতে অবশ্য সিডঅ সনদ ও বেইজিং ঘোষণার অনুপ্রেরণা ছিল। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ গৃহীত এই প্রস্তাবগুলো 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' নামে পরিচিত। এই ঘোষণাকে দেশের সচেতন নারীসমাজ ও নারী নেতৃত্বের কাছে একটি ঐতিহাসিক দলিল ও নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার 'ম্যাগনা কার্টা' বা মুক্তির দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর বিশেষ কয়েকটি দিক হল :

এই দলিলটির অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে :

- জাতীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা।
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা।
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসন
- ইত্যাদি ...

এই নীতিমালার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা উল্লেখ করছি :

১. নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন
২. মেয়েশিশুর প্রতি সকলপ্রকার বৈষম্যের বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।
৩. নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ।
৪. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান।
৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।
৬. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
৭. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ।
৭.১ নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ।
৭.২ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন।
৭.৩ নারীর কর্মসংস্থান।
৭.৪ সহায়ক সেবা।
৭.৫ নারী ও প্রযুক্তি।
৭.৬ নারীর খাদ্য নিরাপত্তা।
৮. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।
৯. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন।

www.pathagar.com

১০. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি।
১১. গৃহায়ন ও আশ্রয়।
১২. নারী ও পরিবেশ।
১৩. নারী ও গণমাধ্যম।
১৪. বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী

এর মধ্যে ১, ২, ৩, ৫, ৭-৯ ধারাগুলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যা বাস্তবায়ন হলে আমাদের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত নারী-পুরুষ সমসমাজ গড়ে ওঠাতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন আগে বর্তমান সরকার ৭, ৮, ৯ ও ১২ নং ধারায় হঠাৎ করে সংশোধন আনে যাতে সনদটির মূল আত্মাকে হত্যা করা হয়েছে। এর ফলে নারীরা সম্পত্তি, ভূমি ও উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরও সীমিত করে তুলতে পারে। তাছাড়া প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়ার দাবিকে নস্যাৎ করা হয়েছে।

এই নীতিমালার ৫-ধারায় (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে বলা হচ্ছে : নারীর শিক্ষাবৃদ্ধির জন্যে বর্তমানে বিদ্যমান শিক্ষার হারে ও সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতায় যে বৈষম্য তা দূর করতে সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে পরিকল্পনা গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা। বলা হয়েছে আগামী ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া, বিশেষত মেয়ে শিশু ও নারীসমাজের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া। বলা হয়েছে—শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়ে শিশুর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ... সকল পর্যায়ে অসমতা দূর করা, শিক্ষাকে সার্বজনীন করা ... মেয়ে শিশুদের স্কুলে ধরে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ। কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যাসহ উচ্চাশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

২. 'জাতীয় বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে নারীসমাজের দাবি'

আমাদের নারী সংক্রান্ত বাজেট আলোচনার প্রাসিঙ্গকতায় বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো কয়েক বছর ধরে যে দাবিগুলো করে আসছে তার একটি প্রতীকী আলোচনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। গত ২ জুন, ২০০২ সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 'জাতীয় বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে নারীসমাজের দাবি' শীর্ষক একটি সেমিনার হয়। উক্ত আলোচনাসভায় 'জাতীয় বাজেটে নারীসমাজের হিস্যা ও প্রাপ্তি' নামে একটি প্রবন্ধ পরিবেশন করেন ড. প্রতিমা পাল। অর্থনীতিবিদ ও মহিলা নেতৃবৃন্দসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এই সভা থেকে কতিপয় প্রস্তাব উঠে আসে যা প্রণিধানযোগ্য। এর কয়েকটি দিক এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—

- *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা* এবং জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের সঠিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

- আগামী অর্থবছরে বাজেটে নারীর জন্যে সরাসরি উন্নয়ন বরাদ্দ বর্তমান ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৭ শতাংশ করতে হবে। এই বৃদ্ধি হবে নারীর জন্যে প্রণীত প্রকল্পের সংখ্যা, সম্পদ বরাদ্দের পরিমাণ এবং প্রকল্প প্রকৃতির নিরিখে।
- নেতিবাচক অনুৎপাদনশীল ব্যয়বহুল খাত থেকে ব্যয় কমিয়ে তা নারীর ক্ষমতায়ন এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।
- বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি বিকেন্দ্রীকরণ করে, স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন সেক্টরের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতসহ নারীর প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
- *প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি মিডটার্ম আলোচনার সুযোগ থাকা দরকার,* যাতে পরিকল্পনাটি আরও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। (সরকার এ ধরনের উদ্যোগ ইতোমধ্যেই নিয়েছেন)
- লিগ্যাল এইড দেবার জন্য সরকারি তহবিল থাকা উচিৎ।
- এছাড়া আরও অনেক সুপারিশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, নারীর গতিশীলতা বৃদ্ধি, দুস্থ নারীদের গৃহায়ন ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যা আমার কাছে খুব সঙ্গত বলে মনে হয় : বাজেট করার আগে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য চাইতে হবে তাদের প্রস্তাবিত বাজেটে নারীর জন্য কতটুকু বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা দেখবার জন্য; ... রেভেনিউ বাজেটে নারীর হিস্যা সামান্য। সরকারি বিভিন্ন পদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে; বাজেটে নারী রিক্রুট বন্ধ করা যাবে না। বাজেটের খরচের ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পগুলোর ওপর পাবলিক তদারকি করা প্রয়োজন।

৩. সিডঅ (CEDAW : Conference for Elimination of all forms of Discrimination Against Women)

আমরা সিডঅ'র পরিবেশিত নারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যমান বৈষম্য নিয়ে আলোচনায় না গিয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণে সিডঅ'র প্রস্তাবগুলো দেখি। সনদের ১০ নং আর্টিকেলে', 'Equal rights in Education'-এ বলা হয়েছে—

> "Governments will act to eliminate discrimination against women in education. This includes giving women equal access to education and vocational guidance, the same curriculum, examinations, standards for teaching and equipment, and equal access to scholarships and grants."

www.pathagar.com

সিডও'র এই অঙ্গীকার আমাদের সংবিধানে শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের বৈষম্যহীন সমান অধিকার সম্পর্কিত আমাদের সংবিধানের আর্টিকেলগুলো (১৭. ক, খ, গ) এবং মানবাধিকার রক্ষায় আর্টিকেলগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধান নিশ্চয়তা প্রদান করেছে যে, কেবল ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ ও শ্রেণীর ভিত্তিতে কোন রকম বৈষম্য করা চলবে না। বাংলাদেশ সিডও'র ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে লিঙ্গবৈষম্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং নিচ্ছে। এর ফলে প্রাথমিক স্তরে এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ৫০%' এ উন্নীত হলেও, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে আমরা এখনও দূরে। মধ্যপথে পড়া ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা (dropouts) ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি, উঁচু স্তরে এই ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধিমান। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া ছাত্রীর সংখ্যা তাৎপর্যময়ভাবে অনেক কম। কারিগরি, কৃষি ও প্রকৌশলবিদ্যালয় ছাত্রী ভর্তি হার বেশ কম, মোটামুটি ৯-১০%। উচ্চ স্তরে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১৪%। এই চ্যালেঞ্জগুলো সাফল্যের সাথে মোকাবেলা না করতে পারলে এই শতাব্দীতে বাংলাদেশের নারীরা আন্তর্জাতিক স্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় অনেক পিছিয়ে পড়বে। ইতোমধ্যেকার বিদ্যমান জ্ঞানের ফারাক উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে।

৪. হাজার বছরের অভিলক্ষ্য ও বাংলাদেশ : (Millenium Development Goal)

একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় 'হাজার-বছর উন্নয়ন অভিলক্ষ্য' বা এমডিজি (MDG : Millenim Devopment Goal)। নিম্নলিখিত ৮টি অভিলক্ষ্য দফায় দফায় বাস্তবায়নের জন্যে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয়। বিশ্ব থেকে যতদূর সম্ভব দ্রুত দারিদ্র্য-ক্ষুধা, লিঙ্গ-বৈষম্য নির্মূল করে সকল বিশ্ববাসীকে শিক্ষিত করে তুলে বিশ্বকে নির্মল রোগমুক্ত পরিবেশ উপহার দেয়া যাতে অচিরেই সম্ভব হয়। অভিলক্ষ্যগুলো সংক্ষেপে হচ্ছে :

1. Eradicate extreme poverty and hunger
2. Achieve universal primary education
3. Promote gender equality and empowerment
4. Reduce child mortality
5. Improve maternal health
6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
7. Ensure environmental sustainability
8. Make global partnership for development

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জন্য *আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে* যেসব লক্ষ্যবস্তু অর্জন করতে হবে তা হল : দৈনিক ১ ডলারের কম আয়কারী জনগণের সংখ্যাকে ও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাকে অন্তত ৫০% এ নামিয়ে আনতে হবে। (অভিলক্ষ্য ১); সকল ছেলে-মেয়েকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। (অভিলক্ষ্য ২); প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বিদ্যমান নারী-পুরুষের বৈষম্য অপনয়ন করতে হবে; শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান; শিশু অপুষ্টির লিঙ্গ-বৈষম্যের নির্মূলকরণ। মাতৃমৃত্যুর হার শতকরা ৭৫ ভাগ কমিয়ে আনা; সকলের জন্য প্রসবকালীন-স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া নিশ্চিতকরণ; দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে চালিত দাঙ্গা-সংঘর্ষ (violance) পুরোপুরিভাবে নির্মূল করতে না পারলেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহতকরণ। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এমডিজি কিছু নির্দেশক সূচকও নির্ধারণ করে দিয়েছে।

তৃতীয় অভিলক্ষ্যটি (নারী-পুরুষ সমতা ত্বরান্বিতকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন), বাংলাদেশের জন্য অতীব জরুরি; লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক ধাপ হল—'২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে উচ্চতর স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য অপনয়ন।' বাংলাদেশ অবশ্য ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে এই বৈষম্য অপনয়নে স্বস্তিকর সফলতা অর্জন করলেও শিক্ষায়তন থেকে 'ঝরে পড়ার হারে' ছাত্রীরা এখনও এগিয়ে। আমরা কেবল শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ওপরই আলোচনা সীমিত রাখলাম।

৫. দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper : PRSP)

বহুল আলোচিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র সম্পর্কে দু'চার কথা না বলা বোধ হয় উচিত হবে না, যদিও এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর সাথে সুধীসমাজ সম্যক অবগত। কৌশলপত্রটির রচয়িতার শুরুই করেছিলেন এই বলে যে, 'বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক পলিসির প্রধান অভিলক্ষ্য হচ্ছে. *দারিদ্র্যকে ক্রমশ কমিয়ে এনে বিপুল সংখ্যক জনগণকে দারিদ্র্যরেখার ওপরে টেনে তোলা এবং গড় নাগরিকের জীবনের গুণগত মানের (quality of life) উন্নয়ন ঘটানো।* এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পত্রটি প্রণীত হয়েছে কী ধরনের কৌশল প্রযুক্ত হলে উল্লিখিত অভিলক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বাংলাদেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এবং স্বীকার করা হয়েছে এই কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি দুরূহ কাজ। কৌশলপত্রটির 'দূরদৃষ্ট স্বপ্নের'(vision) শিরোনাম হল "*সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন*" (Unlocking the potential)। দারিদ্র্যকে একটি বড় ক্যানভাসে ফেলে বিবেচনা করা হয়েছে কেবল আয়ের পরিমাণ দিয়ে নয়। এই বড় সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'খাদ্যের নিশ্চয়তা', 'জীবনের গুণগত মান', 'সম্পদের ন্যূনস্তর', 'মানব সম্পদের দক্ষতা', 'ভঙ্গুর প্রবণতা ও প্রতিহত-ক্ষমতা' (vulnerability and coping), 'লিঙ্গবৈষম্য', 'জনগণের

www.pathagar.com

নিরাপত্তা'। এক কথায়, আমাদের সামাজিক ও আর্থিক জীবনের সকল দুর্বলতাকে এই 'দারিদ্র্যের' আওতায় আনা হয়েছে। আমি জানি না এর ফলে কৌশলপত্রটি কেন্দ্রতিগ না হয়ে ব্যাপন-প্রবণ না হয়ে পড়ে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এর খসড়াটি প্রকাশিত হলেও নানা স্তরে আলোচিত হওয়ার পর এটি গৃহীত হয় সম্ভবত ২০০৫ সালের প্রথম দিকে। এই পটভূমিতে কৌশলপত্রটি ৯টি মধ্যপদী বিষয়কে চিহ্নিত করেছে দারিদ্র্যের দ্রুত হ্রাসকরণের লক্ষ্যে। এছাড়া এমডিজি'র অভিলক্ষ্যগুলোও এর মধ্যে স্থান পায়। বস্তুত এমডিজি'র প্রস্তাবনাগুলোকে হুবহু নকল করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য মধ্যপনী প্রকল্প ধারণার (midterm concept for plan) অবতারণা করা হয়। পিআরএস-এর জন্য একটি কাঠামোও রচিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নব্বই'র দশকের প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সরকার এম. ডিজি'র টার্গেটসমূহ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করার ফলে অনেক সেক্টরে দৃশ্যমান সাফল্য পায়—ইউ, এন, ডি, পি'র সাথে অভিন্ন। এই লক্ষ্যসমূহ স্থির করা প্রসঙ্গে কৌশলপত্রটি আর একবার স্মরণ করেছে এর আসল উদ্দেশ্যের কথা। কথাগুলো বেশ মহৎ এবং শুনতেও ভাল লাগে। আর একবার শোনা যাক না, "with the constitutional obligations of developing and sustaining a society in which the basic needs of all people are met and every person can prosper in freedom and cherish the ideals and values of a free society, the vision of Bangladesh's poverty reduction strategy is to *substantially* reduce poverty *within next generation*"। এর জন্য এটি গুরুত্ব দিয়েছে দারিদ্য হ্রাসকরণের (কেন্দ্রীভূত হবে ক্ষুধা এবং দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্য'র ওপর) এবং সামাজিক উন্নয়নের ওপর (বিশেষ করে জোর দেয়া হবে লিঙ্গ সমতার ওপর)। এমডিজির অর্জনসমূহের হিসাবে নিকাশ করার বাংলাদেশ সরকার 'ধারণযোগ্য মানব উন্নয়ন মডেলিং সিসটেম' (sustainable human development system) উদ্ভাবন করেছে বলে পত্রটিতে বলা হয়েছে।

শিক্ষা সম্পর্কে, যা আজকের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক, মন্তব্য করা হয়েছে যে, এর লক্ষ্য হল শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন। এর জন্য অনেক সুপারিশের মধ্যে কয়েকটি হল—যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত বাড়ানো, কার্যকর পর্যবেক্ষণ প্রথার ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন, কারিক্যুলামের উন্নয়ন, গ্রাম-শহরের বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি ...। শিক্ষাকে অধিকতর কর্মসংস্থানমুখী করতে, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। এসব ভাল কথা, শিক্ষার ওপর যে কোন সেমিনারে, শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণে, শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনসমূহে শুনতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আরও বিশদ কথা বলা হয়েছে ৪র্থ অধ্যায়ের 'মানব উন্নয়ন' শিরোনামের অধীনে।

আমি এই পত্রটি সম্পর্কে অনেক কথা বলে ফেলেছি—তবে এ প্রসঙ্গ শেষ করব অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে। অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান ২০০৫-৬ বাজেট বক্তৃতায় এমডিজি সম্পর্কে বলেছিলেন, "২০০০ সালে ডিসেম্বর মাসে

www.pathagar.com

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে "United Nations Millenium Declaration" (জাতসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা) গৃহীত হয়। নির্ধারিত হয় উন্নয়নশীল দেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের "Millenium Development Goals"। ... আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনীমূলক 'Millenium Declaration'-এর উন্নয়ন আদর্শকে সমর্থন জানিয়েছে।" তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এর আলোকেই সরকার প্রণয়ন করেছিল ৩ বছর মেয়াদী অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন পরিকল্পনা (I-PRS)। মন্ত্রী গর্বের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, "এই পরিকল্পনার ভিত্তি জাতীয়তাবাদ.."। মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, 'আপনার জাতীয়তাবাদের উৎস কী *বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ* যার মূলে রয়েছে উগ্র মুসলিমবাদী চেতনা, আর যে কারণেই আপনারা সগর্বে উচ্চারণ করেন বাংলাদেশ হল একটি 'Muslim moderate state' যেখানে নারীরা থাকবে অবগুণ্ঠাচ্ছাদিত আর, যেখানে অমুসলমান মানবগোষ্ঠীর স্থান হবে পবিত্র আলামত হিসেবে।' পি,আর, পি সম্পর্কে বলেছেন 'দারিদ্রের ধরন অনেক ব্যাপক ও বহুমুখী। তাই খসড়ায় আমরা বলেছি, "Poverty is a broad tront ..."। একথাগুলো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

এবারের বাজেট বক্তৃতায় মন্ত্রী পুনরায় 'পি. আর. এস. পি' প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, " ... We have already finalised a full-blown poverty reduction strategy titled National Strategy for Accelerated Poverty Reduction—Unlocking the potential. This strategy is now the basis of our development plan." এমডিজি'র লক্ষ্য বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তার মন্তব্য " ... that we have achieved two targets of MGD by ensuring access to safe drinking water and by removing gender disparity in primary and secondary education. Enrollment for 97% of our children has been assured."। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রসঙ্গে তাঁর গর্বিত উচ্চারণ " ... the Government has taken steps to introduce Medium Term Budget Framework, replacing the traditional budget system. Through this new budget framework, the poverty reduction strategy is being implemented. We have so far brought within the fold of MTBF 10 ministries and divisions including ministries of education, health and agriculture."। মহিলাদের জাতিগঠন প্রক্রিয়ার ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, "In my budget speech for FY 1991-2, I said, 'The progress of the society is bound to be hindred if half of the population remains neglected and deprived of the benefits of development. Therefore, the womenfolk should be increasingly

www.pathagar.com

involved into the mainstream of development.' We continued our eforts towards this end through gender budget. Steps are being taken to ensure women empowement in the development projects and programmes of different ministries and divisions." ।

এ কেবল আশারই কথা গত ১০০ বছর থেকে আমরা, আমাদের প্রপিতামহীরা, পিতামহীরা, আমাদের মায়েরা, এবং এখন কন্যা-নাতনীরা শুনেই আসছেন। কিন্তু কবে আসবে সেই দিন "যার লাগি আমি কান পেতে আছি .."। আমার আশঙ্কা একটি বিপুলভাবে সমাজ পরিবর্তন ছাড়া গতানুগতিক পন্থায় আমার কাঙ্ক্ষিত নারী-পুরুষসহ সকল মানুষের জন্য একটি সাম্যবাদী সমাজ গড়া সম্ভব?

৬. ইউএন মানবাধিকার সনদ ও আমাদের সংবিধানে মানবাধিকার ও নারীপুরুষের সমতার নিশ্চয়তাকরণ

আমাদের সংবিধানের ১১নং ধারায় মৌলিক মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা দান করেছে, ১৭-১৯ নং ধারায় সকলকে সার্বজনীন প্রাথমিক (বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক) শিক্ষাদান, পুষ্টি, এবং রাষ্ট্রেও সকল সুবিধা ও সেবা ধর্ম-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে ভোগ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ২৬-২৯ নং ধারাগুলোতে পুরুষ-নারীসহ সকল শ্রেণীর নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। বস্তুত ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার ও নারীর অধিকার বিষয়ক সনদেও সার কথাগুলো সংবিধানে স্থান পেয়েছে।

বিশ্বের সকল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা,নারীকে সমাজে যথাযোগ্য মর্যদায় প্রতিষ্ঠা ও নারীর মেধা ও কুশলতার ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনের লক্ষ্যে উল্লিখিত সনদগুলো বিশ্বনারীকে সাহস যুগিয়েছে এবং সনদসমূহে ঘোষিত অভিলক্ষ্যকে দ্রুত অর্জনে নারী আন্দোলন বেগবান হয়েছে। বাংলাদেশের নারীরাও এই আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। এসব সনদ ঘোষিত নীতিমালাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যতম উপায় হল রাষ্ট্রীয় বাজেটকে যথাসম্ভব 'লিঙ্গ সংবেদনশীল' হিসেবে উপস্থাপন করা। দাবি উঠেছে নীতি নির্ধারকদের কাছে, বাজেট প্রণেতাদের কাছে এমডিজির সুনির্দিষ্ট নীতিসমূহকে সামনে রেখে জেন্ডার-প্রেক্ষিত বাজেট রচনা করার।

লিঙ্গ-প্রেক্ষিত বা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের সংজ্ঞা (Gender Perspective or Gender Sensitive budget)

অনিবার্যভাবে প্রশ্ন আসবে *লিঙ্গ-প্রেক্ষিত* বাজেট বলতে আমরা কী বুঝব। লিঙ্গ-প্রেক্ষিত ও অপ্রেক্ষিত সাধারণ বাজেটের মধ্যে প্রার্থক্য কোথায় এবং কী? সমাজবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদদের কথা পাশে রেখে এই পরিভাষা শব্দটি আমাদের মত অজ্ঞ মানুষের কোন ধরনের বার্তা পাঠাতে চায় এই শব্দটির উদ্বাবক ও প্রয়োগকর্তারা এবং নীতিনির্ধারকরা। আমি বিষয়টিকে নিজের দৃষ্টিতে এভাবে বুঝতে চাই। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আপাতদৃষ্টিতে একটি সুষম (racially homogeneous) জনের একভাষী দেশ। রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার এই জনগণের কল্যাণসাধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে তার নীতিমালা, কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, এবং জনকল্যাণে বাস্তবায়ন করবে। অপারগ হলে, পরিকল্পনা-কর্মসূচি উন্নত করবেন, জনগণের কাছে ভুল স্বীকার করবেন, অথবা রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন। রাষ্ট্র সকল নাগরিকের, সকল শ্রেণীর মানুষের উপকারের লক্ষ্যে কাজ করবে যাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের সকল অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে। কারণ সংবিধানের চোখে, আইনের চোখে সকল মানুষ সমান ও সমান সুবিধা ভোগের অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতির যদি অপপ্রয়োগ ঘটে, অথবা সরকার ভ্রান্তনীতিতে পরিচালিত হয়ে ভ্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, অথবা সরকারের অক্ষমতার কারণে যদি দেখা দেয় যে, জনগণের একটি বিশাল অথবা ক্ষুদ্র অংশ বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হচ্ছে না, দিনের পর দিন তারা পিছু হঠছে—তাহলে কী করণীয়। যে জনগোষ্ঠীটি ক্রমশ পশ্চাতে চলে যাচ্ছে, অথবা তথাকথিত জিডিপি বাড়লেও ঐ জনগোষ্ঠীর দেহে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে না। তাহলে কী রাষ্ট্রব্যবস্থার উচিৎ কর্তব্য হবে না এই পিছিয়ে থাকা এক বা একাধিক জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে, তাদের উন্নয়নের জোয়ারের সাথে মিলিত করা। এই হতদরিদ্র মানুষদের দরিদ্র সীমারেখার ওপরে তোলার জন্য, তাদের সন্তান সন্ততিকে শিক্ষার আলোক দেখানোর জন্য, রোগ-শোকে তাদের কাছে চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দেবার জন্য রাষ্ট্রকে যদি বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়—তাহলে সরকার গৃহীত এসব প্রকল্প-পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডকে কী এসব এক বা একাধিক জনগোষ্ঠী সংবেদনশীল বা 'পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী অনুগামী' প্রকল্প বলতে পারি না।

আমাদের সাধারণ জন সুষম হলেও, আমাদের মাঝে আছে ধনী-দরিদ্র-অতিদরিদ্রের ভেদ, নারী-পুরুষের সীমাহীন বৈষম্য নানা ক্ষেত্রে—আর এই নারী সমাজ আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক। আর আছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নানা বর্ণাঢ্যের মানুষ, তাদের সংখ্যা যত কমই হোক। বিপুল সংখ্যক নারী যেমন নানাভাবে পিছিয়ে আছে, নিজেদের বঞ্চিত ও নিপীড়িত মনে করে, তেমনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলোও নিজেদের বঞ্চিত, অসহায় ও অত্যাচারিত মনে করে। অধিকারবঞ্চিত নারী যেমন তার অধিকার আদায়ে সোচ্চার হচ্ছে নানা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেটকে নারী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ও ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার-প্রেক্ষিত করতে চায়, ঠিক তেমনি অন্যান্য বঞ্চিত মানুষ নিজ অধিকার রক্ষার ও উন্নয়নের সহযোগী হবার লক্ষ্যে সোচ্চার হচ্ছে। সুতরাং বাজেটসহ রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডে যেন সবার জন্য উন্নয়ন এই নীতির প্রতিফলন ঘটে রাষ্ট্রের উচিত সে ধরনের কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ। আমার মোদ্দা কথা হল নারী অথবা পুরুষ, আদিবাসী অথবা সাধারণ বাঙালি, উন্নত অঞ্চল অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া ও এগিয়ে যাওয়া—এসব সংশ্লিষ্ট সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখে একটি একীভূত জাতীয় পলিসির প্রণয়ন প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই লিঙ্গ-বৈষম্য উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হতে পারে। অর্থমন্ত্রী অবশ্য তাঁর নেতৃত্বে

www.pathagar.com

প্রণীত 'দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল পত্রটিকে' আমাদেরও নারী সমাজসহ সকল দরিদ্র মানুষের মুক্তি সনদ মনে করে আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন। আমার এ বিষয়ে বক্তব্য রাখার যোগ্যতা না থাকলেও এই কৌশলপত্র সম্পর্কে রিজার্ভেশন রয়েছে; এটি একটি আমলাতান্ত্রিক প্রাণহীন দলিল। আমি সুধীজনকে ভেবে দেখতে বলি।

আমাদের অর্ধজনসম্পদকে অবশ্যই উন্নয়ন শরিক করতে হবে, নইলে এই উন্নয়ন হবে ধোঁকার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে গেলেও। অমর্ত্যসেন বলেছেন, আমরা যদি সংখ্যালঘু মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে সম্পৃক্ত না করতে পারি তাহলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ দেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না, ফলে আমাদের সম্পদ একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে ক্রমশ জমা হচ্ছে।

আমরা যদি নীতি হিসেবে গ্রহণ করি যে, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নারীসমাজকে পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতে চাই, যাতে রাষ্ট্র সমাজের সকল ব্যবস্থাপনায় সে সম অংশীদারিত্বের যোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে প্রতি বছরের বাজেটে এই নীতি বাস্তবায়নের প্রতিফলন ঘটাতে হবে অতি অবশ্যই। এই সময় সীমা নীতিনির্ধারকরা একটি বিশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রেক্ষিতে স্থির করবেন, যাদের তারা উপকার করতে চান তাদের সাথে নিবিড় আলোচনা চালিয়ে। ইতোমধ্যেই উল্লিখিত নারীসমাজের পক্ষ থেকে যেসব দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সুপারিশ, এমডিজিসহ, এসেছে তার আলোকে সরকারকে এটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, নির্দিষ্ট সময়সীমা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রেখে। এই পরিকল্পনা কর্মসূচি জাতীয় চরিত্রের এবং পার্লামেন্টের মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণীত হওয়া উচিত সকল রাজনৈতিক নেতৃত্বের ও সুশীল সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এত কথা বলা হল এই কারণে যে, পরবর্তী নতুন ক্ষমতাসীন সরকার যেন এটিকে সস্তা কাগজ মনে করে ঝুড়িতে নিক্ষেপ না করে। এই পরিকল্পনাকে মনে করতে হবে নারী জাতির স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে, বিবেচনা করতে হবে নারী জাতির ক্ষমতায়নের 'ম্যাগনা কার্টা' রূপে।

এবারের ২০০৬-০৭ সালে প্রস্তাবিত বাজেট কী লিঙ্গ সংবেদনশীল?

প্রথমেই বলে রাখি, অর্থমন্ত্রী যতই দাবি করুন আমার কাছে প্রস্তাবিত বাজেটকে মনে হয়নি লিঙ্গ-সংবেদন বলে, দরিদ্র সংবেদনশীল তো নয়ই। প্রশ্ন উঠতেই পারে—প্রস্তাবিত বাজেটে কী নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কোন বিশেষ অনুক্রমিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যার ফলে নারী সমাজের কাছে মনে হতে পারে যে, এভাবে অগ্রসর হলে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটতে এত বছর লাগতে পারে? বা এত বছর পর নারী জাতি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের অতিক্রম না করে গেলেও প্রায় কাছাকাছি আসতে পারবে—অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি নারীরা প্রশাসনে, মন্ত্রী পরিষদে, সংসদে, বিচারালয়ে,

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০% ভাগ না হলেও ৪০% আসন দখল করবে যোগ্যতার বলে (কোটা বা সংরক্ষণের হিস্যা থেকে নয়)। হ্যাঁ, নারীশিক্ষার অগ্রযাত্রায়, স্বাস্থ্যসেবায়, মাতৃত্ব মৃত্যুরোধে, দারিদ্র্য নিরসনে অনেক ভাল ভাল কথা আছে, বিভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দের অঙ্গীকার আছে। কিন্তু যেটি নেই, তা হল নারী অধিকার, নারীর জাতীয় জীবনে সম অংশীদারিত্বের, রাষ্ট্রের পলিসি নির্ধারণে এবং নারী ক্ষমতায় আরোহণের কোন দর্শন ও নির্দেশনা এবং অঙ্গীকার। বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অনেক ভাল ভাল কথা আছে, আশার বাণী আছে, আছে দরিদ্রতা হ্রাসকরণের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু তিনি নারীকে দেখেছেন দরিদ্র, অসহায়, কর্মহীন, মেধাহীন জন হিসেবে যার ভাগ্যোন্নয়ন তিনি চেয়েছেন। তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে আবেগাপ্লুত হয়ে সুকান্ত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "এই সব ম্লান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা, ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"। কিন্তু আমার দুঃখ হল, নারীকে মানুষ হিসেবে যোগ্য সহকর্মী হিসেবে, একটি প্রতিশ্রুতিময় ও সম্ভাবনাময় মানব সম্পদরূপে বাজেটে উপস্থাপনে তিনি ব্যর্থ হয়েছে।

আমি জানি না দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্রের মাধ্যমে, কিংবা সিডও-এমডিজি নির্দেশিত প্রস্তাবগুলো হুবহু নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পূরিত হলেও আমার স্বপ্নের নারীর ক্ষমতায় আরোহণ সম্ভব হবে কী না। তবে ভাগ্যের কিছু উন্নয়ন হবে, চিকিৎসা সুবিধা আসবে, শিশু ও নবজাতকের মৃত্যু হারও হয়তো আশাব্যঞ্জকভাবে হ্রাস পাবে। কিন্তু নারীর মুক্তি কী আসবে এই পথে, নারী কী মুক্তি পাবে পরিবার-সংসার ও সমাজের শৃঙ্খল থেকে, সর্বোপরি ভাঙবে কী পুরুষতন্ত্র, প্রতিষ্ঠিত হবে কি নারী-পুরুষ সমন্বয়ে সম-সমাজ।

শিক্ষা নিয়ে বাজেট আলোচনায় যাবার আগে দেখে নিই অর্থনীতিবিদরা জেন্ডার-প্রেক্ষিত বাজেটকে কীভাবে সংজ্ঞা দেন। আমি নমুনা হিসেবে অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাতের উদ্ধৃতি দেব। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, "Therefore a gender sensitive budget process looks at gender awareness and mainstreaming in all aspects of budgeting at national and local level. It promotes and evaluates women, men and other marginalized groups such as youth and rural people." এর আগে একই প্রবন্ধের এ স্থানে বলছে, "The main thrust of gender sensitive budget is to ensure that gender issues are integrated into all national policies, strategies, plans and programmes, rather than perceiveing women as a "special interest group' "। বারাকাতের দৃষ্টির সাথে আমার পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের মিল রয়েছে।

বাজেট নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে দেখে নেয়া যাক সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অবস্থান। আমি এজন্য ১নং তালিকার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে বলব। উচ্চ

www.pathagar.com

প্রশাসনে, বিচারালয়ে নারীর উপস্থিতি নেই বললেও চলে। নিচে পরিবেশিত পরিসংখ্যানে চিত্রটি খানিকটা স্পষ্ট হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্র		
শিক্ষার স্তর/শ্রেণী	মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা(%)	নারী শিক্ষিকরা সংখ্যা (%)
সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক	৪৯.৯	৩৯
নিম্ন মাধ্যমিক	৬০	২০
সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক	৫২.৩	১৯
বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক	৩২	১১
ক্যাডেট কলেজ	১০.৮	১৫
বেসরকারি স্কুল কলেজ	৫৪.৯	২৬
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে	৪৭	—
উচ্চশিক্ষা		
সাধারণ ডিগ্রি	৩৭.৬	১
সম্মান ডিগ্রি	৩৬.৩৬	১৭
মাস্টার্স ডিগ্রি	৩৫.৭	২৫
বিশ্ববিদ্যালয় (সকল)	২২.৫	১৫
মেডিকেল কলেজ	৪৬.১১	১৮
দন্ত্য চিকিৎসা কলেজ	৪২.৬	২৩
কারিগরি শিক্ষা		
পলিটেকনিক	১০.৮	১২
বিবিধ কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষা	১৮	নেই
মাদ্রাসা শিক্ষা		
দাখিল	৫২.২	৭.৫
আলিম	৪৩.৮	৫.৬
ফাজিল	৩৫	৪.৫
প্রশাসন		
দপ্তর / অফিস	নারীর মোট সংখ্যা	শতকরা (%)
সচিবালয় : সচিব-সহকারী সচিব	১৫৭	১১
গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৭,২৭৪	১৭.৩
জেলা প্রশাসক	৪	৬.৩
এসপি	২	৩
সমগ্র পুলিশ বাহিনী	১,২৯৩	১
উচ্চ আদালত		
বিচারপতি	৩	৩.৬

www.pathagar.com

শিক্ষা বাজেট ও নারীর অবস্থান

চট করে চলতি বছর ও আগামী বছরের বাজেটর দিকে তাকান যাক (তালিকা ১)। আমি প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে বেশি কথা বলব না। কেউ এটিকে নির্বাচনমুখী, কেউ ভোটার বান্ধব বাজেট নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কেউ নারীমুখী বা দরিদ্রমুখী বলেন নি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিপুল *অংকের থোক বরাদ্দ* রাখায় সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, এতে রাজনৈতিক কারণে খরচ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেবে, যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। অনেকে বলেছেন, বাজেটটি অতি উচ্চাভিলাষী, বিশেষ করে বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন খাতে রাখা টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয়; এই কারণে মাত্র কয়েক মাস আয়ুর এই সরকার এটি বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে না। অর্থমন্ত্রীর উচিত একটি বাস্তবমুখীন ছোট আকারে বাজেট পেশ করা। আমি এই মতের সাথে একমত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত কয়েক বছর ধরেই কল্পিত রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায় নি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে বাজেটে অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছে বিশেষ করে উন্নয়ণমুখী প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শ্লথ হয়ে পড়ছে। আগামী বছরেও এর ব্যত্যয় হবে না বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

চলতি ও আগামী বছরের বাজেটের প্রতি একটু তাকান যাক

তালিকা ২ : বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট চিত্র

অর্থ বছর	রাজস্ব (মিলিয়ন টাকা)	উন্নয়ন (মিলিয়ন টাকা)	মোট বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকা)		মোট বাজেটের শতাংশ (%)
			মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	
২০০৪-৫	৩৪২,৬৯০* (সংশোধিত ২৪১,৫৩০)	২২৯,৭৯০* (সংশোধিত ২১৪,৭৯০)	৫৭২,৪৮০	৫৫৬,৩২০	১৩.৪
২০০৫-৬	৩৮০,৮২০[১] (সংশোধিত ৩৭০,৫৭০)	২৬৩,০১০[২] (সংশোধিত ২৪০,০১০)	৬৪৩,৮৩০	৬১০,৫৮০[৩]	১৪.৭
২০০৬-৭	৪২২,৮৬০	২৭৪,৫৪০[৪]	৬৯,৭৪০০		১৫
গত ৩ বছরে শতকরা বরাদ্দ বৃদ্ধি	১৯	২১.৮		১৭.৯	

এই রাজস্ব খাত থেকে ৮৬০ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আর উন্নয়ন খাত থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় করা হবে ২২,০০০ কোটি টাকা, বাকি ৯৭৯ কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির

www.pathagar.com

কর্মসূচিতে ব্যয় করার জন্য সংরক্ষিত। তাই বলা যায় ২০০৪-৫ অর্থবছরে মোট ট. ২৩,৮৩৯ কোটি (২৩৮৩৯০ মিলিয়ন) উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১. চলতি ২০০৫-৬ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫,৭২২ কোটি টাকা বা ৪৫৭,২২০ মিলিয়ন টাকা। এটি সংশোধিত করে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে ট. ৪৪৮৬৮ কোটি বা ট. ৪৪৮৬৮০ মিলিয়ন টাকা (জিডিপির ১০.৮%)।

আগামী বছরের (২০০৬-৭) বাজেটে এই লক্ষ্যমাত্র স্থির করা হয়েছে ট. ৫২৫৪২ কোটি (৫২৫,৪২০ মিলিয়ন), যা চলতি বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ১৭% বেশি এবং জিডিপির ১১.৩%।

২. চলতি ২০০৫-৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ স্থির করা হয়েছিল ট. ২৪৫০০ কোটি (২৪৫,০০০ মিলিয়ন), তা সংশোধিত করে নতুনভাবে বরাদ্দ হয়েছে ট. ২১৫০০ কোটি (২১৫০০০ মিলিয়ন), যা গত বছরের (২০০৪-৫) প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় ১৬% বেশি।

৩. এই সংশোধিত বরাদ্দ জিডিপির ১৪.৭ শতাংশ বলে দাবি করা হয়েছে।

৪. আগামী ২০০৬-৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ট. ২৬০০০ কোটি (২৬০,০০০ মিলিয়ন), জিডিপির ৫.৬%, এবং তা চলতি আর্থিক বছরের সংশোধিত পরিমাণের চাইতে ২১% বেশি। এছাড়া রাজস্ব খাত থেকে (১) খাদ্যের জন্য কাজ প্রোগামের জন্য অতিরিক্ত থোক বরাদ্দ থাকবে ট. ৪১৮; কোটি এবং

(২) কর্মসংস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে চালিত কর্মসূচির জন্য দেওয়া হবে ট. ১৯৮২ কোটি।

সুতরাং মোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ টাকার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে : ট. ২৮৪৬৩ কোটি (২৮৪,৬৩০ মিলিয়ন)

এবার শিক্ষা খাতের বরাদ্দের প্রতি নজর দেয়া যাক। গত বছর বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষা খাতের সামগ্রিক বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে বলেছিলেন নেপোলিয়নের উক্তি উদ্ধৃত করে, 'তোমরা আমাকে ভাল মা উপহার দাও, আমি তোমাদের উন্নত জাতি উপহার দেব।' আমরা আজ জাতিকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও ভাল মা উপহার দিতে পারছি।' একথা তিনি উল্লেখ করেছেন মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির ৫৩% শতাংশ ছাত্রী লক্ষ্য করে। ব্যানবেইস এর ২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০২ সালে ছেলে ছাত্র ভর্তির হার ছিল ছেলে ৪৬.৫% ও মেয়ে ৫৩.৫%। নিঃসন্দেহে এটি শুভ লক্ষণ। কিন্তু আসল সমস্যা হল 'ধরে রাখা'। উপবৃত্তি প্রথা চালু হওয়াতে এই বুদ্ধি লক্ষ্যণীয়। মা বাবারা কতটা মেয়েকে শিক্ষা দেয়ার উৎসাহী আর কতটা মেয়ের বৃত্তির টাকাটির ওপর আকর্ষণ, নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। ১৯৯৮ সালে ছাত্রীভর্তির হার ছিল ৫১.২। গড়ে

www.pathagar.com

বৃদ্ধি ঘটেছে ২৫.৯% হারে, অন্যদিকে ছেলেদের বেলায় এটি ১৫%। এটি কিন্তু বিপজ্জনক সংকেত। কারণ বাবা-মা'রা কি তাদের ছেলেদের অল্প বয়সেই অন্যত্র ব্যবহার করছে পরিবারের আর্থিক সংগতি বাড়ানোর স্বার্থে। আর একটি বিষয় মনোযোগের দাবি রাখে তা হল উপবৃত্তি বজায় রাখতে হলে ছাত্রীর নিয়মিত উপস্থিতি ও ৪৫% নম্বর পেতেই হবে। এবং ফলে মা-বাবার চাপে ও স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীসংখ্যা ধরে রাখার স্বার্থে নমনীয় হন প্রমোশনের ব্যাপারে। এতে কিন্তু গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর ভর্তি হার ১৯৯৮ সালে ছিল ৪৫% যা বেড়ে ২০০২ সালে দাঁড়ায় ৫০.৮%। গড় বৃদ্ধির হার ৩৯.৪%, আর ছাত্রদের এই সংখ্যা মাত্র ১১.২%। যেখানে ১৯৯৮ সালে ছাত্রভর্তির হার ছিল ৫৫% তা ২০০২ সালে নেমে এসেছে ৪৯%। এটি জাতির জন্য শুভ লক্ষণ নয়। ছাত্রী ভর্তির হার বেড়ে গেলেও প্রাথমিক স্তরে 'ঝরে পড়ার' হার ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বেশি; ছাত্রীদের বেলায় এই হার ২৮%, আর ছাত্রদের বেলায় ২৬%। দেখা গেছে, প্রাথমিক কোর্স সম্পূর্ণ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৫৭%, আর ছেলেদের বেলায় ৬৩%। প্রাইমারি থেকে যতই আমরা উপরে উঠতে থাক লিঙ্গবৈষম্য ততই বাড়তে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষার স্তরে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৯৮ সালে ছিল ছাত্র ৬৪%, মেয়ে ৩৬%, এটি ২০০২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬১% ও ৩৯%।

আমরা ১নং তালিকায় প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত দেখিয়েছি। প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর গড় অনুপাত ৪৯.৭৩% ও ৫০.২৭%। আর শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ৬১.৭৮% ও ৩৮.২২%। এই লিঙ্গ-বৈষম্য ক্রমশ বাড়তে থাকে উচ্চ স্তরে ওঠার সাথে। সাধারণ ডিগ্রি স্তরে কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ৩৮%, আর শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র ১৮%। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে (প্রাইভেটসহ) ছাত্রীদের সংখ্যা ২২%. আর শিক্ষিকার সংখ্যা ১৫%। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের চিত্রটা দেখা যাক সংক্ষেপে। আমাকে যেটি উদ্বিগ্ন করে সেটি ছাত্রীদের বিজ্ঞান পড়ার দিকে আকৃষ্ট না হওয়া। বারাকাত সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্রীর সংখ্যা ১১%। এই মান জাতীয় স্তরে আরও কম হবে। উচ্চ স্তরে এইচএসসি উত্তীর্ণ মোট সংখ্যার মাত্র ৪% আসতে পারে, এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা যে অতি নগণ্য হবে তা বলাই বাহুল্য। নিচে প্রধান দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র তুলে ধরা হল।

তালিকা ৩ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার অবস্থান

বিদ্যার শাখা	পুরুষ শিক্ষক	%	মহিলা শিক্ষক	%	মোট শিক্ষক
কলা ও সামাজিক	৩৪৫	৭১	১৩৯	২৯	৪৮৪
বাণিজ্য	১৩১	৯০	১৫	১০	১৪৬
বিজ্ঞান	৩৬৭	১১৩	২৬৭	২৩.৫	৪৮০
মোট	৮৪৩	৭৬		২৪	১১১০

www.pathagar.com

বিদ্যার শাখা	পুরুষ শিক্ষক %		মহিলা শিক্ষক %		মোট শিক্ষক
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)					
ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়	২৯৩	৮৮	৪০	১২	৩৩৩
ননইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়	৪৯	৭৪.২	১৭	২৫.৮	৬৬
মোট	৩৪২	৮৫.৭	৫৭	১৪.৩	৩৯৯

চিত্রটি কিন্তু ভয়াবহ। বাণিজ্য অনুষদে দেখুন মাত্র ১০% মহিলা শিক্ষক। বুয়েটে এই চিত্র আরও ভয়াবহ। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়সমূহে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১২%। একমাত্র স্থাপত্য বিভাগেই এই হার উল্লেখযোগ্য ৩১%। কারিগরি শিক্ষাতেও এই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তালিকা ১ দেখুন।

সামনের বছরে বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ১১০,৯৩০ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ৭২,১৪০ মিলিয়ন টাকা রাজস্ব খাত থেকে এবং ৩৮,৭৮০ মিলিয়ন টাকা আসবে উন্নয়ন খাত থেকে। এর সাথে রয়েছে, নিম্নলিখিত বরাদ্দগুলো; প্রাইমারি খাতে ৪৭,২১০ মিলিয়ন, এর মধ্যে উন্নয়নে ব্যয় ২২৬১০ মিলিয়ন, বাকিটা অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় হবে। চলতি বছরে এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৩৮১৯০ মি, এবং ১৬৯৫০ মি। এবারের বাজেটে মোট উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭৪,৫৪০ মিলিয়ন টাকা যা থেকে এডিপিতে বরাদ্দ ২৬০,০০ মিলিয়ন যা জিডিপির ৫,৬% এর চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দের ২১% বেশি। মোট উন্নয়ন খাতের ১৪% ব্যয় ধরা হয়েছে আর এডিপি'র ১৪.৯% শিক্ষা উন্নয়নের জন্য। এই দীর্ঘ থেকেই চলমান ৭৮টি প্রকল্প ও যদি নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হয় সে জন্য খরচ করা হবে। এছাড়া প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তরেও মেয়েদের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়নের ৪,৮১০ মি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে খাদ্যের বিনিময়ে কাজের জন্য আর ১৯,৮২০ মি টাকা থাকবে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে। এসবই ভাল ভাল কথা, শুভ ইচ্ছার প্রকাশ। সরকার বিগত বছরগুলোতে রাজস্ব আয়ের মাত্রা কখনও অর্জন করতে পারে না, ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়, খাতায় কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। গত কয়েক বছর ধরেই মেয়েদের জন্য তিনটি পলিটেকনিক স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু কতদূর অগ্রসর হয়েছে তার চিত্র এবারের বাজেটেও স্পষ্ট হয়নি। নিচের চিত্রটি দেখুন :

তালিকা ৪ : শিক্ষা বাজেটে খাতওয়ারি বণ্টন (উন্নয়ন)

খাত	২০০১-০২ বরাদ্দ (%)	২০০৪-০৫ (%)
মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক/কলেজ শিক্ষা	৭৯	৭৭
টেকনিক্যাল ও বৃত্তিমূলক	৯	১৪
বিশ্ববিদ্যালয়	৯.৫	৯
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	২	০.৪৫
অন্যান্য	০.৫	.৩৫

www.pathagar.com

তালিকা ৫ : শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ

অর্থ বছর	রাজস্ব মিলিয়ন টাকা	উন্নয়ন (মিলিয়ন টাকা)	মোট বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকা)	মোট বাজেটের শতাংশ (%)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০০-০১	৩৩,৪৪০	২২.৫২০	৫৫,৯৬০	১৪.৫	২.২
২০০১-০২	৩৬,৩৬০	২৩,৯২০	৬০,২৮০	১৪.২	২.২
২০০২-০৩	৩৮,০২০	২৩,০৮০	৬১,১০০	১৩.৬	২.০৩
২০০৩-০৪	৪১,০৮০	২৬,৩২০	৬৭,৪০০	১৩.০	২.০৫
২০০৪-০৫	৪৬,০৯০	৩০,৭২০	৭৬,৮১০	১৩.৪	২.০৭
২০০৫-০৬	৬৩,৭১০ (পুনঃনির্ধারিত: ৬৪,৫৮০)	৩৩,১৫০ (পুনঃনির্ধারিত: ২৮০৭০	৯৬,৮৬০ (পুনঃনির্ধারিত: ৯২,৬৫০)	১৫.০	২.২
২০০৬-০৭	৭২১৪০	৩৮,৭৯০	১১০,৯৩০	১৫.৯	২.৪
গত ৬ বছরে শতকরা বরাদ্দ বৃদ্ধি	৫৩.৬%	৪১.৯	৫৫		

এর পাশাপাশি অন্য কয়েক খাতে বাজেটের অবস্থাটি দেখা যাক যার ওপর অপ্রত্যক্ষভাবে নারী উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে যেমন সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ খাত, যার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে দুটি মন্ত্রণালয় : মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সামাজিক কল্যাণ মন্ত্রণালয়। তাছাড়া রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

তালিকা ৬ : নারী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ

	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (রাজস্ব ও উন্নয়ন)				
অর্থ বছর	স্বাস্থ্যসেবা (স্বাস্থ্য-পরিবার মন্ত্রণালয়) (মিলিয়ন টাকা)	সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (সামাজিক কল্যাণ মন্ত্রণালয়) (মিলিয়ন টাকা)	মহিলা ও শিশুকল্যাণ (মিলিয়ন টাকা)	মোট বাজেটের শতাংশ (%)	জিডিপি'র শতাংশ (%)
২০০৩-০৪	২৯,২২০ (৩৩,৪৫০ পূর্ণনির্ধারিত)	৪,০৮০ (৩,৮৯০ পূর্ণনির্ধারিত)	২,৩৭০ (২,০৭০ পূর্ণনির্ধারিত)		
২০০৪-০৫	৩৭,৩২০	৫,১৩০	৫,২৭০	১৩.৪	২.০৭
২০০৫-০৬	৪২,৪০০ (৪১,১২০ পূর্ণনির্ধারিত)	৬,২৬০ (৬,০৭০ (পূর্ণনির্ধারিত)	৬,৪৩০ (৬,০২০ পূর্ণনির্ধারিত)	১৫.০	২.২

www.pathagar.com

	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (রাজস্ব ও উন্নয়ন)				
২০০৬-০৭ (প্রস্তাবিত	৪৭,৮৪০	৭,৬৭০	৭,৪৯০		
গত ৪ বছরে গড় বৃদ্ধির হার (%)	৩৭	৪৬.৮	৬৮.৪		

আমি আমার কথামালার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। আমি উপসংহার টেনে কোন সুপারিশ মালা উপস্থিত করব না, সে যোগ্যতা আমার নেই। নারীজাতি সহ পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অসহায় মানুষকে টেনে তুলতে হলে তাদের অশিক্ষার অন্ধকার কুঠুরীটিকে আলোকময় করে তুলতে হবে, আমাদের অন্য উন্নয়ন খাতের বিনিময়ে হলেও। জাতিকে আরও হয়তো এজন্য কষ্ট সহ্য করতে হতে পারে।

অনেকের মত আমিও শিক্ষাসহ আগামী বছরের বাজেটটি গতানুগতিক মনে করি। অনেক ভাল ইচ্ছার কথা প্রকাশিত হয়েছে। আমি মনে করি বাজেটে প্রতিফলিত হয় সরকারের ও সরকারকে যারা পরিচালনা করেন সেই রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি। এ বাজেটেও এর ব্যতিক্রম নয়, অর্থমন্ত্রী নিজ দলের স্থপতি জেনারেল জিয়ার অনেক গুণগান করেছেন, কিন্তু গত ৩৪ বছরের দেশের অর্থনৈতিক চালচিত্রের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গত সরকারের জন্য তিনি মাত্র একটি লাইন ব্যয় করেছেন।

আমি এই বাজেট থেকে বা চলতি সরকারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন কোন দিকনির্দেশনা দেখছি না যা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য, ধর্মীয় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমি সেই বাজেটের জন্য অপেক্ষা করব যা আমার প্রয়াত মায়ের বেদনার্ত মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারত হাসির ঝিলিক, যিনি বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন আমি মুক্ত 'পরিবারের ও সমাজের' বন্দীশালা থেকে। সবশেষে একটি কথা বলা আবশ্যক, আমাদের সৎ ইচ্ছাগুলো কোনদিনই বাস্তবায়িত হবে না, যদি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি সৎ সরকার না পাই। সন্ত্রাস খচিত দুর্নীতিতে ভরা প্রশাসন, সশস্ত্র মাস্তানদের হাতে বন্দী রাজনৈতিক কালচারের প্রেক্ষাপটে তা বোধ হয় সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম জীবনানন্দ দিয়ে শেষ করি : আমি বাংলার মুখ দেখিয়াছি, দেখিতে চাহি না ...। কিন্তু এই কী জীবনানন্দের বংলা?

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন

প্রতিমা পাল-মজুমদার

১.১. ভূমিকা

নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশের একটি জাতীয়নীতি। এই নীতির কথা বলা হয়েছে দেশের সংবিধানে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং বিভিন্ন জাতীয় নথিতে। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কৌশলও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন :

১. নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা,
২. ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে নারীর জন্য লাভজনক পেশা সৃষ্টি করা,
৩. লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি।

কিন্তু নীতিনির্ধারকগণ স্বল্পই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নারীর মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার ছাড়া এই কৌশলগুলোর কোনটাই ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করা যাবে না। কেননা শিক্ষাই নারীকে শক্তি যোগাবে উপরোক্ত কৌশলগুলোর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়িত করার জন্য।

নিজেকে ক্ষমতায়িত করার জন্য যতগুলো গুণের প্রয়োজন তার প্রত্যেকটিই নারী অর্জন করতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে। কারণ নারীর উপর রয়েছে শিক্ষার নানামুখী প্রভাব। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে নারীর উৎপাদনশীলতা, তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এমনকি তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়নের উপরও শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত এক বছরের শিক্ষার জন্য নারীর মজুরি বৃদ্ধি প্রায় ১০ শতাংশ। আরও দেখা গেছে, যতই নারী শিক্ষা গ্রহণ করেছে ততই তার নিজের আস্থা বেড়েছে যা কিনা ক্ষমতায়নের অপরিহার্য শর্ত।

নারীর শিক্ষা যে কেবল নারীকেই ক্ষমতায়িত করছে তা নয়। সমাজকেও ক্ষমতায়িত করছে অনেকাংশে। যেহেতু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে নারীর শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্ম হার কমেছে; শিশুর রোগপ্রবণতা কমেছে; শিশুকে টিকা

www.pathagar.com

দেওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে; শিশু সর্বাঙ্গীণ সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে; পরিবারগুলোতে নিরাপদ পানি গ্রহণ করা বৃদ্ধি পেয়েছে; সমাজে লিঙ্গভিত্তিক যে মতামতগুলো ছিল তা ধীরে ধীরে দূরীভূত হচ্ছে ইত্যাদি। তাই দেখা যাচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে নারী কেবল নিজেই ক্ষমতায়িত হচ্ছে না সমাজের মঙ্গল করার জন্যও ক্ষমতায়িত হচ্ছে। তাই নারীকে ক্ষমতায়িত করার জন্য শিক্ষার বিকল্প নাই।

নারীকে ব্যাপক হারে শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন নারীশিক্ষা বিষয়ক জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং নীতিকে কার্যকর করার জন্য অর্থের যোগান। নারীশিক্ষা বিষয়ক নীতির অভাব নেই বাংলাদেশে। কেননা, বিভিন্ন জাতীয় নথিতে যেমন—সংবিধান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র (PRSP) ইত্যাদিতে নারীশিক্ষার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু আন্তর্জাতিক দলিল, যেমন CEDAW, Platform for Action (PFA), Millennium Development Goal (MDG) ইত্যাদিতে সই করার ফলে বাংলাদেশ নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবেও দায়বদ্ধ। তবে নারীর শিক্ষার ওপর এই নীতিগুলোর কোনটিরই কোন প্রভাব পড়বে না যদি না তা ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করা হয়। এই নীতিগুলো কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন নারীশিক্ষার দিকে অর্থের অনবরত প্রবাহ। জাতীয় শিক্ষা বাজেটের মাধ্যমে সরকার এই অর্থপ্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে। কেননা জাতীয় বাজেটই হচ্ছে সরকারের হাতে সবচাইতে কার্যকর instrument, যার মাধ্যমে নারী শিক্ষার দিকে অর্থ স্থানান্তর সম্ভব হয়। এখানেই প্রয়োজন হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা বাজেটের লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যাবে নারীর-শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে কিনা। তবে বাজেটে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ থাকলেই নারীশিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতিগুলোর সফল বাস্তবায়ন হবে না। সফল বাস্তবায়ন হবে যদি এই অর্থ বরাদ্দ দক্ষতার সঙ্গে খরচ করা সম্ভব হয়। যথেষ্ট বরাদ্দ এবং খরচ এই দুটি সফলভাবে হলেও শিক্ষার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়িত হবে না। যদি শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়ন বাজেটে নারীর শিক্ষাবিস্তারের জন্য সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করা না হয়। এর প্রত্যেকটি বিষয় মাথায় রেখেই এই নিবন্ধে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেট নারীর ক্ষমতায়নে কতটা প্রভাব ফেলেছে তার হিসাব কষার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১.২. বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস

বাজেটে দুটি অংশ আছে। রাজস্ব (revenue) বাজেট এবং উন্নয়ন (development) বাজেট। এই দুই অংশই এই সমীক্ষায় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তবে রাজস্ব বাজেটের বেশির ভাগই খরচ হয় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা, পেনশন ইত্যাদি প্রদান করতে। যেহেতু সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নারীর অংশ খুবই নগণ্য সেহেতু রাজস্ব বাজেটে নারীর অংশও অত্যন্ত নগণ্য। তাই বাজেট বিশ্লেষণের সময় রাজস্ব বাজেটকে খুব স্বল্পভাবেই বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রের কর

www.pathagar.com

নীতি কিভাবে নারী শিক্ষা বিস্তারের ওপর প্রভাব ফেলেছে তাও আংশিকভাবে বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের বিশ্লেষণের বেশিরভাগই নির্ভর করেছে উন্নয়ন বাজেটের ওপর। উন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে নিম্নোক্ত চারভাগে ভাগ করে এই বিশ্লেষণ আরম্ভ করা হয়েছে।

১. যে প্রকল্পগুলোর নারীর শিক্ষার ওপর কোন প্রভাব নেই অর্থাৎ যে প্রকল্পগুলো কেবল পুরুষের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে।
২. কেবল নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্প।
৩. লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্প (যে প্রকল্পগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষা প্রভাবিত করে)।
৪. যে প্রকল্পগুলো ধর্মীয় শিক্ষার জন্য গৃহীত হয়েছে।

এই প্রকল্পগুলোতে উন্নয়ন বরাদ্দ ভাগ করে নারীশিক্ষার জন্য বরাদ্দটি চিহ্নিত করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরের শিক্ষা বাজেটই হচ্ছে এই সমীক্ষার তথ্যের উৎস। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় নারী ও পুরুষের মধ্যে ফারাকটি তুলে ধরার জন্য BANBEIS কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। BANBEIS-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনটিতে ২০০২ সাল পর্যন্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। পরের তিন বছরের জন্য জাতীয় পর্যায়ের কোন শিক্ষা তথ্য পাওয়া যায়নি বলে ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যেই এই নিবন্ধটির শিক্ষা বিষয়ক বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। তবে বাজেট বরাদ্দের ব্যাপারে বর্তমান বছরকেও বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩. নিবন্ধটির কাঠামো

বর্তমান নিবন্ধটি নিম্নোক্ত মোট ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১. ভূমিকা
২. নারীর ক্ষমতায়নের ওপর শিক্ষাক্ষেত্রের কর নীতির প্রভাব
৩. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেটের বৈশিষ্ট্যসমূহ
৪. জাতীয় শিক্ষা বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ
৫. নারীকে ক্ষমতায়িত করার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা বাজেটের ভূমিকা
৬. নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় শিক্ষা বাজেটের অদক্ষতার কারণসমূহ
৭. অদক্ষতা দূরীকরণের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশমালা

২. কর নীতি

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ ছাড়া বাজেটের আর একটি কাজ হলো কর নীতি প্রণয়ন করা। কর নীতির মাধ্যমেও সরকার নারীশিক্ষার দিকে সম্পদ স্থানান্তর করতে পারে। যেমন— বর্তমান এবং পূর্ববর্তী বছরের শিক্ষা বাজেট IT ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য সরকার Tax incentive প্রদান করেছিল। যার ফলে অনেক Entrepreneur-ই IT School

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহী হয়েছিলেন। এই incentive নিয়ে অনেকে কেবল মেয়েদের জন্যও IT School স্থাপন করেছে। এই ধরনের কর উৎসাহে নারীর ক্ষমতায়নকে উসকে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু আজকের পৃথিবীতে IT হচ্ছে একটি শক্তিশালী ক্ষমতার উৎস। একইভাবে কাগজের ওপর আমদানি করের হ্রাসও নারীশিক্ষা বিস্তারে অনেক ইন্ধন যুগিয়েছে। এমনি আরও দু'একটি কর আছে, যা নারীশিক্ষা বিস্তারে সহায়তা প্রদান করেছে।

৩. বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেটের কিছু বৈশিষ্ট্য বা দুর্বলতা

বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেটের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বা দুর্বলতা আছে যা নারীর জন্য বরাদ্দের ওপর প্রভাব ফেলে। নিম্নে এই বৈশিষ্ট্য বা দুর্বলতাগুলো তুলে ধরা হলো।

প্রথম বৈশিষ্ট্য বা দুর্বলতাটি হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দে শিক্ষা ক্ষেত্রের অংশ ক্রমহ্রাসমান

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রটি জাতীয় বাজেটে অগ্রাধিকার পেয়ে আসছিল, যার ফলে এই ক্ষেত্রটিই সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেতো। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে মোট বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের অংশ কমে গেছে। যদিও চূড়ান্ত বরাদ্দ বেড়েছে (সারণি-১)। চূড়ান্ত বরাদ্দ বৃদ্ধির বেলাতেও দেখা গেছে মোট জাতীয় বাজেটে যে হারে বরাদ্দ বেড়েছে তার চাইতে অনেক কম হারে শিক্ষা ক্ষেত্রের বরাদ্দ বেড়েছে।

সারণি ১ : বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ ২০০০/০১-২০০৪/০৫ (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব বাজেট	উন্নয়ন বাজেট	মোট	মোট জাতীয় বাজেটে শিক্ষা বাজেটের অংশ	GDPর কত অংশ শিক্ষার জন্য খরচ হয়
২০০০-০১	৩,৩৪৪ (৫৯.৭৬)	২,২৫২ (৪০,২৪)	৫,৫৯৬ (১০০,০০)	১৪.৫	২.২০
২০০০-০১	৩,৬৩৬ (৬০.৩২)	২,৩৯২ (৩৯,৬৮)	৬০২৮ (১০০,০০)	১৪.২	২.২০
২০০২-০৩	৩,৮০২ (৬২.২৩)	২,৩০৮ (৩৭.৭৭)	৬,১১০ (১০০,০০)	১৩.৬	২.০৩
২০০৩-০৪	৪,১০৮ (৬০.৯৫)	২,৬৩২ (৩৯.০৫)	৬৭৪০ (১০০.০০)	১৩.০	২.০৫
২০০৪-০৫	৪,৬০৯ (৬০.০০)	৩০৭২ (৪০.০০)	৭৬৮১ (১০০,০০)	১৩.৪	২.০৭

www.pathagar.com

অর্থ বছর	রাজস্ব বাজেট	উন্নয়ন বাজেট	মোট	মোট জাতীয় বাজেটে শিক্ষা বাজেটের অংশ	GDPর কত অংশ শিক্ষার জন্য খরচ হয়
২০০০/০১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৪/০৫ অর্থ বছরে বৃদ্ধির হার	৩৭.৮	৩৬.৪	৩৭.৩	-১.১	-০.১৩

উৎস : Budget in Brief, GOB, FY ২০০০/০১-২০০৪/০৫

দ্বিতীয় দুর্বলতাটি হচ্ছে—শিক্ষা ক্ষেত্রের বরাদ্দটি বাংলাদেশের GDPর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ

বাংলাদেশের GDP-র মাত্র ২ শতাংশের সমান যেখানে SAARC ভুক্ত দেশ ভারতে এই অংশ ৪ শতাংশ এবং মালদ্বীপে এই অংশ ৯ শতাংশেরও বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এই স্বল্প বরাদ্দের জন্যও নারীশিক্ষার জন্য স্বল্প বরাদ্দ করা হবে।

তৃতীয় দুর্বলতাটি হচ্ছে-শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের সিংহভাগই রাজস্ব খাতে ব্যয় হয়

শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের ৬০ শতাংশই ব্যয় হয় রাজস্ব খাতে। অথচ রাজস্ব খাতের সিংহভাগই অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই খাত হতে নারীরা খুব কম সুবিধা পান। তবে এই খাতে নারীদের সুবিধা একটু বৃদ্ধি পেতে পারে যদি নীতি অনুযায়ী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের ৭০ শতাংশই নারী শিক্ষক হন। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৬ শতাংশ সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হচ্ছেন নারী। সারণি ১ হতে দেখা যাচ্ছে মোট শিক্ষা বাজেটে রাজস্ব বাজেটের অংশ গত কয়েক বছর ধরে প্রায় একই রকম আছে। তবে চূড়ান্ত বরাদ্দ বৃদ্ধির হার উন্নয়ন বাজেটের চাইতে বেশি। শিক্ষা বাজেটের এই দুর্বলতাটিও নারী শিক্ষার জন্য বরাদ্দের ব্যাপারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

চতুর্থ দুর্বলতাটি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে কম বরাদ্দ দেওয়া

জাতীয় শিক্ষা বাজেটের চতুর্থ যে দুর্বলতা শিক্ষা খাতে নারীর বরাদ্দের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তা হলো—প্রাথমিক শিক্ষা খাতে কম বরাদ্দ দেওয়া (সারণি ২)। অথচ নারীশিক্ষার বেশির ভাগটাই সীমাবদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে।

সারণি ২ : জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার উপরের শিক্ষার অংশ ২০০০/০১-২০০৪/০৫ (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ	প্রাথমিক শিক্ষার উপরের শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ	মোট
২০০০-০১	২,৭২৪ (৪৮.৬৭)	২,৮৭২ (৫১.৩২)	৫,৫৯৬ (১০০০.০০)
২০০১-০২	২,৮৩৮ (৪৭.০৮)	৩,১৯০ (৫২.৯২)	৬,০২৮ (১০০০.০০)

www.pathagar.com

অর্থ বছর	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ	প্রাথমিক শিক্ষার উপরের শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ	মোট
২০০২-০৩	৩,২৫৬ (৫৩.২৮)	২৮৫৪ (৪৬.৭১)	৬,১১০ (১০০০.০০)
২০০৩-০৪	২,৮০১ (৫৩.২৮)	৩৯৩৯ (৪৬.৭২)	৬,৭৪০ (১০০০.০০)
২০০৪-০৫	৩২৯২ (৪২.৮০)	৪,৩৯৮ (৫৭.১৯)	৭,৬৯০ (১০০০.০০)
২০০/০১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৪/০৫ অর্থ বছরের বৃদ্ধির হার	২০.৮৫	৫৩.১৩	৩৭.৩

উৎস : BANBEIS, ২০০৩

৪. জাতীয় শিক্ষা বাজেটে নারীর অংশ

শিক্ষা খাতে গত পাঁচ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা কমে গেছে (সারণি ৩)। তবে ইতিবাচক দিক হলো, যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর নারীর শিক্ষার উপর কোন প্রভাব নেই সেই ধরনের প্রকল্পের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার হারই সবচাইতে বেশি। ধর্ম শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার হারও অনেক বেশি। তবে সারণি ৩ হতে দেখা যাচ্ছে এই প্রকল্পগুলোতে অর্থ বরাদ্দ হ্রাস পায়নি। বরং বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ।

সারণি ৩ : শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোতে (এ সমীক্ষার জন্য প্রকল্পগুলোকে যেভাবে বিভাজন করা হয়েছে সেই বিভাজন অনুযায়ী) প্রস্তাবিত এবং সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ২০০০/০১-২০০৪/০৫

উন্নয়ন প্রকল্পের ধরণ	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
	প্রকল্পের সংখ্যা				
যে প্রকল্পগুলোর নারীর শিক্ষার উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই অর্থাৎ যে প্রকল্পগুলো কেবল পুরুষের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে	৪৪ (৩৩.৮)	২৭ (১৬.৮)	১৮(১৬.৮)	১৫ (১৫.০)	১১ (১৮.০)
কেবল নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্প	৯ (৬.৯)	৮ (৭.৮)	৭ (৬.৫)	৮ (৮.০)	৭ (১১.৫)
লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্প (যে প্রকল্পগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য গৃহীত হয়েছে)	৬০ (৪৬.২)	৫১ (৫০.০)	৬৪ (৫৯.৮)	৬৬ (৬৬.)	৩৪ (৫৫.৭)
ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রকল্প	৭১ (১৩.১)	১৬ (১৫.৭)	১৮ (১৬.৮)	১১ (১১.০)	৯ (১৪.৮)
সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ	১৩০ (১০০.০)	১০২ (১০০.০)	১০৭ (১০০.০)	১০০ (১০০.০)	৬১ (১০০.০)

www.pathagar.com

উন্নয়ন প্রকল্পের ধরণ	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
			প্রকল্পের সংখ্যা		
প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ					(কোটি টাকায়)
যে প্রকল্পগুলোর নারীর শিক্ষার উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই অর্থাৎ যে প্রকল্পগুলো কেবল পুরুষের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে	১৮৮.৭ (৮.২)	১৭৬.২ (৭.২)	৮৩.৬ (২.৮)	৭০.২ (২.৬)	৪৩.৩ (১.৪)
কেবল নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্প	৩৩৪.০ (১৪.৬)	৪১৮.৬ (১৭.২)	৪৭৯.৯ (১৬.২)	৪৩০.২ (১৫.৯)	৩৪৪.৮ (১১.০)
লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্প (যে প্রকল্পগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে)	১৬৯৮.৫ (৭৪.০)	১৭৫৬.২ (৭২.২)	২২৯২.৪ (৭৭.২)	২০৯০.৩ (৭৭.১)	২৬২৮.৯ (৮৩.৭)
ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রকল্প	৭৩.৩ (৩.২)	৮২.৯ (৩.৪)	১১৪.৭ (৩.৯)	১২০.৩ (৪.৪)	১২৪.৬ (৪.০)
সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ	২২৯৪.৬ (১০০.০)	২৪৩৩.৮ (১০০.০)	২৯৭০.৫ (১০০.০)	২৭১১.০ (১০০.০)	৩১৪১.৬ (১০০.০)

সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ (বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো প্রকাশ করছে সংশোধিত বাজেট প্রস্তাবিত বাজেটের কত অংশ (%) (কোটি টাকায়)					
সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ (বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো প্রকাশ করছে সংশোধিত বাজেট প্রস্তাবিত বাজেটের কত অংশ (%) কোটি টাকায়)					
যে প্রকল্পগুলোর নারীর শিক্ষার উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই অর্থাৎ যে প্রকল্পগুলো কেবল পুরুষের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে	২০৭.৭৩ (১১০.১)	৩০৭.৯৩ (২৭৪.৮)	২৯৫.১৮ (৩৫৩.১)	n.a	n.a
কেবল নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্প	৩৩৫.৪ (১০০.৪)	৩ ৬ ৯ . ৭ (৮৮.৩)	৪৩৪.৩ (৯০.৫)	n.a	n.a

www.pathagar.com

সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ (বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলো প্রকাশ করছে সংশোধিত বাজেট প্রস্তাবিত বাজেটের কত অংশ (%) (কোটি টাকায়)					
লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্প (যে প্রকল্পগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে)	১৬৭৩.২ (৯৮.৫)	১৪৩৯.১ (৮১.৯)	১৭৭৯.৭ (৭৭.৬)	n.a	n.a
ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রকল্প	৫৮.০ (৭৯.২)	৫৪.৬ (৬৫.৯)	৮২.২ (৭১.৭)	n.a	n.a
সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ	২২৭৪,৩৮ (৯৯.১)	২১৭১.৩৮ (৮৯.২)	২৫৯১.৪ (৮৭.২)	n.a	n.a

উৎস : ১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০০/০১-২০০৪/০৫, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতির পর্যালোচনা, IMED, Ministry of Planning.

উপরোক্ত সারণিটিতে একটি যে উৎসাহব্যঞ্জক দিক লক্ষণীয় তা হচ্ছে—লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোতে গত কয়েকটি অর্থবছরে বরাদ্দের দারুণ বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি প্রকাশ করছে নারীর শিক্ষাকে কয়েকটি নারী লক্ষ্যভূত প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষাব্যবস্থার মূলস্রোতে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা খুবই একটি ভাল দিক হতো যদি এই প্রকল্পগুলো হতে নারী তার হিস্যা বুঝে পেতো। কিন্তু প্রকল্পগুলোতে যেহেতু মেয়েদের জন্য কোন Target ধার্য করা হয়নি সেহেতু তাদেরকে তাদের হিস্যা পাওয়ার জন্য পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। দুর্বল প্রতিযোগী হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের কাছে হেরে গেছে। যেমন দেখা গেছে BIT কিম্বা Textile Technology College-এর মোট ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ হচ্ছে নারী। অথচ এই কলেজগুলোর শিক্ষা নারীকে উচ্চ মজুরির চাকরি পেতে সহায়তা করতে পারতো।

এমনকি দেখা গেছে নির্দিষ্ট target নাই বলে cash for education এর সুবিধাও ছেলেরা বেশি পাচ্ছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষায় এখন ছেলে-মেয়ের সংখ্যা সমান।

সারণি ৩ হতে সবচাইতে বড় লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে—গত কয়েক বছরে কেবল নারীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে অতি সামান্য। গত কয়েক বছর ধরে একই ধরনের প্রকল্প প্রায় একই আকারে চলে আসছে (পরিশিষ্ট-১)। তার ওপর সারণি ৪ হতে দেখা যায় এই স্বল্প বরাদ্দটিরও পুরো সুবিধা নারীরা পায়নি। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে নারীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ১০ শতাংশই অব্যয়িত রয়ে গেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এটাই সবচাইতে বৃহৎ অব্যয়িত অর্থ।

সারণি ৪: বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের বাস্তবায়নের দক্ষতা (দক্ষতা মাপা হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের কত অংশ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয়েছে) ২০০০/০১-২০০২/০৩

উন্নয়ন প্রকল্পের ধরন	Actual Expenditure as % of Revised Budget		
	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩
যে প্রকল্পগুলোর নারীর শিক্ষার ওপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই অর্থাৎ যে প্রকল্পগুলো কেবল পুরুষের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করে	৯৪.৪	৮৯.৬	৯৬.৩

www.pathagar.com

উন্নয়ন প্রকল্পের ধরন	Actual Expenditure as % of Revised Budget		
	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩
কেবল নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্প	৭২.০	৮৬.৪	৯০.৫
লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্প (যে প্রকল্পগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে)	৯৮.৮	৯৩.৭	৯১.১
ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রকল্প	৯৮.৩	১০৫.৫	৯২.২
সব ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ	৯৪.৪	৯২.২	৯১.৬

উৎস : ১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০০/০১-২০০৪/০৫, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতির পর্যালোচনা, IMED, Ministry of Planning.

৫. নারীকে ক্ষমতায়িত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা বাজেটের ভূমিকা

এই প্রবন্ধে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপ্তি নির্ণয়ের জন্য নিম্নোক্ত মাপকাঠিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে—

ক. শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যাপ্তি
খ. School curriculum-এর লিঙ্গ সংবেদনশীলতা
গ. নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করার ব্যাপ্তি
ঘ. নারীর মজুরি বৃদ্ধির হার
ঙ. নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নের ব্যাপ্তি
চ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি

ক. শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের ব্যাপ্তি

গত কয়েক বছরে শিক্ষা বাজেটের একটি বিরাট সাফল্য হচ্ছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে লিঙ্গবৈষম্য সম্পূর্ণরূপে দূর করা (সারণি ৬, ৮)। যার ফলে গত বিশ বছরে নারীর literacy বৃদ্ধি পাওয়ার হারও চমকপ্রদ। সারণি ৫ হতে দেখা যাবে ১৯৮১ সালে নারী শিক্ষার হার ১৭.৫২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ৪০.৮৩তে দাঁড়িয়েছে; যা দ্বিগুণের চাইতেও বেশি। কিন্তু সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে পুরুষের শিক্ষা বৃদ্ধির হার নারীর শিক্ষা বৃদ্ধির হারের চাইতে অনেক কম।

সারণি ৫: বাংলাদেশের ৭ বৎসরের উর্ধ্ব জনগণের শিক্ষার হার, ১৯৮১-২০০১

বছর	পুরুষ	মেয়ে	উভয়
১৯৮১	৩৩.৮৪	১৭.৫২	২৫.৯৯
১৯৯১	৩৮.৯০	২৫.৪৫	৩২.৪০
২০০১	৪৯.৫৬	৪০.৮৩	৪৫.৩২

উৎস : Population Census ২০০১

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষা

সারণি ৬ হতে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে। তবে সারণি ৬ হতে একটি বিষয় লক্ষণীয়। দেখা যাচ্ছে ১৯৯৮ সালে প্রাথমিক স্কুলে যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল তা ২০০২ সালে এসে কমে গেছে। অথচ Population census ২০০১ অনুযায়ী ঐ সময়ে প্রাথমিক স্কুলে গমনোপযোগী ছেলে মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দেড়গুণেরও বেশি হারে। সারণি ৭ হতে এই অবস্থার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় (প্রাথমিক স্তরের মাদ্রাসা) ছাত্রসংখ্যা বিশেষ করে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার হার অত্যন্ত বেশি। গত ৫ বৎসর সময়ের মধ্যে মাদ্রাসায় ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬৭ শতাংশ যেখানে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ হারে। এই তথ্য এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, মেয়েরা বেশি সংখ্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই ইঙ্গিতটি আরও স্পষ্ট হয় যখন Fazel এবং Kamel মাদ্রাসায় ছাত্রী ভর্তির হার বিচার করা হয় (সারণি ১০)।

সারণি ৬ : প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তিকৃতদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা ১৯৯৮-২০০২

বছর	ছেলে	মেয়ে	উভয়
১৯৯৮	৯৫৭৬৯৪২ (৫২.১৬)	৮৭৮৩৭০০ (৪৭.৮৪)	১৮৩৬০৬৪২ (১০০.০০)
১৯৯৯	৮৭০৫০০১ (৫০.৪৩)	৮৫৫৬৭১২ (৪৯.৫৭)	১৭২৬১৭১৩ (১০০.০০)
২০০০	৯০৩২৬৯৮ (৫১.১২)	৮৬৩৫২৮৭ (৪৮.৮৮)	১৭৬৬৭৯৮৫ (১০০.০০)
২০০১	৮৯৮৯৭৯৫ (৫০.৯১)	৮৬৬৯৪২৫ (৪৯.০৯)	১৭৬৫৯২২০ (১০০.০০)
২০০২	৮৮৪১৬৪৭ (৫০.৩৫)	৮৭২০১৮১ (৪৯.৬৫)	১৭৫৬১৮২৮ (১০০.০০)
১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০২ সালে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার	-৭.৬৮	-১.০০	-৪.০৫

উৎস : BANBEIS ২০০৩.

সারণি ৭ : এবতেদায় মাদ্রাসায় (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুল্য) ভর্তিকৃতদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা, ১৯৯৮-২০০২

বছর	ছেলে	মেয়ে	উভয়
১৯৯৮	৮৮৭১৮৭ (৭০.১৭)	৩৭৭২১৮ (২৯.৮৩)	১২৬৪৪০৫ (১০০.০০)
১৯৯৯	৮৯০০৪৪ (৬১.৯২)	৫৪৭৪৭৬ (৩৮.০৮)	১৪৩৭৫২০ (১০০.০০)

www.pathagar.com

বছর	ছেলে	মেয়ে	উভয়
২০০০	৯১৯৬৫৮ (৬১.৭৯)	৫৬৮৬৫৫ (৩৮.২১)	১৪৮৮৩১৩ (১০০.০০)
২০০১	৮৯৪০৯৭ (৫৯.৯৯)	৫৯৬৪২৪ (৪০.০১)	১৪৯০৫২১ (১০০.০০)
২০০২	৯২৩৪৭৩ (৫৯.৪৮)	৬২৯২০৭ (৪০.৫২)	১৫৫২৬৮০ (১০০.০০)
১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০২ সালে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির হার	৪.১০	৬৬.৮০	২২.৮১

উৎস : BANBEIS ২০০৩

মাধ্যমিক শিক্ষা

সারণি ৮ এবং ৯ হতে দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোতে ভর্তির ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্যটি একেবারেই মুছে গেছে এবং উল্টোভাবে ছেলের বিপক্ষে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ব্যাপারে লিঙ্গবৈষম্য দূর হলেও স্কুলে উপস্থিতির ব্যাপারে এবং শিক্ষা সমাপনের ব্যাপারে লিঙ্গবৈষম্য দূর হয়নি। শতকরা প্রায় অর্ধেক ছাত্রীই শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না। দেখা গেছে SSC পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৫ জন হচ্ছে ছাত্রী। অথচ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তিকৃতদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৫৪ জন হচ্ছে ছাত্রী। আরও যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে তা হলো—পাসের ক্রমহ্রাসমান হার। দেখা গেছে ১৯৯৯ সালে পাসের হার ছিল প্রায় ৫৫ শতাংশ। ২০০৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ শতাংশে। এখানে প্রকাশ পাচ্ছে শিক্ষার গুণগত মানও কমছে। তবে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের পাসের হারই বেশি কমেছে।

সারণি ৮: মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে (ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী) ভর্তিকৃতদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা, ১৯৯৮-২০০২

বছর	ছেলে	মেয়ে	উভয়
১৯৯৮	৩৩০৪৩৩৬ (৪৮.৮২)	৩৪৬৪৭৪২ (৫১.১৮)	৬৭৬৯০৭৮ (১০০.০০)
১৯৯৯	৩৪৭৮১১৬ (৪৮.০৬)	৩৭৫৮৮২৩ (৫১.৯৪)	৭২৩৬৯৩৯ (১০০.০০)
২০০০	৩৬২৬৬৪৮ (৪৭.৪৩)	৪০২০২৩৭ (৫২.৫৭)	৭৬৪৬৮৮৫ (১০০.০০)
২০০১	৩৬৯০৯১৩ (৪৬.৮০)	৪১৯৬০৯৭ (৫৩.২০)	৭৮৮৭০১০ (১০০.০০)
২০০২	৩৮০১৩৫৬ (৪৬.৪৭)	৪৩৬০৭৭৮ (৫৩.৫৩)	৮১৬৬২১৩৪ (১০০.০০)
১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০২ সালে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার	১৫.০	২৫.৯	২০.৬

উৎস: BANBEIS ২০০৩

www.pathagar.com

সারণি ৯ : উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) ভর্তিকৃত ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা, ১৯৯৮-২০০২

বছর	ছেলে	মেয়ে	উভয়
১৯৯৮	১৪৯১৩২ (৫৪.৮৪)	১২২৭৮৫ (৪৫.১৬)	২৭১৯১৭ (১০০.০০)
১৯৯৯	১৮৩১৬৫ (৫২.৬৪)	১৬৪৮২১ (৪৭.৩৬)	৩৪৭৯৮৬ (১০০.০০)
২০০০	১৮৫৪৫৫ (৫২.২১)	১৬৯৭৬২ (৪৭.৭৯)	৩৫৫২১৭ (১০০.০০)
২০০১	১৬৩১৫২ (৪৯.৩৪)	১৬৭৫৩৪ (৫০.৬৬)	৩৩০৬৮৬ (১০০.০০)
২০০২	১৬৫৮৯৯ (৪৯.২২)	১৭১১৩৫ (৫০.৭৮)	৩৩৭০৩৪ (১০০.০০)
১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০২ সালে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার	১১.২	৩৯.৪	২৩.৯

উৎস : BANBEIS ২০০৩

উচ্চশিক্ষা

শিক্ষার স্তর যতই উর্ধ্বে উঠছে ততই লিঙ্গবৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ১০ হতে দেখা যাচ্ছে tertiary level-এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৯ শতাংশের একটু বেশি হচ্ছে ছাত্রী। উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষায় এই ফারাক আরও ব্যাপক (সারণি ১০)।

সারণি ১০: Tertiary level-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তিকৃত ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা, ১৯৯৮-২০০২

বছর	সাধারণ শিক্ষা			ফাজিল এবং কামিল মাদ্রাসা		
	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়
১৯৯৮	৯০৮০৮৫ (৬৪.২০)	৫০৬৩৭৭ (৩৫.৮০)	১৪১৪৪৬২ (১০০০.০০)	৬৭২৬৪ (৮৯.১০)	৮২২৯ (১০.৯০)	৭৫৪৯৩ (১০০.০০
১৯৯৯	৯৯২৮১৭ (৬২.০৫)	৬০৭১৪২ (৩৭.৯৫)	১৫৯৯৯৫৯ (১০০.০০)	৬৭৬৬৬৫ (৮৭.৮৫)	৯৩৫৮ (১২.১৫)	৭৭০২৩ (১০০.০০
২০০০	১০৩৯৪৬২ (৬০.২৪)	৬৮৬১৩৯ (৩৯.৭৬)	১৭২৫৬০১ (১০০.০০)	৬৯১১৫ (৮৭.৭৬)	৯৬৩৭ (১২.২৪)	৭৮৭৫২ (১০০.০০)
২০০১	৯৩৬৭২৮ (৬১.০৩)	৫৯৮১০৫ (৩৮.৯৭)	১৫৩৪৮৩৩ (১০০.০০)	৬৬৯৮৮ (৮৫.৯৫)	১০৯৪৮ (১৪.০৫)	৭৭৯৩৬ (১০০.০০)
২০০২	৯৫৫২৪২ (৬০.৮৯)	৬১৩৪২৯ (৩৯.১১)	১৫৬৮৬৭১ (১০০.০০)	৬৮৪১৩ (৮৫.৬২)	১১৪৯২ (১৪.৩৮)	৭৯৯০৫. (১০০.০০)
১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০২ সালে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার						

উৎস : BANBEIS ২০০

www.pathagar.com

খ. School curriculum এর লিঙ্গ সংবেদনশীলতা

আর একটি যে ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে তা হলো School curriculum। শিক্ষানীতি ২০০০-এ জোরালোভাবে উল্লেখ থাকলেও এখন পর্যন্ত School curriculum ঢেলে সাজানোর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ নারীর ক্ষমতায়ন অনেকটাই নির্ভর করছে একটি শক্তিশালী লিঙ্গ সংবেদনশীল School curriculum-এর ওপর। প্রথম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য সমাজবিজ্ঞান এবং বাংলা বই পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এই বইগুলোতে নারীকে তার সনাতনী রূপেই (যেমন মা, বোন, কন্যা, গৃহিণী) চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বইগুলোতে যে ছবিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ছেলেদের দেখানো হয়েছে কম্পিউটার ব্যবহার করছে, দূরবীন ব্যবহার করছে, মসজিদে নামাজ পড়ছে এবং পরস্পরকে কোলাকুলি করছে, কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করছে ইত্যাদি রূপে। আর মেয়েদের দেখানো হয়েছে রান্না করছে, ঘরের আঙ্গিনা পরিষ্কার করছে, বাসন ধুচ্ছে ইত্যাদি রূপে। যদিও স্কুলে যাওয়ার ছবিতে ছেলেমেয়ে উভয়কে একইভাবে দেখানো হয়েছে। স্বাধীনতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষদের কথা বলা হয়েছে জোরালোভাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্কুলের কোন পাঠ্যপুস্তকে বীরশ্রেষ্ঠ তারামন বিবির কথা তুলে ধরা হয়নি। সপ্তম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান বইয়ের একেবারে শেষ অধ্যায়ে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ সম্বন্ধীয় মতামতগুলো যে সত্যি নয় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। বইয়ের সর্বশেষে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই অধ্যায়টি প্রায়ই পাঠ থেকে বাদ পড়ে যায়। আর বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায়ে এই বিষয়টি তুলে ধরায় ছাত্রছাত্রীর মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এটি একটি প্রান্তিক বিষয়।

গ. নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ এবং তাদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপ্তি

শিক্ষা নারীকে শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য যথেষ্টভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারেনি। সারণি ১১ হতে দেখা যাচ্ছে নারীর শিক্ষার সঙ্গে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের একটি নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, নারীর শিক্ষা যত বাড়ছে বেকারত্বের হারও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষদের বেকারত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষা স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। তবে নারীর চাইতে অনেক কম হারে। শিক্ষা নারীর মজুরির হারও বৃদ্ধি করতে পারেনি। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গত ৭ বছরে গার্মেন্ট শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫% হারে। অথচ সেই সময়ে নারী গার্মেন্ট শ্রমিকের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। এই অতিরিক্ত তিনটি শিক্ষা বছরের জন্য তাদের বেতন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল ৩০ শতাংশ (প্রতি বছর শিক্ষার জন্য ১০ শতাংশ হারে)।

সারণি ১১: শিক্ষার স্তর অনুযায়ী নারী ও পুরুষদের বেকারত্বের হার ২০০২

শিক্ষার স্তর	ছেলে	মেয়ে	উভয়
কোন শিক্ষা নাই	৩.৪	৩.৬	৩.৪
I শ্রেণী হতে V শ্রেণী	৩.১	৪.৩	৩.৩

www.pathagar.com

শিক্ষার স্তর	ছেলে	মেয়ে	উভয়
VI শ্রেণী হতে VIII শ্রেণী	৩.৮	৪.৩	৩.৯
IX শ্রেণী হতে X শ্রেণী	৫.৭	৫.২	৫.৬
এসএসসি, এইচএসসি এবং সমমান	৭.০	১১.৭	৭.৮
বিএ এবং তার উর্ধ্বে	৮.১	১৭.৪	৯.৫
অন্যান্য	৮.৯	১৫.৭	৯.৬
সকল স্তরের শিক্ষা	৪.২	৪.৯	৪.৩

উৎস : Labour Force Survey, ২০০২-২০০৩

ঘ. নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন

প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করছে শিক্ষা নারীকে সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে পেরেছে যথেষ্টভাবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে শিক্ষাস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী নিম্নোক্ত বিষয়ে ক্ষমতায়িত হয়েছে

১. স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে;
২. বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে;
৩. গৃহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করেছে;
৪. সন্তানের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে;
৫. কোন বয়সে সন্তান গ্রহণ করবেন সেই সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে;
৬. কোন ছেলেকে বিয়ে করবে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার শক্তি অর্জন করেছে;
৭. এমনকি সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ সম্বন্ধীয় মতামত সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছে।

ঙ. রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন

শিক্ষা নারীকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে সহায়তা করেনি বললেই চলে। অথচ রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার জন্য শিক্ষা একটি শক্তিশালী উপাদান। দেখা গেছে, গত কয়েকটি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের হারে তেমন হেরফের হয়নি। অথচ গত কয়েক বছরে তাদের শিক্ষাস্তরে বেড়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে। অবশ্য ইউনিয়ন পরিষদের (সরকারি ব্যবস্থার চতুর্থ স্তরের মধ্যে সর্বশেষ স্তর) নির্বাচনে মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে। তবে এখানে শিক্ষার চাইতে নির্বাচন ব্যবস্থা[১], সরকারি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং অর্থবলই বেশি প্রভাবশালী ছিল। কেননা দেখা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশেরই শিক্ষা নেই। আরও দেখা গেছে নির্বাচনে শিক্ষিত মহিলা অশিক্ষিত মহিলার কাছে হেরে গেছেন।

১. এই ব্যবস্থায় নারীর জন্য বেশ কিছু আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এই আসনগুলিতে নারীর বিরুদ্ধে নারী প্রতিযোগিতা করে।

www.pathagar.com

চ. রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং উচ্চ পদের চাকরি গ্রহণের জন্য ক্ষমতায়ন

গত কয়েক বছর ধরেই দেখা গেছে কেবিনেটে যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ body সেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত নিম্ন এবং কেবিনেটে ২ হতে ৬ জন মহিলা মন্ত্রীর বেশি কোনদিনই অংশগ্রহণ করতে পারে নি। পার্লামেন্টেও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মহিলাদের অংশ অত্যন্ত স্বল্প। শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা উচ্চপদের চাকরিগুলোও গ্রহণ করতে পারেনি। এখন পর্যন্ত মাত্র একজন মহিলা সচিবের পদ গ্রহণ করতে পেরেছেন। গত পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডাইরেক্টর, ম্যানেজার ইত্যাদি উচ্চপদে মহিলাদের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২ শতাংশ। কিন্তু কেরাণী পদে বেড়েছে ১২ শতাংশেরও বেশি।

তাই দেখা যাচ্ছে, একমাত্র কিছু অংশে নারীদের সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা ছাড়া শিক্ষা নারীদের আর কোনভাবে বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারেনি ব্যাপকভাবে।

৬. নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় শিক্ষা বাজেটের অদক্ষতার পেছনে কারণসমূহ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় শিক্ষা বাজেটের অদক্ষতার পেছনে কারণ হিসেবে :

১. জাতীয় শিক্ষা বাজেটে নারীর potential কে স্বীকার করা হয় নি।

জাতীয় শিক্ষা বাজেটে নারীর potentialকে স্বীকার করা হয় নাই। তাই নারীকে ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়নি। দেখা হয়েছে জায়া, জননী এবং কন্যা হিসেবে। যার ফলে তার শিক্ষার জন্য যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো নারীকে দক্ষ শ্রমিক করার চাইতে বেশি করেছে দক্ষ মা এবং গৃহিণী। যেমন দেখা গেছে মেয়েদের যে ট্রেনিং দেওয়া হয় তা হলো ব্লক, বুটিক ও প্রিন্ট ইত্যাদির ওপর। আর ছেলেদের যে ট্রেনিং দেওয়া হয় তা হচ্ছে Computer, Electronics, Refrigeration, Airconditioning ইত্যাদির ওপর। গত পাঁচটি অর্থবছরের শিক্ষা বাজেটে মেয়েদের জন্য তিনটি পলিটেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রকল্পটির জন্য অর্থ ছাড় এবং এটির বাস্তবায়ন এত ধীর গতি ছিল যে, এখন পর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি।

২. বরাদ্দ, সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নীতির মধ্যে বিদ্যমান ফারাক

নীতি হচ্ছে নারীর মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার। এই জন্য শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হলো কেবল প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি এবং বৃত্তির জন্য। এই বরাদ্দ নারীর মধ্যে শিক্ষা অভাবের মাত্র একটি কারণ যা হলো দারিদ্র্য তা কিছু মাত্রায় দূর করল। যার জন্য নারী শিশুকে স্কুলে ভর্তি করতে পিতামাতার কোন অসুবিধা

www.pathagar.com

হয়নি। এজন্য স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ছেলেমেয়ের মধ্যে সমতাও অর্জন করা হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি এবং স্কুলের প্রতিটি গ্রেড সফলভাবে শেষ করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা যে একটি খুব বড় প্রতিবন্ধক তা নীতিনির্ধারকগণ অনুধাবন করতে খুব স্বল্পই সফল হয়েছেন। তাই মেয়েদের অধ্যয়নকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন সহায়ক ব্যবস্থা বাজেটে গ্রহণ করা হয়নি। যেমন শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান করে যদি মেয়েদের স্কুলে আসা যাওয়ার পথের নিরাপত্তাহীনতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত তাহলে মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতির হার অনেক বৃদ্ধি পেত। তা ছাড়া বাসস্থানের কাছাকাছি স্কুল থাকলেও তাদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেত। মাধ্যমিক স্তরের মেয়েরা adolesent বয়সের হয়। তাই বাংলাদেশের মত রক্ষণশীল সমাজে এই বয়সের মেয়েদের পক্ষে ছেলেদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করা বেশ কিছুটা অসুবিধাজনক। কিন্তু কেবল মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক স্তরের স্কুল স্থাপনের জন্য শিক্ষা বাজেটে বেতন বরাদ্দ রাখা হয় নি।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা বাজেটে কোন বরাদ্দই রাখা হয় নি। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের নিরাপদ বাসস্থানের অভাব দূর করার জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণের বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে আর এই বরাদ্দ রাখা হয়নি (পরিশিষ্ট-১)।

৩. লিঙ্গ সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে মেয়েদের জন্য কোন লক্ষ্য (Target) রাখা হয়নি।

এই সমীক্ষাটি থেকে দেখা গেছে গত পাঁচটি অর্থ বছরের শিক্ষা বাজেটে লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ৫৫ শতাংশ। কিন্তু এই প্রকল্পগুলোতে মেয়েদের জন্য কোন নির্দিষ্ট টার্গেট না থাকায় তারা এই প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ বৃদ্ধি হতে তেমন সুবিধা পাচ্ছে না। পুরুষের সমকক্ষ না হওয়ার কারণে নারীরা বহুক্ষেত্রেই নিজের অংশ বুঝে নিতে পারে না।

৪. কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণকে সহজ করার জন্য বাজেটে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারী যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তা তাকে লাভজনক পেশা গ্রহণ করতে তেমন সহায়তা করে নি। যার ফলে, শিক্ষা নারীকে অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট ক্ষমতায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে যে ধরনের শিক্ষার চাহিদা রয়েছে সে ধরনের শিক্ষা নারীরা পাননি। আজ বাংলাদেশের শ্রমবাজারে রয়েছে কারিগরী শিক্ষার চাহিদা। বিশেষ করে, পোশাক তৈরির উচ্চমানের দক্ষতার রয়েছে প্রচণ্ড চাহিদা। কেননা MFA পরবর্তী সময়ে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের দক্ষতা

www.pathagar.com

বৃদ্ধি করতে হবে প্রচণ্ডভাবে। বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের দক্ষতা তার প্রতিযোগী দেশগুলোর শ্রমিকদের চাইতে অনেক কম। অথচ আজ পর্যন্ত গার্মেন্টের ওপর কোন training শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়ন বাজেটে ঠাঁই পায়নি। অন্যান্য training -এও মেয়েদের প্রবেশকে সহজ করার জন্য কোন বাজেটারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যার ফলে সরকারি যে Vocational Instituteগুলো আছে তাতে ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ হচ্ছে নারী (সারণি ১২)। মেয়েদের জন্য আলাদা Vocational Training Institute না থাকার জন্য তাদের enrollment এত কম হয়েছে। কেননা সামাজিক রক্ষণশীলতা বিশেষ করে পর্দা প্রথার কারণে উঠতি বয়সের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুলে যেতে পারে না। Directorate of Technical Education মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোতে Vocational course এবং Computer course চালু করেছে। কিন্তু দেখা গেছে এই course ঢাকা শহরের কয়েকটি মহিলা বিদ্যালয় এবং কলেজ ছাড়া আর কোথাও কোন মহিলা বিদ্যালয় বা কলেজ চালু করা হয়নি।

সারণি ১২ : সরকারি এবং বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তিকৃত ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা

বছর	প্রতিষ্ঠানের ধরন						শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	
	সরকারি প্রতিষ্ঠান			বেসরকারি প্রতিষ্ঠান				
	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়	সরকারি	বেসরকারি
১৯৯৮	৩৭০০৪ (৮৯.৩৮)	৪৩৯৭ (১০.৬২)	৪১৪০১ (১০০.০০)	২২৬৯৬ (৬৯.৪৭)	৯৯৭২ (৩০.৫৩)	৩২৬৬৮ (১০০.০০)	১৪৪	৫১৬
১৯৯৯	৩৭১৩৪ (৮৭.৫৯)	৫২৬৩ (১২.৪১)	৪২৩৯৭ (১০০.০০)	৪৪৬১০ (৬৭.৯০)	২১০৯০ (৩২.১০)	৬৫৭০০ (১০০.০০)	১৪৩	৯৩৩
২০০০	৪০১১৬ (৮৮.০৭)	৫৪৩৪ (১১.৯৩)	৪৫৫৫০ (১০০.০০)	৪৭৮১৩ (৬৭.৮২)	২২৬৯২ (৩২.১৮)	৭০৫০৫	১৪৩	৯৯৪
২০০১	৪২৩৩২ (৮৭.৯২)	৫৮১৪ (১২.০৮)	৪৮১৪৬ (১০০.০০)	৫৬৩৭৯ (৬৭.৬৫)	২৬৯৫৬ (৩২.৩৫)	৮৩৩৩৫ (১০০.০০)	১৪৪	১২৭২
২০০২	৩৭৩১২ (৮৬.৯১)	৫৬২২ (১৩.০৯)	৪২৯৩৪ (১০০.০০)	৬২৫৪৫ (৬৮.৬৭)	২৮৫৩৭ (৩১.৩৩)	৯১০৮২ (১০০.০০)	১৫৭	১৪০৫
১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০২ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.০০	২৭.৮৬	৩.৭০	১৭৫.৫৮	১৮৭.১৭	১৭৯.৮১	৯.৭২	১৭২.২৮

উৎস : BANBEIS ২০০৩

গত ৫টি অর্থ বছরের বাজেটেই মেয়েদের জন্য তিনটি পলিটেকনিক স্কুল স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে এই প্রকল্পটিতে বরাদ্দ অত্যন্ত কম এবং প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক (Appendix Table)। তাই এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়নি। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে SSC/HSC

www.pathagar.com

(Vocational) and Business Management Female Stipend Project নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল revised budget-এ এই প্রকল্পের জন্য কোন বরাদ্দই রাখা হয়নি অথচ মেয়েদের skill level বাড়ানোর জন্য এই প্রকল্পটি দক্ষ ভূমিকা রাখতে পারতো। অবশ্য গত দুই বছরের বাজেটে Tax incentive দেওয়ার ফলে নারীদের জন্য বেশ কিছু IT স্কুল খোলা হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে যা নারীর দক্ষতা বাড়াতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

৫. Professional Education-এ মেয়েদের অতি সীমিত প্রবেশ

Professional Education একজনকে লাভজনক এবং উচ্চ পদের পেশা গ্রহণ করতে সহায়তা করে। কিন্তু এই শিক্ষায় নারীর প্রবেশ অত্যন্ত সীমিত (সারণি ১৩)। এই শিক্ষায় নারীর প্রবেশকে বাড়ানোর জন্য আজ পর্যন্ত কোন বাজেটারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। তবে দেখা গেছে নার্সিং স্কুলে মেয়েদের ভর্তির সংখ্যা খুব বেশি। তবে সমাজে nursing কে মেয়েদের profession বলে চিহ্নিত করা হয় বলেই ছেলেরা এই স্কুলে কম ভর্তি হয়। তবে নার্সিং স্কুল থেকে পাস করে একজন যা উপার্জন করবে তা BIT থেকে একজন পাস করে যা উপার্জন করবে তার কয়েকগুণ নিচে হবে।

সারণি ১৩ : প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত মোট ছাত্রদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে ছাত্রের অংশ

বছর	ছেলে এবং মেয়ে ছাত্রের অংশ							
	Professional Institutes							
	Bangladesh Institute of Technology		Textile Technology College		Nursing Training Institutes		Share in the Medical College	
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
১৯৯৮	৯৫.৩৩	৪.৬৭	৯৫.৭৯	৪.২১	৮.৫৮	৯১.৪২	৫৯.২০	৪০.৮০
১৯৯৯	৯৫.২৬	৪.৭৪	৯৪.৭৭	৫.২৩	৬.৬৮	৯৩.৩২	৫৬.২২	৪৩.৭৮
২০০০	৯৫.১৯	৪.৮১	৯৪.৮৩	৫.১৭	৬.৭৩	৯৩.২৭	৫৯.৫৫	৪০.৪৫
২০০১	৯৫.১২	৪.৮৮	৯৩.৭৮	৬.২২	৫.৩৩	৯৪.৬৭	৫৯.৫১	৪০.৪৯
২০০২	৯৫.০৪	৪.৯৬	৯৩.৭৯	৬.২১	৪.৭৪	৯৫.২৬	৫৮.৭৩	৪১.২৭

উৎস : BANBIS ২০০৩

৬. মেয়েরা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি গ্রহণ করে

বাংলাদেশ সরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু করেছে। কেননা দারিদ্র্যের কারণে এবং অন্যান্য নানা কারণে স্কুলের নিয়মমাফিক পাঠ গ্রহণে অনেকেরই অসুবিধা রয়েছে। দেখা গেছে, এই অসুবিধাগুলো মেয়েরাই বেশি ভোগ করে এবং এই কারণে তারাই অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি সংখ্যায় গ্রহণ করে। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়ায়। যার ফলে মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে অতি সীমিতভাবে প্রবেশ করতে পেরেছে। অথচ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের চাকরি একজনকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হতে বেশি সহায়তা করে।

৭. অধিক হারে মাদ্রাসা শিক্ষায় মেয়েদের প্রবেশ

বর্তমান প্রতিবেদনটির বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় গত কয়েক বছরে অন্যান্য শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষায়ও ছেলে-মেয়েদের ভর্তি বেড়েছে। তবে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অনেক বেশি হারে মাদ্রাসা শিক্ষায় ভর্তি বেড়েছে এবং ছেলেদের চাইতে মেয়েদের বৃদ্ধির হার কয়েকগুণ বেশি। কিন্তু দেখা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার মত একই হারে মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারে না। নারী গার্মেন্ট শ্রমিকদের মধ্যে একজনকেও পাওয়া যায় নি যে, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। অথচ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, গার্মেন্ট কারখানায় মেয়েরা পুরুষের চাইতে অনেক কম মজুরি পেলেও সেই মজুরি তার অন্যান্য সব কাজের মজুরির চাইতে বেশি। তাছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার cost এবং benefit বিশ্লেষণ করেও দেখা গেছে এই শিক্ষার মাধ্যমে যে আর্থিক benefit পাওয়া যায় তা এই শিক্ষার জন্য যে খরচ হয় তার চাইতে অনেক কম। সারণি ১৪ হতে দেখা যাচ্ছে স্কুল পর্যায়ে একজন ছাত্র/ছাত্রীকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্যয় হয় ৫০৮৪ টাকা। কিন্তু একই পর্যায়ে একজন ছাত্র/ছাত্রীকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্যয় হয় মাত্র ১১২৭ টাকা। মাদ্রাসা স্কুল হতে শিক্ষা সমাপন করে একজন মেয়ে মাসে ৫০০ টাকা বেতনের চাকুরিও পান না। কারণ তার চাকরির বাজার ভীষণ সীমিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েরা কোরান শিক্ষা দেওয়ার জন্য গৃহ শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োজিত হন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার স্কুল সমাপ্ত করে একজন মেয়ে যদি গার্মেন্টসে চাকরি গ্রহণ করে তবে তার মাসিক বেতন হবে ন্যূনতম ৯৫০ টাকা।

সারণি ১৪ : বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রপ্রতি (per student) খরচ, অর্থ বছর ১৯৯০/৯১-২০০২/০৩ (টাকায়)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	অর্থ বছর					
	১৯৯০-৯১	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯৯	৬৬৫	১০৩১	১০৫৫	১০৭৮	১১২৭
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৪০	২৬৫৮	৩২৮৮	৪২০৩	৪১৯৬	৪৫৫১
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৯৫২	২৭০৪	৪২৮৫	৪০৯৩	৪৩৪৮	৪৪৭০
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭০৬	৭০৭	৯৪০	১০১৭	১০৫০	১০৪৪
বেসরকারি কলেজ	৯০৩	১১৯৭	২১০৩	২৪৪৪	২৯৭১	৩১৮৫
সরকারি মাদ্রাসা	৪৬৩৯	৫০৭৫	৬২৫৯	৬৬০৮	৫০৬০	৫০৮৪
বেসরকারি মাদ্রাসা	৮৯৭	১১২৯	১১৪৬	১৩০৯	১৩২৩	১৩৩৯

উৎস : BANBEIS 2003

www.pathagar.com

৮. WID Focal Point দের অদক্ষতা

বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং কোন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প নারীর জন্য গ্রহণ করতে হবে তা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে যে পাঁচজন Focal Point আছেন তাদের। কিন্তু দেখা গেছে, শিক্ষা ক্ষেত্রের Focal Point-রা এ ব্যাপারে তেমন কোন কাজ করেন না। দেখা গেছে দু'একজন Focal Point জানেনই না যে, তাদের ওপর Focal Point-এর দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। কথা বলে জানা গেছে আগামী বাজেটে তারা চেষ্টা করবেন যাতে মেয়েদের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিকতা থাকে। তারা নারীকে ক্ষমাতায়িত করার জন্য অন্য কোন নতুন শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করছেন না।

৭. সুপারিশসমূহ

নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা বাজেটের অদক্ষতাকে দূর করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করা হচ্ছে :

১. একজন নারীকে একজন কন্যা জননী এবং গৃহিণী হিসেবে চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যক্তি হিসেবেও চিহ্নিত করতে হবে এবং ব্যক্তি নারীর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. মেয়েদের স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি এবং স্কুল পাঠ সম্পূর্ণভাবে শেষ করার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য নিম্নলিখিত বাজেটারি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

   ক. বেশি সংখ্যায় কেবল মেয়েদের জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।

   খ. মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য বাজেটে বরাদ্দ থাকতে হবে, যাতে মেয়েদের নিরাপদ এবং সস্তা পরিবহন সুবিধা প্রদান করা যায়।

   গ. মেয়েদের নিরাপদ বাসস্থান ব্যবস্থা প্রদানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ থাকতে হবে। বাজেটে বরাদ্দ রেখে প্রতিটি co-education স্কুল এবং কলেজে মেয়েদের জন্য টয়লেট এবং কমনরুম ইত্যাদি তৈরি করতে হবে।

৩. মেয়েদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, দক্ষতা শিক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। এই দক্ষতা যেন মেয়েদের লাভজনক চাকরি গ্রহণ করতে সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখা গেছে, মেয়েদের জন্য যদি আলাদা প্রশিক্ষণ স্কুল থাকে অথবা প্রশিক্ষণ স্কুলে যদি নারী শিক্ষক বেশি থাকে তাহলে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপনের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। কর উৎসাহ দিয়েও এই কাজটি করা যায়, যেমনটি করা হয়েছিল IT'র ক্ষেত্রে। SSC/HSC স্তরের মেয়েদের স্কুলগুলোতে Vocational course চালু করতে হবে।

www.pathagar.com

৪. শিক্ষা Curriculum বিশেষ করে স্কুলের শিক্ষা Curriculum লিঙ্গ সংবেদনশীল করতে হবে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে নারীর ভূমিকাও সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। গার্মেন্ট শিল্পে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণে মেয়েরা যে বিশাল ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে তা তুলে ধরতে হবে। প্রাথমিক স্তর হতেই স্বাধীনতা যুদ্ধে মেয়েরা কি ভূমিকা পালন করেছে তা তুলে ধরতে হবে।

৫. লিঙ্গ সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোতে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট Target রাখতে হবে।

৬. উচ্চ শিক্ষায় যেহেতু লিঙ্গ ফারাকটি অত্যন্ত বিস্তৃত সেহেতু এই ফারাকটি দূর করার জন্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল নারীকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়ন বাজেটে। যেমন উপবৃত্তি এবং বৃত্তি প্রকল্প, মেয়েদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি।

৭. শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত Focal Pointদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হবে। যাতে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ রাখতে পারে।

৮. মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা এই দুটি ব্যবস্থা সমান্তরালভাবে চলার প্রয়োজন আছে কিনা তা গবেষণা করে দেখার জন্য শিক্ষা বাজেটের technical assistance খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে।

References

1. Annual Development Programme, 2000-2001, 2001-02, 2002-03; 2003-04 and 2004-05, Planning Commission, Programming Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
2. Annual Financial Statement (Budget estimate), 2000-2001, 2001-02, 2002-03; 2003-04, Ministry of Finance, Finance Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
3. Budget in Brief (on the basis of existing taxes), Annual Budget, 2000-2001, 2001-02, 2002-03; 2003-04 and 2004-05 Ministry of Finance, Finance Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
4. BANBEIS 1998, 2003 Bangladesh Educational Statistics (at a glance), Bangladesh Burean of Educational Information and Statistic, Ministry of Education.
5. Diane Elson, 1997, Gender-neutral, Gender-blind, or Gender-sensitive Budget? Changing the conceptual Framework to include Women's Empowerment and the Economy of Care, Preparatory Country Mission to integrate Gender into National Budgetary Policies and Procedures, London, Commonwealth Secretariat.

www.pathagar.com

6. GOB 1997, Fifth Five-Year Plan, 1997-2002, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.
7. Paul-Majumder 2001, BNPS. Pratima Paul-Majumder, "Women's Share in the National Budget of Bangladesh", Bangladesh Nari Pragoti Sangha (BNPS). (a book in Bengali).
8. human et. al. 2001, Atiur Rahman, Pratima Paul-Majumder, Zulfikar Ali and Arifur Rahman, "Engendering National Budget : An Analysis of National Budget from the Perspective of Gender Equity", sponsored by Policy Leadership and Advocacy for Gender Equity (PLAGE), Ministry of Women and Children Affairs, Government of the peoples Republic of Bangladesh.
9. Paul-Majumder 2003: "Mainstreaming Gender Perspective in the Planning and Development Processes of the Economy with Special Emphasis on the "6th Five Year Plan": Transport and Communication Sectors. A position paper sponsored jointly by the Policy Leadership and Advocacy for Gender Equality (PLAGE) Project of the Ministry of Women and Children Affairs and the General Economics Division (GED) of Planning Commission, Ministry of Planning, Government of Bangladesh, 2003.
10. Paul-Majumder 2003a, BNPS: "Reflection of Women's Voice and National Gender Objectives in the National Budget of Bangladesh" a book published by Bangladesh Nari Pragoti Sangha (BNPS), 2003.

www.pathagar.com

শিক্ষা পরিকল্পনা ও নারী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

সালমা আখতার

১

যেকোন দেশেই মানব সম্পদ ও মানব পুঁজি তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও এর পরিকল্পনার ভূমিকা অদ্বিতীয়। মানব সম্পদ গঠনে নারী ও পুরুষের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়া হলে সে দেশের সঠিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়। নারী-পুরুষের মধ্যে যে সার্বিক বৈষম্য তার মাত্রাও কমে। উন্নয়নের সুফলগুলি সমাজে সমভাবে বণ্টিত হতে পারে। শিক্ষার পরিকল্পিত বিকাশের লক্ষ্যেই কোন দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে সাধারণ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে শিক্ষা পরিকল্পনা করে থাকে। আবার খাতওয়ারী বা শিক্ষাখাত ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দেশ স্বাধীন হবার পর এ পর্যন্ত পাঁচটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং শিক্ষা পরিকল্পনাও ঐ পাঁচটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্রে "Investing in people education" শীর্ষক অধ্যায় দারিদ্র্য বিমোচনের একটি রোড ম্যাপ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনাগুলিতে নারীর এবং মেয়েশিশুদের শিক্ষার জন্য কি কি সুযোগ ও কর্মসূচী নেয়া হয়েছে এবং নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কতদূর এগিয়েছে ঐসব পরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলে তা তুলে ধরে হল।

২

এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় নারীর স্থান নির্ণয়ের আগে পিছনের ইতিহাস ফিরে দেখা যাক। নারীর জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বালাই এবং এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন শুরুর আগে পর্যন্ত ছিলনা। ইংরেজ আমলে এদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষার পরিকল্পিত বিকাশ শুরু হয়েছে পলাশী যুদ্ধের একশত বছর পরে। তবে সে সময়ে নারী শিক্ষা বিস্তার, নারীদের মধ্যে নব-জাগরণ আনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার কোন উদ্যোগ লক্ষ করা যায়না। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা যার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অন্তর্ভূক্ত তার শুরু ইংরেজ শাসনের

www.pathagar.com

শেষার্ধে—১৯৪৪ সনে। সোভিয়েত মডেলে তৈরি শিক্ষা পরিকল্পনাতে (সার্জেন্ট প্ল্যান নামে পরিচিত) ৩-৬ বছর, ৬-১৪ বছর ও ১১-১৭ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল। মেয়েদের জন্য আলাদা কারিকুলামসহ আলাদা বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচীও ছিল।

সার্জেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়নের আগেই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৫-৭০) অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই পরিকল্পনাগুলিতেও মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ান, ঝরে পড়া রোধ ইত্যাদির জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল না কেবলমাত্র এ ধরনের বাক্য ছাড়া "provision of adequate facelities for the education of girls will receive attention" (২য় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৬০-৬৫)। মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও প্ল্যানে ছিল। সংগত কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানের মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে থাকলেও পরিকল্পনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এদেশে নারী শিক্ষার প্রসারে তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে শূন্যের কোঠা থেকে তৈরি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন বেশি হয়েছে ঐ সমস্ত অঞ্চলে। ফলে ১৯৪৭-৭০ পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা তথা শিক্ষা পরিকল্পনার জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক ছিল অনুক্ত।

৩

স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়ন সহগ করার লক্ষ্যে " সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা" এবং একই মানসম্পন্ন গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়। মেয়েশিশুকে এবং নারী শিক্ষার ওপর আলাদা গুরুত্ব প্রদানের সুপারিশ প্রথম শিক্ষা কমিশন রির্পোটে (১৯৭৪) এভাবে করা হয় :

'নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে। নারীদের শিক্ষাক্রম পরিবার ও সমাজের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকার পরিমান বাড়াতে হবে।

নারীদের প্রবণতার সাথে সংগতিপূর্ণ বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করা হবে।

প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের শিক্ষার সকলস্তরে ছেলে-মেয়েদের সমান অংশগ্রহণ ছাড়াও নারীদের শিক্ষার জন্য তাদের চাহিদাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পরিকল্পিত কর্মসূচীর সুপারিশ করা হয়েছে।

৪

এদেশে জাতীয়ভাবে প্রণীত শিক্ষা পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৭৩ সন থেকে যা প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) নামে পরিচিত। প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি নীতি হিসাবে গ্রহণ করে পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭৩ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৫টি পঞ্চ-বার্ষিক ও ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির প্রতিটিতে শিক্ষা আলাদা খাত হিসাবে পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে।

১৯৭৩ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এই খাতওয়ারী শিক্ষা পরিকল্পনাগুলিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন স্তরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমান ভাবে প্রাধান্য দেয়ার পরেও প্রতিটি পরিকল্পনাতে "নারী শিক্ষা"র উপর আলাদা অংশ বা পরিচ্ছেদ রয়েছে। যেমন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় "Female Education" (পৃ : ৪৭৯), দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় "Womens Education" (যথাক্রমে পৃ : XIV-34 ও ৩৫০), চতুর্থ পরিকল্পনাতে "Participation of Women" (পৃ : XV-30) এবং পঞ্চম পরিকল্পনাতে "Female Education" (পৃ : ৪৪১)। পরিকল্পনাগুলিতে এভাবে আলাদা পরিচ্ছেদ সংযোজন করা হলেও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নারী শিক্ষার জন্য আলাদা কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দে নজীর তেমন লক্ষণীয় নয় কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি ও স্কলারশিপ প্রদানের কর্মসূচী ছাড়া!

৫

স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭৩ সনে প্রণীত ৫ বছর মেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার "Female Education" অংশে এভাবে শুরু করা হয়েছে "Investment in The Education of Women provides a wide range of private and social benefits. There contribution towards rearing of children and management of household economy is significant. the level of schooling of women determines the efficiency of household management"(পৃ : ৪৭৯) তাছাড়াও বলা হয়েছে যে শিক্ষিত মায়েরা পরিবারের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিশুযত্নের ক্ষেত্রে অনেক বেশী মনোযোগী হবে, বিয়ের বয়স বাড়ানসহ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহী হবে, গৃহকর্ম ছাড়া বাড়ির বাইরে উৎপাদনশীল কাজের দক্ষতা বাড়বে ইত্যাদি। নারী শিক্ষার যেসব লক্ষ্যের ও প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ পরিকল্পনায় রয়েছে তাতে নারীদের চিরাচরিত ভূমিকাকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে উপলক্ষ্যগুলি কি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাকি নিরক্ষর নারীদের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য নির্ধারিত হয়েছিল? একথা পরিকল্পনায় বলা হয় নাই। এমনকি নারী শিক্ষার জন্য আলাদা কোন কর্মসূচী ও অর্থ বরাদ্দও ছিল না।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে (১৯৮০-৮৫) 'Womens education'-এ বলা হয়েছে "Islam treats men and women equally. Equality of partnership between men and women would be the guiding principle in all development activities of the country. Determined efforts are, therefore, to be made to provide expanded opportunities to women at all levels of education to bring them at par with men" পৃ :

www.pathagar.com

XVI-34). ধর্মের দোহাই টেনে নারী-পুরুষের সমতার ওপর জোর দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী তৈরি ও বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। "নারী—একজন মানুষ" এই সত্যটি, এখানে উপেক্ষিত রয়েছে। ৮০ এর দশকের পরিসংখ্যানে দেখা যায় এ সময় নারী সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৩.৭% প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা করা হয় তার মধ্যে ছিল (ক) মহিলা শিক্ষক নিয়োগ (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করা (গ) প্রাথমিক স্তরে স্কলারশিপ বা বৃত্তি দেয়া যা ৪০% মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট (ঘ) প্রাথমিক স্তরে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে "কোটা" চালু করা (ঙ) উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখা—প্রকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যা, কৃষি, চিকিৎসা, পুষ্টি বিজ্ঞান, ও কম্পিউটার বিজ্ঞানে মেয়েদের জন্য আসন সংখ্যা বাড়ান, (চ) শিক্ষা প্রশাসনে মহিলা প্রশাসকের সংখ্যা বাড়ান (ছ) মেয়েদের জন্য আলাদা পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন (জ) প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে আলাদা মেয়েদের জন্য কলেজ স্থাপন।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কর্মসূচীগুলি তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে অর্জনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) "Womenx's Education" অংশে বলা হয়েছে "The Government of Bangladesh recognized the in importance of the role of women in social-economic life. Necessary steps were taken under the SFYP to provide educational facilities and employment opportunities for women" (পৃ. ৩৫০)।

উক্ত প্রত্যয়ের আওতায় মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়ার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। তবে এ অংশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ দেখান হয় নাই।

বিশ্বজুড়ে নারীর সমঅধিকার এবং নারীবাদী আন্দোলনের ঢেউ বাংলাদেশেও লক্ষণীয়। নাইরোবী সম্মেলন এবং পরবর্তী সময়ে বেইজিং সম্মেলনের প্রভাব এদেশের শিক্ষা ও সামাজিক—অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকহারে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। অন্যান্য পরিকল্পনা সহ শিক্ষা পরিকল্পনাতেও Women in Development (WID) সূচক ব্যবহার হতে দেখা যায়। চতুর্থ ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা দুটিতে নারীশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার Spaceও কম লক্ষ করা যায়। চতুর্থ পরিকল্পনা দুই পৃষ্ঠা সম্বলিত 'Participation of Women' (পৃ : XV 23_24), এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় 'Female Education' (পৃ : ৪৪১) নামে স্বল্প পরিসরে আলোচনা রয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনাতে স্বীকার করা হয়েছে যে এখন পর্যন্ত 'শিক্ষার নানা স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ 'খুবই কম'। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রাথমিক স্তরে ৪৪%, ২৯% মাধ্যমিক স্তরে, ২০% বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রকৌশল ও অন্যান্য পেশাগত শিক্ষায় ৬-৭% মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল। পরিকল্পনা দুটি (১৯৯০-২০০২) সময়কালে মাধ্যমিক স্তরে গ্রামীণ বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুফ, উচ্চ-বৃত্তি চালু করা, বৃত্তি পেতে হলে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮-এ নির্ধারন করা, নারী

www.pathagar.com

শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। দাতা সংস্থাদের আর্থিক সহযোগিতায় উপবৃত্তি ও স্কলারশিপ প্রদান, বেতন মওকুফ মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের মাত্রা বাড়িয়েছে। ফলে মাধ্যমিকস্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছেলেদের ছাড়িয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও জেন্ডারপ্যারিটি অর্জনের কাছাকাছি রয়েছে বাংলাদেশ। পরিমানগত ভাবে মেয়েদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনভাবে ড্রপআউটের সংখ্যা কমছে না। দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, স্কুলে যাতায়াতের পথে নিরাপত্তাহীনতা এখনও অধিকাংশ মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের পথে বিরাট বাধা। প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি, মেয়েদের শিক্ষার সুফল সম্পর্কে পারিবারিক ও সামাজিক অসচেতনতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মনোভাব ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তনে শিক্ষা পরিকল্পনাগুলি নীরব!

দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রে "মানবউন্নয়ন" শিরোনামের আওতায় শিক্ষা অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে জেন্ডারভিত্তিক অংশগ্রহণের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। Policy Matrix-১৩ (পৃ. ২৩৯-৪১) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ভবিষ্যতে কি কি নীতি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির রূপরেখাও দেয়া হয়েছে। মাধ্যকি ও মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিকুলাম তৈরিতে "জেন্ডার ব্যালান্সড এ্যাপ্রোচ" গ্রহণসহ জেন্ডার সমতা আনয়ন, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের অংশগ্রহণ সমান হারে বাড়ানোর নীতি সুপারিশ করা হয়েছে। আগত বছরগুলোতে দেখা যাবে যে এই নীতিগুলো কতখানি বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ফলাফলই বা কি!

আশির দশক থেকে মানব উন্নয়ন সূচকে 'নারী উন্নয়ন' পরবর্তীতে জেন্ডার একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাতেও এর ছাপ লক্ষ করা যাচ্ছে। শিক্ষা পরিকল্পনাতেও এর প্রভাব লক্ষণীয় হতে হবে। কারিকুলাম থেকে শুরু করে পাঠ্যবই, বিষয়বস্তু, শিক্ষক প্রশিক্ষণে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন যেমন প্রয়োজন তেমনই নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসকদেরও জেন্ডার সচেতন হওয়া অত্যাবশ্যক। পরিকল্পনাগুলোতে কেবল জেন্ডার শব্দটি জুড়ে দিলেই নারী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর সমঅধিকার অর্জন সম্ভব হবে না। এ জন্যে প্রয়োজন বাস্তবায়ন যোগ্য নীতি নির্ধারণ, নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার আমূল পরিবর্তন, এবং সামাজিক চেতনা সৃষ্টি।

তথ্যউৎস

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪
২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১ম, ২য়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, Unlocking The Potential : National Stratedgy for Accelerated Poverty Reduction, ২০০৮।

www.pathagar.com

সাক্ষরতা ও নারী

কামরুন্নেসা বেগম

ভূমিকা

জাতীয় আদম শুমারীগুলিতে সাক্ষরতা পরিমাপের ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসাবে যে সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে : "একজন ব্যক্তি সাক্ষর যে তার প্রাত্যহিক জীবনের একটি ছোট ও সাধারণ বিবরণ বুঝে পড়তে ও লিখতে পারে"।

সাক্ষরতা সকল মানুষের জন্য একটি অধিকার। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার ঘোষণায় শিক্ষাকে সব মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং ঘোষণা করা হয়েছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হবে এবং উচ্চ শিক্ষায় মেধাভিত্তিতে সকলে অংশগ্রহণ করবে। এরপর থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাবলী বা কনভেনশনেও এই অধিকারের কথা বার বার বলা হয়েছে। পরবর্তীতে "নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ (১৯৭৯)" এবং "শিশুর অধিকার ১৯৯০" এ দুটি কনভেনশনে শিক্ষার অধিকার এবং নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সমতা অর্জন সম্পর্কে আইনগতভাবে প্রয়োগ করা যায় এমন সব ধারা/নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে ১৭৩টি দেশ "নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ" চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে তা দৃঢ়ভাবে অনুমোদন করেছে। এ কারণে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া সব দেশের সরকারের একটা নৈতিক দায়িত্ব। কোন দেশের কেউ যেন কোন অবস্থাতেই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু এখনও সারাবিশ্বে প্রায় ৮০ কোটিরও বেশি লোক এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। এবং এদের বেশির ভাগই নারী। বাংলাদেশেও পুরুষ অপেক্ষা নিরক্ষর নারীর সংখ্যা অনেক বেশি। শহর অপেক্ষা আবার গ্রামে নিরক্ষর নারীর সংখ্যা আরও বেশি। এখন পর্যন্ত কোন সমাজেই নারীরা পুরুষদের মত সমান সুবিধাদি ভোগ করে না। তাদের কাজে সময় দীর্ঘ কিন্তু বেতন কম। পুরুষদের তুলনায় তাদের জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা অনেক কম। এই বৈষম্যের কারণ হচ্ছে শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণে অসমতা বা জেন্ডার বৈষম্য।

www.pathagar.com

১৯৯০ সালে জমতিয়েন, *থ্যাইল্যান্ড*-এ এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার ওপর জোর বক্তব্য রাখা হয়। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এই ব্যবস্থা গ্রহণে জোর প্রচেষ্টা চালাবে বলে অঙ্গীকার করে। এরপর ডাকার, সেনেগাল এ ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত, বিশ্ব শিক্ষা ফোরামেও এই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এই সম্মেলনে শিক্ষা ও জেন্ডার বিষয়ে (বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে) নিম্নের ছয়টি উদ্দেশ্য গৃহীত হয় :

উদ্দেশ্য ১ : সমন্বিত প্রাক শৈশব যত্ন ও শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য

উদ্দেশ্য ২ : ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশু বিশেষ করে মেয়ে শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশু এবং সংখ্যালঘু শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সহ ভালমানের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য ৩ : সকল কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ শিক্ষা এবং জীবনদক্ষতা মূলক কর্মসূচিতে ভর্তির সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য ৪ : ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্কদের বিশেষ করে মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৫০% এ উন্নীতকরণ এবং মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় সব বয়স্কদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য ৫ : ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য পূর্ণ এবং সমান অধিকার সহ উন্নত মানের বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য ৬ : শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই গুণগত মানোন্নয়ন এবং সবাই যাতে সাক্ষরতা,হিসাব নিকাশ এবং দক্ষতা অর্জনে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য ৪ ও ৫ এ সুস্পষ্ট ভাবে শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন ২০০৬ সাল, তবু উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্য থেকে অনেক দেশই বহু পিছনে পড়ে আছে।

সাক্ষরতার সুফল

সাক্ষরতা সার্বিকভাবে মানুষের জীবনকে উন্নত করে। একজন সাক্ষর ব্যক্তি একজন সচেতন এবং আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন ব্যক্তি। সাক্ষরতা অর্জনের ফলে তার শক্তি ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, এবং এটা তার জীবনে চলার পথে একটি হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। কোন ব্যক্তি যেমন নিজের জীবনে এই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন তেমনি পরিবারে যৌথভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেও তিনি অধিক সক্ষম হন। মহিলাদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতা আরও বেশী সুফল বয়ে আনে।

অধিক পরিমাণে এবং উন্নত মানের নারী শিক্ষা সার্বিক শ্রম যোগানে ধনাত্মক প্রভাব ফেলে থাকে। যে সব মহিলা কৃষিকর্মে নিয়োজিত শিক্ষা তাদের কর্মউৎপাদন ক্ষমতা অনেক বাড়ায়। পারিবারিক আয় বাড়ে এবং দারিদ্র্য কমে। লেখাপড়া কিছুটা

www.pathagar.com

জানলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান হয়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের সম্ভাবনা বেশী থাকে। এই জ্ঞান তাদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের জন্ম দিতে পারে। যেমন অধিক সন্তান না নেওয়া, সুষ্ঠুভাবে পরিবারের কাজ করা এবং নিজ নিজ সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ এবং তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে তারা অধিক সক্ষম ও উৎসাহিত হয়। সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে মহিলাদের জড়তা কেটে যায়, এবং তারা ভাল করে কথা বলতে পারে এবং পারিবারিক নানা বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পুরুষদের পাশাপাশি তারা নানাপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতেও অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য অর্জন করে, এবং নিজেদের অনেক ব্যাপারে জেনেশুনে এবং জোরেশোরে মতামত প্রদানে সক্ষম হয়।

শিক্ষা মেয়েদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেয় যা দিয়ে সমাজের গতিধারা ও প্রকৃতি বোঝা যায় এবং তাকে প্রভাবান্বিত করা যায় এবং এভাবে মেয়েরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তারা রাজনীতিতেও অংশগ্রহণে সক্ষম হয়। মেয়েদের শিক্ষার অধিক বিনিয়োগ করা হলে তা তাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষিত হবার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

তাছাড়া, বর্তমান বিশ্ব যেভাবে জ্ঞানে বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যেভাবে নিত্য নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার হচ্ছে তাতে সাক্ষরতা ছাড়া এই সমাজে সুষ্ঠু ভাবে বাঁচার কোন উপায় নেই। এ কারণেই আগামী বছরগুলিতে নারী-পুরুষের সমতা অর্জন সরকার এবং সমাজের জন্য এক অবশ্য করণীয় এক চ্যালেঞ্জ।

পুরুষ-নারী উভয়ের সাক্ষরতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। সাক্ষরতা ব্যক্তির আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে যে, কৃষক শ্রমিক, নারী পুরুষ, যেই হোন না কেন লেখাপড়া জানলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সংসারের অন্যান্য কাজকর্মও তারা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় যে সাক্ষরতার দক্ষতা বাড়াতে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তা থেকে অনেক বেশী অর্থকরী প্রতিদান আসে। গবেষণায় এ-ও সুপারিশ করা হয়েছে যে টেকসই এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য যে কোন দেশে কমপক্ষে সাক্ষরতার হার ৪০% থাকা প্রয়োজন।

বিশ্বজুড়ে সাক্ষরতা পরিস্থিতি অতীত ও বর্তমান

পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ (৭৫%) নিরক্ষর লোকের বাস মাত্র ১২টি দেশে। যার মাঝে আটটি দেশ উচ্চ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের অন্তর্ভুক্ত। দেশগুলি হচ্ছে চীন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিল। এ দেশগুলি তথাকথিত ই-৯ দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আর যে চারটি দেশ রয়েছে (ই-৯ বহির্ভূত) সেগুলি হচ্ছে ইথিওপিয়া, ইরান, মরক্কো, এবং ডি আর কঙ্গো। এবার আর একটু হিসাব করলে দেখা যায় যে ভারত (৩৪.৬%), বাংলাদেশ (৬.৮%) এবং

www.pathagar.com

পাকিস্তানের (৬.২%) নিরক্ষর জনগণের সংখ্যা একত্র করলে তা দাঁড়ায় ৪৭.৬%। অর্থাৎ বিশ্বের নিরক্ষর জনগণের প্রায় অর্দ্ধেক বাস করে এই উপমহাদেশে।

বর্তমানে বিশ্বের ৮০% বয়স্ক লোক সাক্ষর। অথচ দেড়শত বৎসর পূর্বে বিশ্বের মাত্র ১০% বয়স্ক লোক সাক্ষর ছিল। এই বিস্ময়কর পরিবর্তন মানব সভ্যতার অগ্রগতিকেই তুলে ধরে। কিন্তু তবুও এখন পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ৮০ কোটি (১৮%) বয়স্ক ব্যক্তি নিরক্ষর। তারা এই সভ্য জগতে সাক্ষরতার দক্ষতাগুলি ছাড়াই জীবন যাপন করে এবং সাক্ষরতার সুফলগুলি থেকে তারা বঞ্চিত। তারা না পারে নিজের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে, না পারে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভালভাবে অংশগ্রহণ করতে। এদের অধিকাংশই নারী। নারীদের সাক্ষরতার হার ৬৪%। এইহার ১৯৯০ সাল থেকে একই রয়ে গেছে,এর কোন পরিবর্তন হয়নি। বিশ্বব্যাপী গড়ে প্রতি ১০০ জন সাক্ষর পুরুষের বিপরীতে ৮৮ জন সাক্ষর নারী রয়েছেন। যে সব অঞ্চলে জেন্ডার বৈষম্য বেশি সে সব অঞ্চল হচ্ছে দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া, আরব রাষ্ট্রসমূহ, এবং আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চল। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ বাস করে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, সাব-সাহারান আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলে। যে কোন অঞ্চলের চাইতে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় সাক্ষরতার হার সর্বাপেক্ষা কম (৫৯%)। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সাক্ষরতার হার খুব কম হওয়ার ফলে এটা হয়েছে। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৪১% এবং পাকিস্তানের ৪৮%। শতকরা ২০ ভাগের নিচে সাক্ষরতার হার যে সব দেশে রয়েছে সেগুলি হচ্ছে বুরকিনা ফাসো, নাইজার এবং মালি। ডাকার সম্মেলনে ২০০০ সালে গৃহীত উদ্দেশ্য "২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্কদের বিশেষ করে মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৫০% এ উন্নীতকরণ এবং মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় সব বয়স্কদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা" বাস্তবায়নের পথে আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া পিছিয়ে রয়েছে।

পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে দারিদ্র্যের সাথে নিরক্ষরতার এটি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। যে সব দেশে মাথাপিছু গড় আয় বেশি সেসব দেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার বেশি এবং যেখানে মাথাপিছু গড় আয় কম সেখানে সাক্ষরতার হার কম। নিচের সারণীতে এটা সুষ্ঠ ভাবে দেখা যাচ্ছে।

সারণী ... বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু গড় আয় এবং সাক্ষরতার হার

দেশ	বয়স্ক সাক্ষরতার হার	মাথা পিছু গড় জিডিপি আয় (ইউ এস ডলার)
মেক্সিকো	৯১.১	৮,৪৩০
মালয়েশিয়া	৮৮	৮,৭৫০
থাইল্যান্ড	৯৬	৬,৪০০
ব্রাজিল	৮৭	৭,৮৪০
ভারত	৫৮	২,৮৪০
বাংলাদেশ	৪১	১,৬১০

উৎস : ইউ এন ডি পি কর্তৃক প্রকাশিত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৫

www.pathagar.com

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে দেশে আয় যত বেশি সে দেশে সাক্ষরতার হারও তত বেশি। গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৬ প্রদত্ত এ তথ্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ, ভারত, ইথিওপিয়া, ঘানা, মোজাম্বিক, নেপাল এসব দেশে ৭৮% বা তারও বেশি জনসংখ্যার মাথা পিছু দৈনিক আয় ২ ডলারের কম। এসব দেশে সাক্ষরতার হার ৬৩% এর নিচে। এছাড়া একই দেশে দরিদ্র ও সম্পদশালী পরিবারের মধ্যে সাক্ষরতার উল্লেখযোগ্য ব্যবধান (৪০%) রয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান আরও প্রকট। জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ (যেমন স্বদেশীয় এবং প্রতিবন্ধী জনগণ) সাক্ষরতার সাধারণ কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে যায়। সুতরাং এদের সাক্ষরতার হারও অনেক কম। তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে এই হার বাড়ানো সম্ভব নয়।

সাক্ষরতার পরিমাপ পদ্ধতি

যে সব পদ্ধতিতে সাধারণত সাক্ষরতার মূল্যায়ন করা হয় তাতে সবসময় সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। মরক্কোতে একটি জরীপে উত্তরদাতাদের সাক্ষরতার হার ৪৫% পাওয়া যায়। এদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মৌলিক যোগ্যতা সমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে এই হার পাওয়া যায় মাত্র ৩৩%। ইথিওপিয়ার যে সব নারী এক বৎসর বিদ্যালয়ে গমন করেছে সাধারণভাবে মূল্যায়ন করে তাদের মধ্যে ৫৯% সাক্ষর পাওয়া গেছে। কিন্তু পড়তে পারার দক্ষতা পরীক্ষা নিয়ে দেখা যায় এই হার মাত্র ২৭%। একই ধরনের চিত্র বাংলাদেশ, নিকারাগুয়া এবং তাঞ্জানিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়। আদম শুমারীতে যে ভাবে তথ্য নেওয়া হয় সেভাবেই বিভিন্ন দেশের সাক্ষরতার হার দেখান হয়। প্রকৃতপক্ষে সাক্ষরতার এই হার আরও অনেক কম। সুতরাং বিভিন্ন দেশে জনগণকে সাক্ষর করে তোলা আরও বেশি কঠিন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৫০ বৎসর আগে পৃথিবীতে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১০% এখন যা বেড়ে হয়েছে ৮০%। এর পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণ। এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক স্কুল শিক্ষা সাক্ষরতা বিস্তারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে এবং ভবিষ্যতেও সাক্ষরতার বিস্তার এবং গুণগত মান উন্নয়ন অনেককাংশে নির্ভর করবে এর ওপর।

এছাড়া গণসাক্ষরতা অভিযানও সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উল্লেখ্য ১৯১৯-৩৯ এর শেষের দিকে রুশ প্রচারাভিযানের ফলে সেদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৩০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫% হয়। চীন এবং ভিয়েতনামে ১৯৪০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত সময়ে সাক্ষরতার হার অনেক বৃদ্ধি পায়। ইথিওপিয়ায় ১৯৭৯-৮৩ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় সাক্ষরতা প্রচারাভিযানে সাড়ে চার লাখ সাক্ষরতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার মাধ্যমে ২.২ কোটিরও বেশি মানুষ সাক্ষর হয়। থাইল্যান্ডে ১৯৪২-৪৫ সালে সফলতার সাথে কতকগুলি সাক্ষরতা অভিযান চালানো হয়। ব্রাজিলে বিশ শতকে ব্যাপক প্রচারাভিযান

www.pathagar.com

চালানো হয়। কিউবায় ১৯৬১ সালের দিকে এক বৎসরেরও কম সময়ের মাঝে ৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ সাক্ষর হয়। এভাবে আরও অনেক দেশে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনগণকে সফলতার সাথে সাক্ষর করে তোলা হয়।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে বয়স্ক জনগণের মাঝে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬% এর কাছাকাছি। পরবর্তীতে স্কুল শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে তা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে ৪১.৫% এ উন্নীত হয়েছে।

সারণী : ২ বাংলাদেশের পুরুষ ও নারীর সাক্ষরতার হার (১৫+বছর)

	১৯৮১(%)	১৯৯১(%)	১৯৯৫	২০০৫(%)
পুরুষ ও মহিলা	২৩.৮	৩৫.৩	৪৭.৩	৪১.৫
পুরুষ	৩১.০	৪৪.৩	৫৫.৬	৪৭
মহিলা	১৬.০	২৫.৮	৩৮.১	৪২.৫

উৎস : ইউনেস্কোর ২০০৫-এর হিসেব অনুযায়ি বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান (ব্যানবেইস), ২০০২, ১৯৮১, ১৯৯১, ১৯৯৫ এর জন্য)

সারণী : ৩ বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে পুরুষ ও নারীর সাক্ষরতার হার (১৫+বছর) ১৯৯৬

	অঞ্চল		
	জাতীয়	গ্রাম	শহর
পুরুষ ও মহিলা	৪৭.৩	৪৩.৮	৬৪.৪
পুরুষ	৫৫.৬	৫২.৬	৭২.২
মহিলা	৩১.১	৩৪.৬	৫৬.৮

উৎস : বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান (ব্যানবেইস), ১৯৯৮।

সারণী ২ এ দেখা যাচ্ছে যে ২৫ বছর সময়ে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে সাক্ষরতা হার মাত্র ১৭.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি হার ২৬.৫% এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬.০%। নারী সাক্ষরতার হার পুরুষদের থেকে ৯.৫% বেশি হলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় এই হার অত্যন্ত কম।* তবে সারা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত নারীরা পিছিয়ে রয়েছে।

শিক্ষায় নারীরা কেন পিছিয়ে রয়েছে?

এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার বাধা প্রধানত নিম্নের তিনটি উৎস থেকে উদ্ভূত :

---

* সাক্ষরতার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৩৪.৬ শতাংশ নারী সাক্ষর যা শহরের নারীদের চেয়ে ২০ শতাংশ কম। তাছাড়া গ্রামের নারীদের সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনের মাত্রা কম। ফলে সাক্ষর হলে সাক্ষরতার সুফল বাংলাদেশের গ্রামের নারীরা তেমন ভোগ করতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রথমত : পরিবার ও সমাজ, যেখানে মেয়েরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতেই বাঁধাপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত : ভর্তি হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে কারিকুলাম, বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, সামগ্রিক ভাবে শিখন পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষার অনুকূলে থাকে না।

তৃতীয়ত : লেখাপড়া শেখার পর কর্মক্ষেত্রে শিক্ষাকে কাজে লাগানোর কম সুযোগ রয়েছে মেয়েদের।

পরিবারই সিদ্ধান্ত নেয় কে বিদ্যালয়ে পড়তে যাবে, ছেলে, মেয়ে, না উভয়েই। বাবা মায়েরাই শিশুদের বড় নিয়োগকর্তা। সাংসারিক কাজকর্মে ছেলে অপেক্ষা মেয়েকে বেশি নিয়োজিত থাকতে হয়। এখানে এরকম ঘটনা দরিদ্র পরিবারেই বেশি ঘটে থাকে। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৫-১৪ বৎসর বয়সী শিশুদের ১৮% (২১ কোটি ১০ লক্ষের মতো) অর্থনৈতিক ভাবে কাজে নিয়োজিত। এদের অর্ধেক মেয়ে সাংসারিক কাজে নিয়োজিত। শিশুদের ধরলে এই সংখ্যা আরও বেশি হবে। সাংসারিক কাজে নিয়োজিত শিশুদের বাদ দিয়ে এক হিসাবে দেখা যায় এশিয়াতে শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা ১২ কোটি ৮০ লক্ষ, আফ্রিকাতে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ, এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে ১ কোটি ২০ লক্ষ।

যেসব সমাজে নারীরা গৃহে অন্তরীন থাকে সেসব স্থানে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে রয়েছে।

উত্তরাধিকার আইনে ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে এমন দেশসমূহে নারীদের জীবনের সুযোগ সীমিত সেখানে মেয়েরা শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে।

যে সব দেশে ছেলে শিশুর প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব করা হয় সেসব দেশ/অঞ্চল হচ্ছে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমুহ। এসব দেশ/অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের মাঝে বেশি পার্থক্য এবং মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের আর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া। এসব ঘটনা বেশি হয় নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে। এসব পরিবারে মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই সাংসারিক ছোটখাট কাজে সারাক্ষণই নিয়োজিত থাকে এবং বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।

কিভাবে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ হতে পারে?

ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত (২০০৬) রিপোর্টে নিম্নে বর্ণিত সুপারিশসমূহ এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যায়।

প্রথমত : সাক্ষরতার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য একটি দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রয়োজন। তারপর সরকারের পক্ষ থেকে একটি ত্রিমুখী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। যেমন

www.pathagar.com

- সকল শিশুর, বিশেষ করে সকল মেয়ে শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- যুবমহিলা ও যুবপুরুষ এবং বয়স্কদের সাক্ষরতার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা এবং
- নারী পুরুষ উভয়ের সাক্ষরতার অর্থপুর্ণ ব্যবহারের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এসব কাজে শিক্ষামন্ত্রনালয়কে নেতৃত্ব দিতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারের সর্বপ্রকার কর্মসূচির সাথে সাক্ষরতার সমন্বয় সাধন করা এবং এ ব্যাপারে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রন এবং সুষ্ঠুভাবে এসব কার্য পরিচালনা করা একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের পক্ষেই সম্ভব। এ ছাড়া, সুশীল সমাজ এবং পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই একমাত্র এসব সামাজিক কুপ্রথা ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব।

সফলভাবে সাক্ষরতা কর্মকাণ্ড উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থার মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত অপ্রয়োজন। বিভিন্ন ধর্মীয় দল, ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারি সংস্থাসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রচারমাধ্যম এবং স্থায়ী কর্তৃপক্ষ এসব সংস্থা যখন সহযোগিতার মাধ্যমে সাক্ষরতা উন্নয়নের জন্য কাজ করে তখনই তা সফল হতে পারে।

সাক্ষরতা উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য আরও যে সব বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে : বয়স্ক শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রনয়ণ, সময়সূচি নির্ধারণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান, এবং তাদের মর্যাদা দান, শিক্ষাদানে প্রযুক্তির ব্যবহার, শিখনের ভাষা ঠিক করা, এবং সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সারা বিশ্বে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়োজিত শিক্ষকদের তুলনামূলক বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রমে শিক্ষকদের বেতন খুবই কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের ১/৪ থেকে ১/২ বেতন দেওয়া হয়। এসব শিক্ষকদের বেতন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সাক্ষরতা কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে অনেক অগ্রগতি সম্ভব হবে। বহু দেশেই এখন রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচারের মাধ্যমে বয়স্ক মৌলিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এটা করা হয় তবে আরো অধিক পরিমানে এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। যে সব দেশে বহু ভাষা রয়েছে সে সব দেশে সাক্ষরতা বিরাট এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। কোন ভাষায় জনগণ প্রথমে লেখাপড়া শিখবে তা ঠিক করতে হবে, অফিসের ভাষা না শিখলে হবে না, স্কুলে পড়ানো হয় কোন ভাষায় ইত্যাদি নানা প্রকার সমস্যা রয়েছে এই সব দেশে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার ব্যবহার শিশুর জ্ঞানবিকাশের জন্য ইতিবাচক এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে পারলে অন্য ভাষায় শিখতে তার পক্ষে সহজ হয়। পাপুয়া নিউ গিনিতে মানুষ ৮০০ ভাষায় কথা বলে। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রথমে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করে এবং পরে ধীর গতিতে ইংরেজি শেখে।

www.pathagar.com

সাক্ষরতার পরিবেশ : শিখনকে প্রয়োগ করার সুযোগ

আন্তর্জাতিক শিখন জরিপে দেখা যায় যে একজন সাক্ষর ব্যক্তি যে পরিমান বইপত্র এবং খবরের কাগজ পড়ে, টেলিভিশন দেখে, লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করে তাদের সাক্ষরতা দক্ষতা সে পরিমানে উন্নত ও টেকসই হয়। সাক্ষরতার পরিবেশের সঙ্গে সাক্ষরতার দক্ষতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যাদের বাড়িতে অনেক বই থাকে,বাড়ির অন্যান্য সদস্যগণ লেখাপড়া জানেন, নিকটবর্তীস্থানে লাইব্রেরি আছে সে সব ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষরতা বজায় রাখা স্বাভাবিক। দক্ষিণ আফ্রিকার কনসর্টিয়ামে শিক্ষার গুণগত মান পরীবিক্ষণে দেখা যায় যে, সেখানে ৭০% শিক্ষার্থীদের বাড়িতে ১০টিরও কম বই রয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং বাংলাদেশেও এরকম গবেষণা করে দেখা দরকার যে এখানে প্রাথমিক পর্যায়ে শতকরা কতজন শিক্ষার্থীদের বাড়িতে ১০টি বই রয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মাত্র ২০% থেকে ৪০% বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি রয়েছে। পুস্তক প্রকাশনা, পুস্তক প্রাপ্যতা, এবং প্রচার মাধ্যম সাক্ষরতার পরিবেশকে অনেক উন্নত করে এবং শিক্ষিত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাক্ষরতার জন্য সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন

বেশির ভাগ সাক্ষরতা কার্যক্রমের মেয়াদ ২ বৎসরে গড়ে ৩০০-৪০০ ঘন্টা। কিন্তু একশন এইড এবং গ্লোবাল ক্যাম্পেন ফর এডুকেশন-এর একটি সমীক্ষায় সুপারিশ রয়েছে যে সাক্ষরতাকে ধরে রাখতে হলে কমপক্ষে ৬০০ ঘন্টা প্রয়োজন, যা সপ্তাহে দুই সেশনে দেওয়া হবে এবং প্রতি সেশনে ২-৩ ঘন্টা সময় থাকবে।

সাক্ষরতার জন্য অধিক অর্থায়নের প্রয়োজন

সাক্ষরতার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ জাতীয় অর্থায়ন কৌশল। এক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই আরও অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। স্থানীয় সম্পদ আহরণ করা কলাকৌশল বের করতে হবে যাতে কোন ব্যক্তি অর্থের কারণে সাক্ষরতা কার্যক্রম থেকে বাদ না পড়ে। সরকারি, বেসরকারি, এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সাক্ষরতা উন্নয়ন কাজে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট অনেক কম। এসব দেশে সাক্ষরতা কার্যক্রমের জন্য সমগ্র জাতীয় বাজেটের মাত্র ১% রাখা হয়। ফলে এসব দেশে সাক্ষরতার কার্যক্রম ঠিকমত চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট, ২০০৬-এ এক হিসাবে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক ভাবে ডাকার সম্মেলনে গৃহীত সাক্ষরতা লক্ষ্যে পৌছুতে হলে ২০১৫ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে ৫৫০ মিলিয়ন (৫৫ কোটি)-এরও বেশি বয়স্ক জনগণের জন্য ৪০০ ঘন্টার সাক্ষরতা

www.pathagar.com

কার্যক্রম সমাপ্তির উদ্দেশ্যে ২৬ বিলিয়ন (২৬০০ কোটি) ইউ এস ডলারের প্রয়োজন। এই তথ্য অনুযায়ী একটু হিসাব করলেই দেখা যায় যে প্রতি একজন বয়স্ক লোককে সাক্ষর করে তুলতে লাগে ৪৭.২৭ ডলার। বাংলাদেশে টাকার হিসাবে দাঁড়ায় ৩২৬১.৬৩ পয়সা। প্রয়োজনীয় অর্থ ও তার সদ্ব্যবহার, নিরক্ষরতা বিশেষ করে নারীদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার সহ বিভিন্ন সংস্থার একনিষ্ঠ ও নিরলস কার্যক্রম বাংলদেশে নারী সাক্ষরতার হারকে আগামীতে অনেক এগিয়ে নিতে পারে।

তথ্য উৎস

১. জেন্ডার এবং সবার জন্য শিক্ষা : সমতার দিকে ধাবমান,—ইউনেস্কো গ্লোবাল মনিটরিং রির্পোট, ২০০৩/৪ (অনুবাদ) ইউনেস্কো, ঢাকা, ২০০৪
২. জীবনের জন্য সাক্ষরতা (সার সংক্ষেপ), ইউনেস্কো গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট, ২০০৬ (বাংলা অনুবাদ) ইউনেস্কো, ঢাকা, ২০০৬

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা
পটভূমি, বর্তমান চিত্র ও নারীর অবস্থান

আবুল মোমেন

০১. ভূমিকা

উপমহাদেশে আফগান-ইরান-তুরান-আরব ও মধ্য এশীয় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম শাসক-সেনাপতি-ধর্মপ্রচারক-বণিক-ভাগ্যান্বেষীদের আগমন ও অভিবাসন শুরু হলে এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার ঘটে ও মুসলিম জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হতে থাকে।[১] একই সাথে শুরু হয় মুসলিমদের আনীত সংস্কৃতির এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার। এর সূত্রপাত হয় পশ্চিম ভারতে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আর পূর্ব ভারতসহ সমগ্র উপমহাদেশে মোটামুটি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে।[২] ইসলামের প্রথম যুগে নবী ও খলিফাদের আমল থেকেই মূলত মসজিদকে কেন্দ্র করে কোরান পাঠ, নীতি শিক্ষা, আচার-আচরণ ইত্যাদি শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। পরবর্তীকালে কোরান ও হাদিস পাঠ ও চর্চা, ইসলামী আদর্শ ও নীতি শিক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত জ্ঞান, নবীর জীবন ও জীবনাদর্শ শিক্ষা, জাগতিক বিষয় সম্পর্কিত নিয়ম ও ব্যাখ্যা, পারলৌকিক জীবন সম্পর্কিত ধ্যানধারণা ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এটিই শিশু পর্যায়ে মক্তব ও সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষা হিসেবে চালু হয়েছে।

পশ্চিম ভারত, দিল্লি আগ্রাসহ উত্তর ভারত, বঙ্গ ও পূর্ব ভারতে ইসলামের প্রসার ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিস্তৃতির ফলে ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করে। হিন্দু ঐতিহ্যে যেমন টোল-চতুষ্পাঠী ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র ও মন্দির বা গুরুকেন্দ্রিক চর্চাকেন্দ্র গড়ে উঠতে দেখা গেছে তেমনি মুসলিম সমাজেও মূলত মসজিদ বা পীরকেন্দ্রিক ধর্মশিক্ষা ও চর্চাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। মক্তবের শিক্ষা মূলত কোরান পাঠ, হাদিস শিক্ষা ও আচার-আচরণসহ নীতিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকে। পীর-সুফীদের কেন্দ্র করে সাধারণত বিভিন্ন ধারার সাধনভজনের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে।

www.pathagar.com

সম্ভবত ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম ভারতের (বর্তমান পাকিস্তানের) মুলতানে নাসিরুদ্দীন কাবাচা মাদ্রাসা ফিরুজী প্রতিষ্ঠা করেন, যা ধারণা করা হয়, উপমহাদেশের প্রথম সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসা।[৩] নাসিরুদ্দীন কাবাচা ছিলেন কুতুবুদ্দীন আয়বক নিয়োজিত মুলতান ও উচার প্রশাসক। বাংলায় অবশ্য ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির নদীয়া বিজয়ের পর মাদ্রাসা ও অন্যান্য ইসলামী শিক্ষা ও চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রসার ঘটে। তবে এর আগেও মুসলিম ধর্মপ্রচারক, সুফী সাধক ও বণিকগণ বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এসেছেন ও ইসলাম প্রচার ও চর্চা করেছেন।

আগেই আমরা বলেছি মুসলিম সমাজে মসজিদভিত্তিক মক্তব ও সমাজভিত্তিক মাদ্রাসার বিস্তার ঘটে। তবে রীতিবদ্ধ পদ্ধতিতে আজ যে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা দেশে চালু রয়েছে উপমহাদেশে তার সূত্রপাতও, মূলধারার ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষার মতই, ইংরেজ আমলে। তৎকালীন মুসলিম নেতৃবর্গের তাগিদে এবং ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংসের আগ্রহে ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা চালু হয়।[৪] ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দেই এটি পরিচালনার সমুদয় দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। মক্তব ও মাদ্রাসা এতকাল চলছিল অনেকটা টোল ও চতুষ্পাঠীর আদলেই, ধর্ম ও ধর্মীয় ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে তবে ইংরেজ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে খুশি করার উদ্দেশ্যে প্রথমে কলকাতা মাদ্রাসা ও পরে ১৭৯১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। একে তারা বলেছে Oriental school of education policy.

কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য স্বয়ং এর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড হেস্টিংস-এর ভাষায়, 'To conciliate the Mohamedans of Calcutta ... to qualify the sons of Mohamedan gentlemen for responsible and lucrative offices in the state, and to produce competent officers for courts of justice to which students of the Madrasah on the production of certificates of qualifications were to be drafted as vacancies occurred (A. Howell Education in India P. 1)'

এ ধরনের মনোভাবকে শিক্ষা বা ধর্ম যেকোন অবস্থান থেকেই নৈতিক ভিত্তি দেয়া কঠিন। কারণ এর উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক তা বিন্দুমাত্র ঢাকা পড়েনি। প্রাচ্যনীতির প্রবক্তারা মনে করতেন কোম্পানির একমাত্র কর্তব্য হল হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংস্কৃত ও আরবি ভাষার মাধ্যমে সম্প্রদায় ভিত্তিতে শিক্ষার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পথ অনুসরণ করা। এতে প্রজাদের শাসন ও শোষণ করা সহজ হবে— এটাই হল সহজ হিসেব।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য এই হিসেব টেকেনি। প্রথমে চার্লস গ্র্যান্টের ১৭৯২ সালের দলিল 'Observation on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain' এর ভিত্তিতে রচিত ১৮১৩ সালের চার্টারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা এবং পরে লর্ড মেকলের ১৮৩৫ সালের বিখ্যাত শিক্ষানীতি ক্রমশ পাশ্চাত্য জ্ঞানও ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলে। মেকলে তো কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ বন্ধ এবং আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক আনুকূল্য

www.pathagar.com

দান বন্ধের সুপারিশ করেন। শেষোক্ত সুপারিশ গৃহীত হলেও প্রথমোক্তটি অবশ্য গৃহীত হয়নি। উভয় প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থাসহ আধুনিকায়নের জন্যে নানা সংস্কার হয়।

এরই সূত্র ধরে ১৯০৭-৮ সালে তদানীন্তন জনশিক্ষা পরিচালক আর্চডেল আর্ল-এর নেতৃত্বে গঠিত বিখ্যাত 'আর্ল কমিটি', তারপর ১৯৪১ সালের 'নাথান কমিটি' মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তনের সুপারিশ করে। ১৯১৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে নিউ স্কিম ব্যবস্থা সর্বত্র চালু হয়। এর বড় বৈশিষ্ট্য হল (১) ফারসি ভাষা বর্জন এবং (২) ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা। এই পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি, অংকন, হাতের কাজ এবং ড্রিল অন্তর্ভুক্ত হয়। এই মূল কাঠামোর ওপর পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে আরও কাটছাঁট, সংস্কার পরিবর্তন হয়েছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক যুগোপযোগী বিষয় ও ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা থেকেই এ পরিবর্তন।[৫]

তবে এখানে একথাও বলা দরকার যে, সরকার পরিচালিত মাদ্রাসার সংখ্যা বরাবর খুবই স্বল্প। সিংহভাগ মাদ্রাসা এবং সকল মক্তব বেসরকারিভাবেই পরিচালিত হয়। ইংরেজি ভাষা ও বিভিন্ন আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সকল মক্তব মাদ্রাসার পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের দিক থেকে মূল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ধর্ম শিক্ষার ওপর। প্রায় দু'শ' বছরের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব, যেমন মীর মশাররফ হোসেন, আমির আলী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আকরাম খান, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, মনসুর উদ্দিন, ড. এনামুল হক, আবুল ফজল প্রমুখ ব্যতীত ধর্মীয় জ্ঞানে প্রাজ্ঞ এবং সৃজনশীল চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত স্থবির ও সংকীর্ণ মানসিকতার ধর্মীয় ভাবাবেগপ্রবণ ব্যক্তিরই সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের উল্লেখযোগ্য অর্জন-ভূমিকার পিছনে মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান কতটুকু আর অন্যান্য উপাদান-অনুষঙ্গের ভূমিকা কতটা তাও নিশ্চয় বিবেচনার বিষয়। এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় রাজনীতি ও মানবধর্ম, সাহিত্য ও সৃজনশীল কর্ম এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা ও এ জাতীয় অন্য কোন উচ্চ-প্রণোদনায়ই তাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথাবদ্ধ গণ্ডি ভেঙে বেরিয়েছেন। তদুপরি রাজনৈতিক অঙ্গনের ক্রমবর্ধমান ধর্মসাম্প্রদায়িক বিভাজন ও উত্তেজনার প্রভাব—দেওবন্দ বা লখনৌর মত ঐতিহ্যবাহী ইসলামী উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রকে একতরফা প্রভাবিত না করলেও সাধারণভাবে মাদ্রাসায় পড়েছে। ফলে মাদ্রাসা কেবল যথাযথ ধর্মশিক্ষা দানেই ব্যর্থ হয়নি, তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আবহে অনেকাংশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াজাত সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় উগ্রতা বা জঙ্গি উত্তেজনাকে লালন করেছে। মাদ্রাসার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ে আমরা পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

০২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষানীতি ও মাদ্রাসা শিক্ষা

তার আগে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারি নীতির প্রেক্ষাপটটি আলোচনায় আনব। এদেশে বিভিন্ন সময়ে সরকারসমূহ শিক্ষা সম্পর্কে নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের

www.pathagar.com

জন্যে বিভিন্ন কমিটি বা কমিশন গঠন করেছে। এরও সূত্রপাত অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বৃটিশ আমল থেকে। ১৭৯২ সালের চার্লস গ্র্যান্টের শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশমালা, ১৮৩৫ সালের মেকলের শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন, ১৮৩৮ সালের উইলিয়াম অ্যাডামসের শিক্ষা বিষয়ক জরিপ, ১৮৫৭ সালের চার্লস উডের শিক্ষা বিষয়ক ডেসপ্যাচ, ১৮৮২ সালের উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বাধীন প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এবং ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯১৪ সালের নাথান রিপোর্ট ইত্যাদির ভিত্তিতে বৃটিশ শিক্ষা নীতি প্রণীত ও তার সংস্কার হয়। পাকিস্তানে প্রথমে শিক্ষা সম্মেলন হয় ১৯৪৭ সালে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিল এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে দেশে প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজ দক্ষতার সাথে চালানোর উপযোগী একটি এলিট শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং দেশবিভাগজনিত সৃষ্ট শূন্যতা দূর হয়।[৬] তবে ১৯৫২ সালে মৌলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে যে শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হয় তা থেকে মুসলিম জাত্যাভিমানভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়। এর পরে ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশন, ১৯৬৬ সালের জাস্টিস হামুদুর রহমান কমিশন এবং ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন নূর খান কমিশন সামান্য হেরফের ব্যতীত মৌলিকভাবে একই।[৭] একদিকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমিত রাখা হয়, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী তৈরির ব্যবস্থা রাখা হয় এবং অন্যদিকে সর্বত্র ও পৃথকভাবে মাদ্রাসায়, মুসলিম ধর্মসাম্প্রদায়িক জাতীয়তার চেতনা বিস্তারের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ভাষা সংস্কার, প্রথম শ্রেণী থেকে আরবি ভাষা শিক্ষা, মুসলিম জাত্যাভিমানভিত্তিক কৃত্রিম পাকিস্তানি জাতীয় কৃষ্টি চাপানোর চেষ্টা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উৎসব প্রচলন ইত্যাদির মাধ্যমে এই চেষ্টা জোরদার হয়।

ইসলামী শিক্ষা সংস্কারের জন্যেও বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯০৬ সালের মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন এবং ১৯০৯ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটিও মাদ্রাসা শিক্ষার সেক্যুলারাইজেশনের কথা বলেন। ১৯১৪ সালে সরকার এ সুপারিশ অনুমোদন করলেও ১৯২৫ সনেও দেখা যাচ্ছে অবস্থা নৈরাশ্যজনক। ১৯২৬-এ পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, প্রাথমিক স্তর থেকে ড্রপ আউটের হার শতকরা ৫০ এর বেশি। ১৯৩১-৩৪ এ মুসলিম শিক্ষা পরামর্শ পর্ষদ প্রণীত মোমেন কমিটির প্রতিবেদনে অন্যতম সদস্য ড. মাহমুদ হাসান ভিন্নমত পোষণ করে লিখেছিলেন যে, প্রাইমারি স্কুল পরিহার করে মক্তব রাখা শিক্ষায় পিছিয়ে যাওয়া একই কথা। সৈয়দ আমীর আলী মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে অনুরূপ মতামত দিয়েছেন। মওলা বখশের নেতৃত্বাধীন মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি ১৯৩৮ কাজ শুরু করে ১৯৪১ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ঐ কমিটিতে ভিন্নমত পোষণ করে মৌ. মোজাম্মেল হক বলেছিলেন যে, গত একশ বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু বিশেষ ফল পাওয়া যায় নি। তাঁর মতে এখনও পর্যন্ত বাদশাহ আলমগীরের সময়কার পাঠ্যক্রম চলছে। তিনি সেক্যুলার ও মাদ্রাসা শিক্ষা হাত ধরাধরি করে চলা উচিত বলে মনে করেন। বরাবর রক্ষণশীল পক্ষ এসব সংস্কার ও আধুনিকায়নের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করেছে। ১৯৪৭ সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেনের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে গঠিত মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটিতেও সেক্যুলার বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।[৮] এভাবে দেখা যায়, ইংরেজ আমলে নিউ স্কিম পদ্ধতিতে যেটুকু সংস্কার হয় তারপর বস্তুত মাঝেমাঝে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম আরবি বা উর্দু করার প্রয়াস, সেক্যুলার বিষয়ের পরিবর্তে ইসলামী বিষয়ে পাঠ সীমাবদ্ধ রাখার উদ্যোগে এই শিক্ষা চরম বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার শিকার হয়।

বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন কীভাবে হবে সে বিষয়ে শাসকবর্গ, এমনকি শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদেরও মনে সংশয় ছিল। আমাদের সংবিধানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে সকলের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হলেও এবং ধনী-দরিদ্র ও নারী-পুরুষের জন্যে অভিন্ন শিক্ষার অঙ্গীকার থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন কখনও ঘটেনি। সংবিধানের প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলো এখানে উল্লেখ করা যায় :

- Steps shall be taken to ensure participation of women in all spheres of national life. (Article 8 of part II).
- The state shall adopt effective measures for the purpose— (a) establishing a uniform, mass-oriented and universal system of education and extending free and compulsory education to all children to such stage as may be determined by law. (Article 17 of part II).
- The state shall endeavour to ensure equality of opportuniy to all citizens. (Clause (1) of Article 19)
- Women shall have equal rights with men in all spheres of the state and public life. (Clause (2) Article 28 of part III)

এমনকি ১৯৭৪ সালে গঠিত ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশগুলোকেও যুগোপযোগী বাংলাদেশের ঘোষিত রাষ্ট্রীয় নীতির যথাযথ রূপায়ণ বলা যায় না। তবে দুর্ভাগ্য হচ্ছে দেশ সামরিক শাসনের আওতায় আসার পর রাষ্ট্রীয় নীতিতে পাকিস্তানি ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে, তার প্রয়োগ ঘটতে থাকে। সামরিক শাসনামলে ১৯৮৩ ড. মজিদ খানের নেতৃত্বে ও ১৯৮৭ অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে দুটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। বলা দরকার যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে কোন শিক্ষা কমিশন বা কমিটির প্রণীত নীতিমালা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ও কার্যকর করা হয়নি। এসব কমিশনে, বিশেষ করে সর্বশেষ মফিজ উদ্দিন কমিশনে আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রকাশ দেখা গেছে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা বৃটিশ প্রবর্তিত ধারাতেই অব্যাহত রয়েছে—তার রক্ষণশীলতা, সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টির বিভাজন-নীতি সংরক্ষণ ছাড়াও অকার্যকর ও অনুপযোগী প্রমাণিত মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখার মাধ্যমে। এমনকি এ ব্যবস্থা উত্তোরোত্তর জোরদার করার প্রবণতাই লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ধারার

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী এবং এমনকি ইউনিসেফের মতো প্রতিষ্ঠানকেও শরিক হতে দেখা যায়।

সাধারণভাবে শিক্ষা সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের সচেতন অংশও যে যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী নয় তা বোঝা যায় গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিক, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ধনী যখন নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নির্বিচারে সাগ্রহে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার চেয়ে অগ্রাধিকার দেন।

০৩. বর্তমান সরকারি নীতি এবং ধর্মীয় ভাবধারাপুষ্ট শিক্ষা

বর্তমান সরকারি নীতিও স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষে। ধর্মীয় ও আরবি শিক্ষার পাশাপাশি এখানে ইংরেজি, বাংলা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ বিষয় আরও ফলপ্রসূভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করে এর কার্যকারিতা ও যৌক্তিকতা বৃদ্ধির প্রয়াস দেখা যায়। ক্রমশ মাদ্রাসা, মক্তব ছাড়াও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ব্যক্তিত্বকে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত বেসরকারি মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা জোরদার করার জন্যে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার গৃহীত কর্মসূচি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২০০ বেসরকারি মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে উন্নত বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির তহবিল জোগায়। ইউনিসেফ প্রতিবেদনেও দেখা যায় আধুনিকায়নের শর্তসহ মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তারের প্রতিই জোর দেওয়া হয়েছে। চলতি বাজেটে (৯৫-৯৬) প্রস্তাবিত বরাদ্দে মাদ্রাসার জন্য রয়েছে ২০২ কোটি টাকা। দুই বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৬ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা ১৫ শতাংশ, বেসরকারি স্কুল-কলেজের ক্ষেত্রে তা শূন্য, অর্থাৎ বরাদ্দ সমান রয়ে গেছে। তদুপরি বেসরকারি স্কুল-কলেজে ছাত্রসংখ্যা বহু বেশি হলেও প্রতিষ্ঠানপিছু সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে বেসরকারি মাদ্রাসার চেয়ে তারা পাচ্ছে কম। সাড়ে পাঁচ হাজার মাদ্রাসার জন্যে বরাদ্দ ২০২ কোটি টাকা সেখানে বার হাজার স্কুল-কলেজের জন্যে বরাদ্দ ৩৯৯ কোটি টাকা। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি মসজিদভিত্তিক সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার প্রকল্প চালু করেছেন। ১৯৯২-৯৫ সালের জন্যে এই খাতে ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ৪ থেকে ৩৫ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্যে চার স্তরের ব্যবস্থায় সারাদেশে মোট ৭৬৮টি উপকেন্দ্র নির্মাণ করে সর্বমোট প্রায় ৭৫০০ জনকে শিক্ষাদানের লক্ষ্য স্থির করা হয়। এছাড়া সারাদেশে মোট ১৯২টি পাঠাগার স্থাপনের সিদ্ধান্তও এতে রয়েছে। এ কার্যক্রমের মধ্যবর্তী মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাদান কর্মসূচি ভাল চলছে। তবে লাইব্রেরি '৯৩ সাল পর্যন্ত চালু হয়নি। এখানে কেবল বাংলা, আরবি ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকদের প্রধান অংশ হলেন মসজিদের ইমামগণ।

মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি সরকারের মাধ্যমে ইউনিসেফ, ইউএনডিপি ও নোরাড থেকে ৪০ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়ে নরসিংদি ও

www.pathagar.com

কুমিল্লা জেলায় ৩০টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালিয়ে আসছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯০০০ বলে তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের এ শিক্ষার আওতায় এনেছে। এ প্রতিষ্ঠানের এ ছাড়াও মক্তব শিক্ষা কার্যক্রম ও ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে।

এছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগে ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট সংগঠন, এনজিও বা প্রাইভেট কমিটি চালিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছে। এগুলোতে সরকারি বা সরকারের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ না থাকলেও এসবের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব জাতীয় লক্ষ্যাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

০৪. মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্কারের পর বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো হল নিম্নরূপ :

ক্রম	মাদ্রাসার স্তর	অধ্যয়নকাল	সাধারণ শিক্ষার সম স্তর
১.	ইবতিদায়ি	৫ বৎসর	প্রাথমিক
২.	দাখিল	৫ বৎসর	মাধ্যমিক
৩.	আলিম	২ বৎসর	উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞানে মাধ্যমিক)
৪.	ফাজিল	২ বৎসর	ডিগ্রি (বিজ্ঞানে উচ্চ মাধ্যমিক)
৫.	কামিল	২ বৎসর	উচ্চতর ডিগ্রি (এম. এ.)

বিভিন্ন স্তরে মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয় মোটামুটি নিম্নরূপ :

ক. ইবতিদায়ি স্তরে রয়েছে কোরান, আরবি (২ পত্র), আকাইদ ও ফিকাহ এবং বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান, শরীরচর্চা।

খ. দাখিল ও আলিম সাধারণ স্তরে রয়েছে কোরান, হাদিস, ফিকাহ (২ পত্র), আরবি (২ পত্র), বাংলা, ইংরেজি, উর্দু/ফার্সি, ইসলামের ইতিহাস, বালাগাত ও মাশতেক। আলিম মুজাব্বিদ সাহির বিভাগে অতিরিক্ত বিষয় ও বাংলা ছাড়া সবই ইসলাম ধর্মীয় বিষয়। তবে আলিম বিজ্ঞান বিভাগে ১০টির মধ্যে ৪টি ধর্মীয় বিষয় ও বাকি ৬টি বাংলা, ইংরেজি, পদার্থবিদ্যা (২ পত্র) ও রসায়ন শাস্ত্র (২ পত্র)।

গ. ফাজিল স্তরে বাংলা ব্যতীত আর সবই কোরান, হাদিস ও আরবি ভাষাভিত্তিক ধর্মীয় বিষয়। ইংরেজি, বাংলাসহ ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়সমূহ ৯টি বিকল্পের মধ্যে ১টি হিসেবে বেছে নেওয়া যায়।

ঘ. কামিল বা উচ্চতর ডিগ্রির জন্যে বর্তমানে চারটি বিষয়ের ব্যবস্থা আছে- হাদিস, ফিকাহ, তাফসির ও আদব বা আরবি সাহিত্য।[৯]

এখানে বলা দরকার, কোন ছাত্র ইংরেজি না পড়লে ঐ স্তরের পরবর্তী সাধারণ শিক্ষার স্তরে ভর্তির যোগ্য বলে সে বিবেচিত হবে না।

www.pathagar.com

এখানে এও বলা দরকার, সরকারি ও অনুমোদিত মাদ্রাসা ছাড়াও দেশে আরও অগণিত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে খারিজি বা কওমি, ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা এবং মক্তব উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও অধিকাংশ মক্তব সাধারণত মসজিদকেন্দ্রিক একক শিক্ষকনির্ভর, প্রাতঃকালে পাঠদান হয়, মূলত কোরান পাঠ শেখানো হয়। এর কোন কোনটাতে ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ে। অধিকাংশ মাদ্রাসার সাথে কোরান মুখস্থ করার জন্যে হেফজখানা থাকে, এখানে কেবল কোরান মুখস্থ করিয়ে কোরানে হাফিজ তৈরি করা হয়। এ ধরনের সামাজিক মক্তব মাদ্রাসার সংখ্যা কত তা সঠিক বলা মুশকিল।

BANBAIS পরিচালিত ১৯৯৩ একটি জরিপে দেখা যায়, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার, আর মক্তবের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রধানত মুখস্থ বিদ্যার পদ্ধতিতে আমপারা ও কোরান শিক্ষা দেওয়া হয়। হাজিরা রক্ষা, পাঠগ্রহণ, পরীক্ষা ইত্যাদি সাধারণত উপেক্ষিত। ফলে এ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোরান মুখস্থ ও হুজুরের কাছ থেকে কিছু গতানুগতিক নীতিশিক্ষার বাইরে শিক্ষামূলক আর কোন পঠন-পাঠন, অনুশীলন, চর্চা ও সাধনার সুযোগ না থাকায় শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ যেমন গড়ে ওঠে না তেমনি শিক্ষায় দারুণ ঘাটতি থেকে যায়।

০৫. মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তৃতি ও ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন

বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে যেমন তেমনি সরকারি উদ্যোগেও যে মাদ্রাসার সংখ্যা ও ছাত্র বৃদ্ধির প্রয়াস রয়েছে তা বাজেট বরাদ্দ, এ ধারার কার্যক্রম সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার অর্থায়ন ইত্যাদিতে বোঝা যায়। নিচের সারণীসমূহ থেকে এটা আরও স্পষ্ট হবে।

সারণী ১ : বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা : ১৯৮৯ ও ১৯৯৩

বর্ষ	ইবতাদায়ি	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
১৯৮৯	১৪,০০০	৪১৩০	৭৫৬	৭১১	৯০
১৯৯৩	১৬,২০০	৩৮২৫ (৩২৭)	৮০৬ (১৯)	৮৩২ (৪)	১০০

সারণী ২ : বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসায় ছাত্র বৃদ্ধির তুলনা : ১৯৮৯ ১৯৯৩

বর্ষ	ইবতিদায়ি	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
১৯৮৯	১৬,৫২০০০ (আনু)	৫৮৭৩৭২	১৫৬৬৮২	১৮২৩৫৪	৩৩৯২৮
১৯৯৩	১৯১৮০০০	৮৯২৪৬২	২৯৭৬৮৯	৩৫৫০০০	৬২৫৯১

সারণী ৩ক : বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসায় নারীর অবস্থান ১৯৮৯

মাদ্রাসা স্তর	মোট শিক্ষক	শিক্ষয়িত্রী	হার	মোট ছাত্র	ছাত্রী	হার
দাখিল	৫২০২৪	৫৪২	১.০৪%	৫৮৭৩৭২	৫৬৬৪৪	৯.৬৪%
আলিম	১১৮৬৭	৩৮	০.৩২%	১৫৬৬৮২	১০৪৯০	৬.৬৯%

www.pathagar.com

মাদ্রাসা স্তর	মোট শিক্ষক	শিক্ষয়িত্রী	হার	মোট ছাত্র	ছাত্রী	হার
ফাজিল	১২৯৮৩	৩৭	০.২৮%	১৮২৩৫৪	৬৫৯৫	৩.৬১%
কামিল	২২৬৫	—		৩৩৯২৮	৭০৯	২.০৮%

সারণী ৩খ : বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসায় নারীর অবস্থান ১৯৯৩

মাদ্রাসা স্তর	মোট শিক্ষক	শিক্ষয়িত্রী	হার	মোট ছাত্র	ছাত্রী	হার
দাখিল	৪৭৫০৩	৯৮৩	২.০৬%	১১৬৯৫৬৬	৪৩৮৪৪	৩৭.৫০%
আলিম	১২৬৭৪	১১৮	০.৯৩%	২৯০৫০০	৭৫০১৯	২৫.৮২%
ফাজিল	১৫৩১৬	১১৮	০.৭৭%	৩৫৫০০	৬৫০৫	১৮.২০%
কামিল	২৩৭২	১২	০.৫০%	৬২৫৯১	৩৭৮৮	৬.০৫%

সূত্র : BANBAIS, Dhaka, 1993

সারণী ৪ : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় বরাদ্দ ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ (মিলিয়ন টাকায়)

মূলখাত	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪	
	মোট	%	মোট	%
বেসরকারি কলেজ	৬৩০.০৫৫	১২.৬৮	৬৩০.০৫৫	১১.৯৮
বেসরকারি স্কুল	২৬৬৮.৫০০	৫৩.৭০	১৫৮০.০০০	৫০.৭৩
বেসরকারি মাদ্রাসা	১৫৮০.০০০	৩১.৭৯	২৬৬৮.৫০০	৩০.০৪
বেসরকারি টোল	১.৪৩৭	০.০৩	১.৪৩৭	—
অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	০.০০৪	—	০.০০৮	—
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য মঞ্জুরি	৮০.০০	১.৬১	৪০.০০	১.৫২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ	৯.৬২৫	০.১৯	—	—
মোট	৪৯৬৯	১০০	৫২৬০	১০০

সূত্র : ইউনিসেফ রিপোর্ট

সারণী ৫ : মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবৃদ্ধির হার

	১৯৭৬-৮১	১৯৮১-৯০
১. প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১১.৬২	৮.৪৫
২. শিক্ষকের সংখ্যা	৬.১৯	১৩.২৯
৩. ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	৪.২৩	১৫.৬৯

উৎস : দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করা সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব : স্বাধীনতাউত্তর চব্বিশ বছরের সফলতা ও ব্যর্থতা (১৯৯৫ সালে আরবানের সেমিনারে পঠিত)

মূল উৎস : সরকারি পরিসংখ্যান।

www.pathagar.com

সারণী ৬ : সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রপ্রতি বাৎসরিক গড় ব্যয়ের মাত্রা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৯	৪৫১	৪৯৯	৫৩২
২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭১৫	১৮৭৫	১৮৮৪	১৯৭৯
৩. মাদ্রাসা	৩১৪৯	৩৬৬০	৪১৩৫	৪২৭৩
৪. মহাবিদ্যালয়	১৭৩৪	১৮৩০	১৯৬০	২০৫৬

সারণী ৭: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রপ্রতি সরকারি বাৎসরিক গড় ব্যয়ের মাত্রা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০৫.৫৩	৫৯১.০৭	৬৯৬	৬৯০
২. মহাবিদ্যালয়	৭৩৩.৬৬	৭২৪.৭৬	৯৬৭	৯৪৬
৩. মাদ্রাসা	৮০৫.৯৯	৭৮৩.১৬	৯২৮	৯৭৮

উৎস : দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করা সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব : স্বাধীনতাউত্তর চব্বিশ বছরের সফলতা ও ব্যর্থতা (১৯৯৫ সালে আরবানের সেমিনারে পঠিত)

মূল উৎস : BANBAIS, Bangladesh Educatinal Statitics : 1991 (March—1992)

সারণীসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, '৮৯ থেকে '৯৩ সময়কালেই মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। একমাত্র দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা হ্রাস পেলেও বস্তুত তার উন্নয়নই ঘটেছে যা বোঝা যায় ছাত্র সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধিতে। এই সময়ে এই স্তরেও প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হারে ছাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে '৮৯ সালের ২৬ লক্ষের স্থান '৯৩ সালে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ লক্ষে- বৃদ্ধির হার ৩৪%। রাজস্ব বাজেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি মাদ্রাসা পায় ৩০-৩১ শতাংশ-যা শিক্ষিত জাতি গঠনের ক্ষেত্রে মাদ্রাসার প্রকৃত অবদান ও ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সর্বোপরি এই বিশাল শিক্ষা নেটওয়ার্কে কি শিক্ষক কি ছাত্র হিসেবে নারীর অবদান রাখা বা সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অবস্থান শোচনীয়ভাবে কম। অবশ্য সামগ্রিক মূল্যায়নে এ শিক্ষা অনুপযোগী ও সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর এতে নারীর যথাযথ অংশীদারিত্বের প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু এই প্রবল জোরদার খাতে নারীর অনুপস্থিতি ও এর নারীবিদ্বেষের ব্যাপকতা ও তীব্রতা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ, ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামিক একাডেমী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী ভাবধারার কেজি স্কুলসমূহ ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার যে বিপুল নেটওয়ার্ক সরকার, ইউনিসেফ, নোরাড, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন দেশী বিদেশী সরকার ও সংস্থার বিপুল অর্থে পরিচালিত হচ্ছে তাতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ যেমন অত্যন্ত সীমিত, তেমনি তা নারীর প্রতি বিদ্বেষ/উপেক্ষাপ্রবণ জনগোষ্ঠী তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

www.pathagar.com

এর বাইরে মসজিদকেন্দ্রিক যেসব মক্তব-মাদ্রাসা রয়েছে তাতেও বিপুল ছাত্র রয়েছে। এ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ১৯৮৩ সালের একটি হিসাব থেকে সাধারণ ধারণা পাওয়া যেতে পারে—

মসজিদ	মক্তব	শিক্ষক	ছাত্র
১,৩১,৬৪১	৫৮,১২৬	৭৪,৭১৬	৩৮,৯৮,২০২

অর্থাৎ মাদ্রাসার ৩৫ লক্ষ ও মক্তবের ৩৯ লক্ষসহ অন্যান্য ধারার মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্রের মোট সংখ্যা প্রায় আশি লক্ষের কম হবে না। সাধারণ মাদ্রাসায়ই নারীর অংশগ্রহণ দেখা যায়, কিন্তু সেখানেও তার অংশগ্রহণের হার, ছাত্র হিসেবে ৯ শতাংশের নিচে এবং শিক্ষক হিসেবে ১ শতাংশের কম (সারণী ৩ দ্রষ্টব্য)। এই বিপুল ছাত্র সমাজ সত্যি সত্যি কি শিক্ষা পাচ্ছে ও শিক্ষার কেমন পরিবেশ লাভ করে এবার আমরা সে দিকটাতে দৃষ্টি দেব।

০৬. কর্তৃপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ব্যবস্থাপনা, উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমের দিক থেকে দেশে চার ধরনের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—১. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সরকারি অনুদান দ্বারা পরিচালিত মূলধারার মাদ্রাসা (এগুলো সাধারণ্যে সুন্নী মাদ্রাসা নামে পরিচিত যদিও সুন্নিয়তের দাবি নিয়ে মতপার্থক্য বিস্তর); ২. কওমি মাদ্রাসা, যেগুলো সাধারণত সরকারি অনুদান গ্রহণ করে না, তবে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন উৎস থেকে চাঁদা নেয় (এগুলো সাধারণভাবে ওয়াহাবী মাদ্রাসা নামে পরিচিত); ৩. মূলত আমপারা ও কোরান পাঠ শিক্ষায় নিয়োজিত মক্তব এবং ৪. সরকারি-বেসরকারিভাবে গৃহীত প্রকল্পভিত্তিক সাময়িক বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি।

মক্তব ও মসজিদ সংলগ্ন অন্যান্য শিক্ষালয়, মসজিদ সমাজের গণশিক্ষা কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদ-ভিত্তিক সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তব বিস্তার প্রকল্পের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ সাধারণত একক শিক্ষক নির্ভর। ইনি প্রধানত মসজিদের ইমাম, সনাতন মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছেন যাঁরা ইমাম প্রশিক্ষণ, গণশিক্ষা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নামে শিক্ষকতায় সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য এই প্রশিক্ষণ শিক্ষার যুগোপযোগী চাহিদা পূরণের জন্যে যথেষ্ট নয়। এঁদের বাংলা জ্ঞান সীমিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি জ্ঞান নেই, বাংলা বা কোন সাহিত্য পাঠ এবং সেই সূত্রে মানব-মনীষার উন্নত প্রকাশ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা ও আগ্রহ নেই। প্রতিষ্ঠানেও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক পাঠের, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমপারা, কোরান ও হাদিস পাঠে সীমাবদ্ধ, বাইরে আর কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। পাঠাগার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জাতীয় দিবস পালন, প্রভাত সমাবেশ ইত্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা জীবনের কোন সুযোগ এসব প্রতিষ্ঠানে নেই। এখান থেকে উন্নত শিক্ষা, মহৎ জীবনবোধ, কোনরকম দক্ষতা, সৃজনশীলতা, ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ একেবারেই অসম্ভব।

www.pathagar.com

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত গোঁড়া ও সকল রকম আধুনিকতাবিরোধী। এসব মাদ্রাসায় আরবির পাশাপাশি উর্দু ও ফার্সির প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হয় সে রকম গুরুত্ব মাতৃভাষা বাংলার প্রতি দেওয়া হয় না। এ শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তা ব্যক্তিরা মনে করেন, যেহেতু কোরান ও হাদিসের বিভিন্ন তফসির এবং ফিকাহ ও আকাইদের অধিকাংশ কিতাব উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত সেহেতু এ ভাষাদ্বয় না জানলে কোরান হাদিস ও অন্যান্য কিতাব কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে আরবি, উর্দু, ফার্সি ভাষার দক্ষ শিক্ষকের অভাবে সেসব ভাষায় উচ্চতর জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান অনুশীলনের উপযোগী মানে ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে মাতৃভাষাসহ ছাত্রদের কোন ভাষাতেই ভাল দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে না।

প্রচলিত ও ক্রমপরিবর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রতি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও শিক্ষকদের বিরূপতা বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে তীব্র ভাষায় প্রকাশ পায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ের জন্যে এরা পশ্চিমা আধুনিকতা ও নারীর অগ্রগতিকে এক কাতারে রেখে ঢালাওভাবে একতরফা নিন্দা করে থাকে। এই সূত্রে বাজারে সুলভ জামাত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ওয়াজের ক্যাসেটগুলোর কথা বলা যেতে পারে। তাছাড়া জামাত সমর্থিত সুপরিচিত সাময়িকী 'মাসিক মদীনা'র নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যটিও এই বিশ্লেষণের যথার্থ্য প্রমাণ করে। এই সম্পাদকীয়তে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সংকটের জন্যে ইহুদী-নাসারাদের নানা চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'আশা করা গিয়েছিল যে, বসনিয়া—হার্জেগোভিনার বিপন্ন মুসলিম ভাইবোনদের পাশে গিয়ে তুর্কীরা দাঁড়াবে। কিন্তু সে সম্ভাবনাটুকু অংকুরেই বিনষ্ট করে দেওয়ার লক্ষ্যেই কট্টর পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় লালিত একটি মেয়েলোককে ক্ষমতার শীর্ষে বসানো হয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষমতার শীর্ষেও অনুরূপ আর একটি পাশ্চাত্যপন্থী নারীর উপস্থিতি একই ষড়যন্ত্রের আরেকটি বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছু নয়।' (মাসিক মদীনা, ৩১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৫)।

এই সূত্রে আন্ডারলাইন করা বাক্যবন্ধও লক্ষ্য করা দরকার—এতে প্রকাশ পেয়েছে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ নারীর প্রতি চরম অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের মনোভাব। এই ধরনের নারীবিদ্বেষ আধিগ্রস্ত মানুষের জাতীয় জীবনে ও উন্নয়নে তেমন অবদান নেই। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোঁড়া রক্ষণশীল সামাজিক মতবাদ ও উগ্র ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার জঙ্গি রাজনীতিকে সমর্থন জোগায়।

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসার পাঠ্যবিষয়ের পরিচিত আগেই দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সাথে সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সামঞ্জস্য ঘোষণা করার পর থেকে (যেমন দাখিল এস.এস.সি'র সমমানের, আলিম এইচ.এস.সি'র সমমানের) মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ বই পাঠ্য করা হচ্ছে। যদিও এসব বিষয় যথাযথ গুরুত্বের সাথে পঠিত হয় কিনা, এসব পাঠ্যক্রম যে যুক্তিবাদিতা, মানসিক ঔদার্য ও জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত হয় তা বাস্তবে ঘটে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইয়ের সম্পাদনা, রচনা, চিত্রায়ন, চরিত্রায়ন ইত্যাদিতেই নারী ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বইতে তার ব্যতিক্রম ঘটার কোন কারণ নেই।[১১] বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৭ম শ্রেণীর বাংলা বইতে দেখা যাচ্ছে মোট ২৬ জন রচয়িতার মধ্যে মাত্র একজন মহিলা। এতে অবশ্য মানুষের ছবি ব্যবহৃত হয়নি। ৪র্থ শ্রেণীর বাংলায় ১৫টি লেখায় রচয়িতার নাম আছে, তার দুটি লিখেছেন নারী। নারীর স্নেহময়ী জননী, জায়া, কন্যা রূপের কথা ফুটে ওঠে এমন রচনাই স্থান পেয়েছে, তার বাস্তব বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের চিত্র মেলে না। তাছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষায় বিভিন্ন পর্যায়ে একতরফা নারীর প্রগতি ও উন্নতিবিরোধী মনোভাবের কথাও উল্লেখ করতে হয়।

আন্তর্জাতিক সাহায্যে গণশিক্ষা বিস্তারের প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমে যেসব বাংলা বই ব্যবহৃত হয় তাতে নারীর সমমর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বাড়তি সচেতনতার প্রকাশ নেই। এতে আরও সমস্যা ঘটেছে কারো কারো লেখায় ইতিপূর্বে পরীক্ষিত ও পরিত্যক্ত এবং ভাষা শিক্ষার জন্যে অনুপযোগী ও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত মাত্রাতিরিক্ত আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি কৃত্রিম ভাষার প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়। এই সূত্রে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

ক. নাফসী নাফসী বলে হাশরে
কাঁদবেন হায় সবি
ইয়া হাবলি উম্মত বলে
কাঁদবেন বিশ্বনবী।
[বর্ণ পরিচয়—২য় পাঠ]

খ. ইলম ফরয হরফ ধর
কলম লও সবক পড়
[বর্ণ পরিচয়—১ম পাঠ]

মত প্রকাশ, ভাবের আদান-প্রদান, মননের ক্ষমতা অর্জন ও ভাষাগত চর্চায় অগ্রগতি সাধনের উপযোগী ভাষাজ্ঞান এভাবে আয়ত্ত হয় না। তদুপরি এই ধারার শিক্ষার কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতানুযায়ী অংশীদারিত্ব, আইনগত ও নাগরিক সমানাধিকার সম্পর্কে সাধারণত বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন।

মাদ্রাসা শিক্ষক প্রায় একচেটিয়াভাবে পুরুষ। মহিলা মাদ্রাসার ধারণা অতি সাম্প্রতিক। বলা প্রয়োজন, এতে অত্যন্ত গোঁড়া পরিবার ও এলাকার মেয়েরা লেখাপড়া করার কিছু সুযোগ পেলেও মাদ্রাসা শিক্ষার অসম্পূর্ণতা, ভ্রান্তি ও একদেশদর্শিতার বাইরে এগুলো নয়। ফলে নারীর শিক্ষা বিস্তারের জন্যে মহিলা মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ানো নিশ্চয়ই কোন সদুত্তর হতে পারে না। তবে সরকারি বেসরকারি বিপুল অর্থ যে খাতে ব্যয়িত হচ্ছে তাতে নারীর কি অবস্থান ও পরিণতি সে চিত্রটি পাওয়া জরুরি। সমগ্র মিলিয়ে মহিলা শিক্ষকের হার শতকরা ১ জনেরও কম। ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়লেও

www.pathagar.com

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের মূল নির্মাতা শিক্ষকমণ্ডলী। শিক্ষকদের একাংশ অত্যন্ত গোঁড়া এবং নারীশিক্ষার বিরোধী। যারা অপেক্ষাকৃত উদার তারাও সহশিক্ষার বিরোধী, কঠোর পর্দা প্রথার এবং নির্ধারিত গার্হস্থ্য জ্ঞান ও ধর্মীয় মূল্যবোধনির্ভর বিষয়েই পাঠ সীমিত রাখার পক্ষপাতী (সংযোজন ২ দ্রষ্টব্য)। সাধারণভাবে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, স্বাবলম্বন, ক্ষমতায়ন, স্বাধীন ভূমিকা, নেতৃত্ব, আর্থিক স্বাধীনতা, চাকরিগত উচ্চতর অবস্থান, নির্দেশক-পরিচালকের ভূমিকার প্রতি বিরূপ। ফলে একদিকে ছাত্ররা নারীর প্রতি এই কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষালাভ করে আর অন্যদিকে ছাত্রীরা কঠোর অবরোধ ও শৃঙ্খলার চাপে নিষ্পেষিত হয়।

০৭. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত পরিবেশ

মাদ্রাসা শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো ধর্মীয় নৈতিকতা। কিন্তু ধর্মের নানা তত্ত্ব এবং নীতিবোধসমূহ কখনও মুক্তভাবে আলোচিত-পর্যালোচিত হয় না এখানে। অন্যান্য দর্শন ও তত্ত্বের আলোকে জ্ঞানের ব্যাপক একটি ভিত্তির ওপর এসব অনুসৃত ধারণা, বক্তব্য, তত্ত্ব ও তথ্য পরীক্ষিত হয়নি। ফলে এখানে জ্ঞান ও নৈতিকতার দিক থেকেও স্থবির, সংকীর্ণ এবং অন্ধকার পরিবেশ বিরাজ করছে। বিভিন্ন সংস্কার কমিটির সুপারিশে এই বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি ১৯৪১ সালে মওলা বখশের নেতৃত্বে গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি রিপোর্টে অন্যতম সদস্য মৌ. মোজাম্মেল হক ভিন্নমত পোষণ করে হতাশার সুরে বলেন যে, সংস্কারের চেষ্টা চালিয়েও গত একশ বছরে কোন ফল পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসার সবচেয়ে বড় সংকট এইখানেই যে, শিক্ষাঙ্গন হওয়া সত্ত্বেও এখানে তত্ত্ব ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ, পর্যালোচনা, পরিমার্জনার পরিবেশ অনুপস্থিত। নানা সংস্কার, পরিমার্জন ও উন্নয়ন সত্ত্বেও সম্ভবত একারণেই মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজে ও জাতীয় জীবনে কোন বড় অবদান রাখতে পারছে না।[১২]

একচেটিয়া পুরুষ প্রাধান্য তো আছেই। তাছাড়া অন্ধ সংস্কারের মাধ্যমে নারীবিদ্বেষী কুসংস্কার লালিত হয়। অন্য ধর্মের প্রতি উপেক্ষা, এমনকি বিদ্বেষভাব ছড়ানো হয়, আধুনিক শিক্ষা ও জীবনাচরণের প্রতি নির্বিচারে বিরূপতা প্রশ্রয় পায়, বিজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ ও অমনোযোগ এবং জাতীয় চেতনার প্রতি উপেক্ষার ভাব একইভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছে।[১৩]

অধিকাংশ কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। বহু মক্তব ও মাদ্রাসায় শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি মহান জাতীয় দিবসগুলোতেও ছুটি ঘোষণা করা হয় না। এগুলোতে এক ধরনের জঙ্গি জেহাদি সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট বা মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্রদের লক্ষ্য করে ইসলামী ভাবধারার যেসব সাময়িকী প্রকাশিত হয় তাতে বহু লেখায় এই জঙ্গি মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।[১৪]

সাধারণ মাদ্রাসার মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত অধিকাংশ মাদ্রাসা দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ভরা। এই মাদ্রাসাসমূহ সরকারি অনুদান ছাড়াও প্রতি বছর বার্ষিক

www.pathagar.com

সভা, কোরবানির চামড়া ইত্যাদি থেকে ভাল অংকের অর্থ পেয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহের কাজেও লাগায়। এ সত্ত্বেও মাদ্রাসায় অর্থাভাব প্রকট দেখা যায়। অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার নামে অর্থ গ্রহণ বা অস্তিত্বহীন শিক্ষকের নামে সরকারি ভাতা গ্রহণের দৃষ্টান্তও অনেক পাওয়া গেছে।

Centre for Policy Dialogue কর্তৃক এপ্রিল, ১৯৯৫-এ পরিচালিত ও প্রকাশিত Independent Review of Bangladesh Development 1994/95-এ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মাদ্রাসা অংশে প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ লিখছেন, 'A survey of 300 randomly selected Madrasahs, from a list provided by the Madrasah Board, found that a number of Madrasahs do not exist. In reality facilities are poor, the number of at students are over reported, attendance of both teachers and students is irregular and the actual contact hours are least 50% less than reported.

কমিটির দৃঢ় পরিচালনার অভাবে অধিকাংশ মাদ্রাসায় শিক্ষকদের তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং পদোন্নতির লক্ষ্যে দলাদলিতে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আগ্রহে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়। তাছাড়া প্রায় অধিকাংশ মাদ্রাসায় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব রয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে এ ঘাটতি বেড়ে চলেছে। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেও এই সংকট দূর হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বর্তমানে দাখিল, আলিম পাস করার পর সহজেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় বলে নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অধিকাংশ মেধাবী ছাত্র মাদ্রাসা শিক্ষায় আর অগ্রসর না হয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চলে আসে। দাখিল, আলিম এবং ফাজিল যথাক্রমে এস.এস.সি., এইচ.এস.সি. ও ডিগ্রির সমকক্ষ গণ্য হলেও চাকরির ক্ষেত্রে এই মান কোন কাজে আসে না বলে ছাত্ররা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সাধারণ শিক্ষায় চলে আসছে। এভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেধাবী ছাত্র মধ্যম পর্যায় থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ত্যাগ করে এ শিক্ষার দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতা ভালভাবে তুলে ধরছে। মেধাবী ছাত্র না থাকায় মেধাবী আলেম উলেমাও মাদ্রাসা থেকে বেরুচ্ছে না এবং সমগ্র শিক্ষাটির যেমন মান হ্রাস পাচ্ছে তেমনি কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণ ঘটছে।

০৮. মাদ্রাসায় ছাত্র-শিক্ষকের রাজনীতি

মাদ্রাসাসমূহে সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ও তার মান অত্যন্ত নীচু হলেও ক্রমবর্ধমান হারে এখানে রাজনীতির চর্চা বাড়ছে। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পর জামাতে ইসলামীসহ বভিন্ন ধারার, এমনকি পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার সংগঠনের মধ্যে বাংলাদেশকে ঘিরে এ ধরনের উচ্চাভিলাষী চিন্তা জোরদার হয়। তাছাড়া লিবিয়া, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র অর্থ যোগান দিয়ে ইসলামী ভাবধারার রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন জোরদার

www.pathagar.com

করতে গিয়ে মাদ্রাসা ও বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়েছে।[১৫] মধ্য সত্তরের পর থেকে রাষ্ট্রশক্তিও এ ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসাসমূহে ছাত্রদের প্রভাবশালী একক বৃহত্তম দল হলো ইসলামী ছাত্র শিবির। ছাত্রীদের মধ্যে তাদের ছাত্রী সংগঠন ইসলামী ছাত্রী সংস্থারও প্রভাব রয়েছে। দেশের বৃহত্তম মাদ্রাসা ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসায় অবশ্য সরকার সমর্থক জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। মাদ্রাসায় অপরাপর যেসব ছাত্র সংগঠন রয়েছে সেগুলো হলো : তালাবায়ে আরবিয়া, ইসলামী ছাত্র পরিষদ, সাহাবা ছাত্র পরিষদ, আঞ্জুমানে নওজোয়ান, ইসলামী ছাত্র কাফেলা, ইসলামী ছাত্রশক্তি, ইসলামী ছাত্রসেনা, জাতীয় সুন্নী ছাত্র আন্দোলন, গাউসিয়া ছাত্র পরিষদ। শেষোক্ত তিনটি প্রধানত চট্টগ্রামভিত্তিক। ছাত্রসেনার মুরুব্বী রাজনৈতিক দল হলো ইসলামী ফ্রন্ট, আর বাকি দুটি ছাত্রসেনার উপদল। এরা জামাত-শিবিরবিরোধী, তবে জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধুনিক চিন্তা-ভাবনা ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন নতুনত্ব নেই। বরিশাল অঞ্চলে শর্ষিনার প্রভাবাধীন মাদ্রাসাগুলোতে রয়েছে মুজাহিদ ছাত্র বাহিনী। ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ইত্যাদি জেলাতে আটরশির অধীনে যেসব মাদ্রাসা রয়েছে সেগুলোতে জাকের পার্টির ছাত্র সংগঠন রয়েছে। অনেক মাদ্রাসায় অবশ্য ছাত্র রাজনীতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, তবলীগ জামাত ইত্যাদি সংগঠন এবং বিভিন্ন পীরের প্রভাব লক্ষণীয়। কম বেশি সকলে গোঁড়া ধর্মান্ধ, ক্ষেত্রবিশেষে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার প্রতি দুর্বল। তাদের চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে যে রাজনৈতিক আদর্শ প্রকাশ পায় তা কিছুতেই আধুনিক, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার কাছাকাছি আসে না। ইদানীং সনাতন মাদ্রাসা পাঠ্য বিষয়ের বাইরে মাতৃভাষা, ইংরেজি ও বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের যেসব শিক্ষক মাদ্রাসায় যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রগতিশীল চিন্তাধারা পোষণ করেন। তবে মাদ্রাসার সামগ্রিক পরিবেশ সাধারণত তাঁদের ব্যতিক্রমী চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের অনুকূল নয় এবং তাই তাঁদের স্বতন্ত্র কোন উপস্থিতি বোঝা যায় না। অর্থাৎ কঠোর গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে তাঁরা বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন না। দলীয় রাজনীতি ছাড়াও সামগ্রিকভাবে মাদ্রাসা থেকে ছাত্র-শিক্ষকের মাধ্যমে সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামির পক্ষে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি ও ধরে রাখার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যে কোন সামাজিক ঘটনার ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ ও কঠোর বিধান দিয়ে ফতোয়া জারির মাধ্যমে কড়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়। এতে সমাজের টেনশান বাড়ে, যা নারীবিরোধী বিভিন্ন ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করেছি। এই মনোভাব থেকে মাদ্রাসার নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন এক সংগঠিত শক্তির জন্ম দিচ্ছে যা চরম ও সামগ্রিকভাবে নারীবিদ্বেষী ভূমিকা নিচ্ছে।

এছাড়া ইসলামী বিপ্লবের এক আন্তর্জাতিক রূপ ও তাগিদও আছে। আফগানিস্তানে মূলত মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন তালিবান সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা

www.pathagar.com

দখলের কাছাকাছি চলে এসেছে তাতে এখানেও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন বিকাশ ও বাস্তবায়নের চেষ্টা যে অনুপ্রাণিত হচ্ছে না তা কে বলবে? পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশেও প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার ডাক অশ্রুত নয়। ফলে মাদ্রাসার রাজনীতির রাষ্ট্রীয় আঙ্গিকে এই সম্ভাব্য সশস্ত্র প্রবণতা-পরিণতির কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

০৯. মাদ্রাসার সাংস্কৃতিক জীবন

মাদ্রাসার সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে তাকালে একই শোচনীয় চিত্র ফুটে ওঠে।

জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে দেশের কোন মাদ্রাসায় নিয়মিত (এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবেও) জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয় না। আমাদের জাতীয় সংগীতকে সাধারণত মাদ্রাসার মূল্যবোধের বিরোধী বলে বিবেচনা করা হয়। অধিকাংশ মাদ্রাসায় প্রারম্ভিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় না, যে গুটি কয়েক মাদ্রাসায় তা হয় সেখানে হামদ, নাত, কেরাত পরিবেশন এবং নারায়ে-তকবীর ও বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে সমাবেশ শেষ করা হয়।

শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসের মত গুরুত্বপূর্ণ ও মহান জাতীয় দিবসসমূহে অল্প কিছু মাদ্রাসায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেশিরভাগ মাদ্রাসায় এ সকল দিবসে কেবল ছুটি ভোগ করা হয়। যখন এইসব দিবসে স্কুল-কলেজ ও সমগ্র দেশ অনুষ্ঠান ও উৎসবমুখর থাকে তখন অধিকাংশ মাদ্রাসা থাকে নীরব নিস্তব্ধ।[১৬]

বর্তমানে মূলধারার হাই স্কুলসমূহেও গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহার নেই। এ অবস্থায় মাদ্রাসায় যে গ্রন্থাগারের ব্যবহার কম হবে তা বলাই বাহুল্য। মাদ্রাসায় সাহিত্য পাঠের প্রতি কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না। ইসলামিক একাডেমির প্রকাশিত গ্রন্থ, ইসলামী ভাবধারার অন্যান্য বই, কতিপয় নির্বাচিত মুসলিম লেখকের কিছু বই ছাড়া সমুদয় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে চরম অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রামের পটিয়া, হাটহাজারি, সোবহানিয়া এবং ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী গ্রন্থের সমৃদ্ধ পাঠাগার আছে। কিন্তু এতে এই ধারার আধুনিক গ্রন্থের সংযোজন নেই, ইসলাম ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে উচ্চতর পঠন-পাঠনে আগ্রহ নেই, গ্রন্থাগারের সাধারণ ব্যবহারও অত্যন্ত কম। ফলে এসব পাঠাগার থেকেও কার্যত কোন কাজে লাগছে না। সাহিত্যের মাধ্যমে যে জাতীয় পরিচয় লাভ করা যায়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে ধারণা অর্জন সম্ভব তা এখানে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া সৎ ও মহৎ সাহিত্য মানবজীবনের যে বিচিত্র রূপ, মানবচরিত্রের যে সূক্ষ্ম চিত্র ও মানব সম্পর্কের যে জটিল সত্য উদঘাটন করে তার সাথে পরিচয় ঘটে না। এতে জীবনের মহৎ রূপ, সৌন্দর্য ও উপভোগ্যতার দিকই উপেক্ষিত হয়। বরং এর বিপরীতে উত্তেজনাকর, বিবাদমুখর প্রচারধর্মী সাহিত্য পাঠের ফলে মনে উষ্মা ও উত্তেজনার জন্ম হতে থাকে। তারই প্রকাশ দেখি ইসলামী সাহিত্য নামে বর্তমানে বিভিন্ন সাময়িকীর রচনায় ও সমাজের মাদ্রাসা

www.pathagar.com

শিক্ষিতদের বিভিন্ন ভূমিকায়। মাদ্রাসা ব্যতীত অন্যান্য যেসব শিক্ষা কার্যক্রম আছে যেমন মসজিদভিত্তিক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার প্রকল্পের অধীনস্থ লাইব্রেরি, মসজিদ মিশনের গণশিক্ষার গ্রন্থ, ইসলামী ধারার কে.জি. ও আধুনিক স্কুলের পাঠাগার ইত্যাদির গ্রন্থ তালিকায়ও বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান বা গৌণ কোন বইয়েরই উল্লেখ দেখা যায় না। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানসহ অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রম, বার্ষিকী বা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশনা, বার্ষিক পিকনিক বা শিক্ষাসফর ইত্যাদি সাধারণত কোন মাদ্রাসাতেই হয় না। ক্রীড়াসহ সকল প্রকার সাংস্কৃতিক ও মননশীল, সৃজনমূলক কাজের প্রতি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বিরূপ। তবে ইদানীং সরকারি উদ্যোগে থানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকায় কোন কোন মাদ্রাসা এতে অংশ নিচ্ছে। তবে তা এখনও সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য নয়। কোন কোন মাদ্রাসায় যেটুকু সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হয় তা সাধারণত শিবিরের ছেলেরাই পরিচালনা করে থাকে। যসব কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয় তা সাধারণত বাঙালির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি এবং আমাদের জাতীয় ভাবধারার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোন কোন মাদ্রাসায় দেখা যায় বাইরে থেকে শিবিরের ও ছাত্রসেনার ছেলেরা এসে ইরানি স্টাইলের বিপ্লবী ভাবধারা তুলে ধরার জন্যে নাটক মঞ্চায়ন করে থাকে। শহরের কোন কোন মাদ্রাসায় কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হাতে নিতে দেখা যায়। তবে একথা উল্লেখ করতে হয় যে, কোন মাদ্রাসায় সঙ্গীত বা চারুকলার শিক্ষক নেই, এসব বিদ্যা সম্পর্কে ঐতিহ্যগত বা আধুনিক কোন ধরনের ধারণা সাধারণত শিক্ষকদের নেই। ফলে যে সামান্য সংস্কৃতি চর্চা হয় তার গুণগত মান অত্যন্ত নীচু।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় সকলেই টেলিভিশন, সিনেমা এবং নাটক ও সংগীতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত চর্চা বা দেখা ও শোনাতো দূরের কথা এরা বাড়িতে টেলিভিশন রাখাকেও মস্তবড় পাপের কাজ বলে মনে করে। ইদানীং মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষককে টেলিভিশনের ইতিবাচক কিছু দিক সম্পর্কে উল্লেখ করতে দেখা যায়। তবে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিপুল একটি অংশ গোপনে বা ব্যক্তিগতভাবে টেলিভিশন দেখে থাকেন। অর্থাৎ সাধারণ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আগ্রহের মত এক ধরনের গোপন আগ্রহ জন্মাতে দেখা যাচ্ছে।

এই ধরনের গোঁড়া কট্টর ও নির্বিচারী মনোভাব গ্রহণের ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাধারণভাবে জাতীয়-বিজাতীয়, বর্ধিষ্ণু-ক্ষয়িষ্ণু, সৎ ও অপসংস্কৃতি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বিরাজিত তার মধ্যে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের কোন ভূমিকা নেই বা ভূমিকা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কারণ তারা মূলধারার সৎ সংস্কৃতির বিষয়েও সন্দিগ্ধ ও বিরূপ। এভাবে মাদ্রাসার বিপুল ছাত্র-শিক্ষক জাতীয় রাজনীতি, সংস্কৃতির ধারা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ছেন। তাদের চিন্তার জগৎ কেবল সংকীর্ণ ও স্থবির নয়, প্রায়শ বিকৃত ও খণ্ডিত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এরই প্রকাশ দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাদের ঢালাও, বিরূপ মনোভাব থেকে। দেশের সম্মানিত কবি শামসুর রাহমান ও শিক্ষাবিদ আহমদ শরীফকে মুরতাদ ঘোষণা করে একতরফা অভিযোগ এনে কিছুদিন আগেও সভা-সমাবেশ-মিছিলে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছে। দেশের কৃতী শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সহিত্যিক, অভিনেতা, নাট্যকার, যাদুকর, খেলোয়াড়, নারী নেত্রী, শিশু সংগঠক প্রমুখ সম্পর্কে তাদের হয় কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই, নয়ত আগেভাগেই তাদের মনে তাঁদের সম্পর্কে সন্দেহের বীজ ঢোকানো হয়েছে।

১০. মাদ্রাসা ও মুক্তিযুদ্ধ

জাতীয় চেতনাবিহীন এই শিক্ষার আরও ভয়াবহ বিকৃতির প্রকাশ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়। কি ওহাবী কি সুন্নী, বাংলাদেশের প্রায় সকল মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র ছিল স্বাধীনতার বিপক্ষে। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম একেবারে হাতে গোনা দু'চারটি। অধিকাংশ মাদ্রাসা পাকিস্তান রক্ষার দুর্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্রধরাকে জিহাদ হিসেবে ধরা হয়েছিল। রাজাকার, আলবদর, আল শামস, মুজাহিদ ইত্যাদি ছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় সহযোগী। এদের মধ্যে রাজাকার ছাড়া আর বাকি তিনটি মূলত মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। রাজাকারের মধ্যে সাধারণ মানুষও অনেক ছিল। এখনও মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষকদের মধ্যে অনেককে পাওয়া যাবে যারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল। বর্তমানে দেখা যায় তারা বেশিরভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রসংগটি এড়িয়ে যেতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালির অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে, মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য সংগঠক ও নেতাদের সম্পর্কে, মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত মূল্যবোধ ও আদর্শ সম্পর্কে, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক শক্তি সম্পর্কে, সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের বীরদের প্রতি, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ও হানাদারদের হাতে ইজ্জতহারা নারীদের প্রতি, সামগ্রিকভাবে বাঙালির এসময়কার গৌরবোজ্জ্বল উত্থান সম্পর্কে তাদের কোন বাড়তি আগ্রহ, আবেগ কিংবা উচ্ছ্বাসতো দেখাই যায় না বরং পরবর্তীকালে এর বিরোধী যে রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছে মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে তাতে শরীক হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের ধারাকে নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন যুগিয়েছে। তাই দেখা যায়, মাদ্রাসার বিকাশ ও বিস্তারের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ও আদর্শের বিরোধী চেতনার যেন শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে।

১১. এই শিক্ষার সীমাবদ্ধতা

আজ যদি আমরা সমাজজীবনের দিকে তাকাই তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী মানুষদের মধ্যে খুঁজলে কেবল মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষ একজনও পাব কিনা সন্দেহ। একসময়, মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে, সাধারণ মাদ্রাসা ও নিউ স্কিম মাদ্রাসার মধ্য দিয়ে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে অনেক সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও

www.pathagar.com

সার্থক পেশাজীবীর দেখা মিলেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান হারে ইংরেজি ও সেক্যুলার সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটলে ব্যাপকহারে মুসলিম জনগণ এই শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে এবং বহুতর সংস্কার সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষা বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ, গণ্ডিবদ্ধ এবং তামাদি শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়।[১৭] মুক্তিযুদ্ধ বা জাতীয় জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলিতে মাদ্রাসাসমূহের সাধারণ প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকা প্রায়শই হয়েছে নেতিবাচক কিংবা নিষ্ক্রিয়। ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে যুক্তিযুক্ত বলা যাবে?

এই সূত্রে একথাও বলতে হবে যে, কেবল শিল্পী, সাহিত্যিক, পেশাজীবী সৃজনে ব্যর্থতা নয়, এমনকি খোদ ইসলামী জ্ঞানে পাণ্ডিত্যসম্পন্ন আলেম মাশায়েখ তৈরিতেও এ শিক্ষা সার্থক হতে পারেনি। বাংলাদেশের কোন মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষালাভ করেও অসাধারণ বা উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্যের আলেম তৈরির কথা জানা যায় না। অন্তত টানা সাতশ বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা চললেও এ অঞ্চল থেকে ইসলাম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিযোগ্য কোন মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয় নি। দেওবন্দ, লখনৌ কিংবা পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে কেউ কেউ উচ্চতর জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন করেছেন। কিন্তু এখান থেকে উচ্চমানের আলেম তৈরির কোন রেকর্ড নেই। বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা চালিয়ে এর পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে একদিকে দেশীয় ইতিহাস কৃষ্টি ও ভাবধারার বিরোধী চেতনার প্রসার ঘটছে এবং অন্যদিকে প্রকৃত ইসলামী চিন্তা-চেতনারও বিকাশ ঘটছে না। তদুপরি, এ থেকে জন্ম নিচ্ছে অগণতান্ত্রিক মনোভাব, মদত পাচ্ছে সাম্প্রদায়িক চেতনা আর জোরদার হচ্ছে নারীর বিকাশ ও অধিকারবিরোধী জঙ্গি মনোভাব কিন্তু বিকাশ ঘটছে না ইসলামের শান্তি, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের শিক্ষার। এই অগণতান্ত্রিক মনোভাবের সূত্রে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী সংগঠন ছাত্র শিবির ও জামাতে ইসলামীর তাত্ত্বিক গুরু অধ্যাপক গোলাম আজমের একটি সাক্ষাৎকারের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। গণতন্ত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'গণতন্ত্র মানুষ গড়ার, দেশ গড়ার কোন আদর্শ নয়। এটা ক্ষমতার পরিবর্তন ও ক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতি মাত্র।' তাঁর লক্ষ্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।[১৮] আমাদের দেশের মাদ্রাসাসমূহ একধরনের সংস্কৃতিহীন ও জাতীয় চেতনাবিহীন নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে চলেছে। এটা জাতীয় অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

১২. সমাজজীবনে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাব

আমাদের উপমহাদেশীয় সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে রক্ষণশীল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সনাতন বিশ্বাস ও সংস্কারে আবদ্ধ। একসময় সমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন ও জাতিভেদ-বর্ণভেদের শোষণে বিপর্যস্ত নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে ইসলামের সাম্য ভ্রাতৃত্বের বাণী ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।[১৯] কিন্তু সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে যেসব

www.pathagar.com

ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হয়েছে—সেটা দেওবন্দ থেকে হোক বা চট্টগ্রামের হাটহাজারি মাদ্রাসা থেকে পরিচালিত হোক-তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকতর রক্ষণশীলতার দাবী নিয়ে অপেক্ষাকৃত উদার ধারার বিরুদ্ধাচারণ করেছে কিংবা ধর্মের খুঁটিনাটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে মতপার্থক্যের ভিত্তিতে অপরাপর মৌলবাদী ধারার সাথে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মাদ্রাসার সাথে ইংরেজি শিক্ষায়তন এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতের সাথে ইংরেজি শিক্ষিতের মধ্যে জীবনদৃষ্টি, জীবনাচরণ, রুচি, চিন্তা, মননে ব্যাপক পার্থক্য রয়েই গেছে।

যেহেতু সমাজে শিক্ষার তেমন বিস্তার ঘটেনি, দারিদ্র্য দুর্লঙ্ঘ্য বোঝার মত চেপে বসে আছে তাই এই বৈপরীত্য সমাজে তীব্র কোন সংঘাতের জন্ম দেয় নি। একদিকে বৃহত্তর দরিদ্র শিক্ষাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সনাতন বিশ্বাস ও প্রচলিত অভ্যাসের বশে সনাতন মোল্লা-মৌলভীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে আর অন্যদিকে অভিজ্ঞ ও মেধাবী ব্যক্তিরা জীবনে উন্নতির সুনিশ্চিত পথ হিসেবে স্বেচ্ছায় ইংরেজি বা সাধারণ শিক্ষাকেই গ্রহণ করে নিচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, মুসলিম ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, এই ধারার লেখক ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ সন্তানদের কিন্তু মক্তব মাদ্রাসায় না পড়িয়ে ইংরেজি সাধারণ শিক্ষায়তনে পাঠাচ্ছে। গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী থেকে সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ প্রমুখ কেউই তাঁদের সন্তানদের মাদ্রাসা-মক্তবে পাঠাননি। যাঁরা ইসলামী বিপ্লব, মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন ও এর জন্যে কাজ করেন যদি তাঁরাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে তাঁদের সন্তানদের জন্যেও উপযোগী শিক্ষায়তন বলে মনে করতে না পারেন তাতেই কি এ শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না? ইসলামী বিপ্লবের জন্যে বা মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান দরকার এটা নিশ্চয়ই তাঁরাও বিশ্বাস করেন। তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই এ জ্ঞান লাভের জন্যে মাদ্রাসার ওপর নির্ভর করতে ভরসা পান না। আমরা আগেও বলেছি আমাদের দেশের মাদ্রাসা ও অন্যান্য ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র সাধারণ শিক্ষাদানের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাদানেও অক্ষম। আর সে কারণেই ইসলামী বিপ্লবের বা মুসলিম জাতীয়তার বিকাশের কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে বর্তমান নেতৃবৃন্দ মাদ্রাসার ওপর নির্ভর করছেন না, তাঁরা নির্ভর করছেন সাধারণ শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর।

ইসলামী জোশ-যাকে ইংরেজিতে fanaticism বলা যেতে পারে—সৃষ্টি করে এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামের যথার্থ সেবক কি তৈরি করতে পারছে? বর্তমানে ইসলামী ভাবধারার বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের আস্থাহীনতা এবং আলেম ওলেমা তৈরিতে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই বেরিয়ে আসে। রবং দেখা যাচ্ছে মাদ্রাসার শিক্ষা ছাত্রদের বিপুল অংশকে বিভিন্ন ধারার ইসলামী রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও তাদের অন্ধ সমর্থক হিসেবে ব্যবহারে সাহায্য করছে। কেবল জোশ নির্ভর মানুষ সাধারণত এভাবে বুদ্ধিমান, চতুর ও স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলানারা অধিকাংশ সামাজিকভাবে এমন এক রক্ষণশীলতার পক্ষাবলম্বন করে থাকে যা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও নানারূপ কূপমণ্ডূকতাকে প্রশ্রয় দেয়। গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকসহ আরও কিছু সংস্থার নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে যেসব কার্যক্রম আছে তার বিরুদ্ধে প্রচারণা ও সকল তৎপরতার পেছনে মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলভীদের ভূমিকা বা উস্কানির দৃষ্টান্ত রয়েছে। গ্রামে গ্রামান্তরে নারীর বিরুদ্ধে যেসব অবৈধ ফতোয়াবাজি ও তার পৈশাচিক কিছু বাস্তবায়নের ঘটনা জানা গেছে, যার কোন কোনটিতে অনেক হতভাগ্য নারী মৃত্যুবরণ করেছে, তার পেছনেও মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলভীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এমনিতেও গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে যেসব ওয়াজ মাহফিল হয় তাতে সাধারণভাবে কোরানের ব্যাখ্যা বা পয়গম্বরের জীবন আলোচনার চাইতেও অনেক বেশি আলোচিত-সমালোচিত হয় নারী ও আধুনিক জীবনব্যবস্থা। নারীকে কেবল সংসারের গণ্ডিতে স্ত্রী বা জননীরূপে অসূর্যম্পস্যা থেকে গার্হস্থ্য ও যৌনজীবনে আবদ্ধ প্রাণী হিসেবেই কল্পনা করা হয়। ইদানীং ক্ষেত্রবিশেষে নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সম্পর্কে কেউ কেউ ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও পর্দা মানার যে আবশ্যিক শর্তটি তারা জুড়ে দেন তার ব্যাখ্যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। শালীন সাধারণ পোশাকের অধিক পর্দার দাবি নিয়ে বাড়াবাড়ি অনেক সময় নারীর উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চাকুরির ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ সময় নারীকে গার্হস্থ্য কাজের বাইরে সীমিত কিছু কাজে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হয়। এটা নারীর পেশাগত উন্নতি ও সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণের তথা তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায়। এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের দেশে ধর্ম বিরাট ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় দেখা যায়, যুগোপযোগী ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহও ধর্মীয় ভাবাবেগ বা স্পর্শকাতরতার দোহাই দিয়ে পিছিয়ে পড়েন। নারীর বিরুদ্ধে অন্যায় ফতোয়া, গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের মত প্রতিষ্ঠানের নারীর জন্যে কল্যাণকর উন্নয়ন কর্মসূচির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাদের নিষ্ক্রিয়তার পিছনে এই মনস্তত্ত্বই কার্যকর ছিল।

তাছাড়া চাকরির বা বাইরের কাজে এমনকি গার্হস্থ্য ও সামাজিক কোন কাজ বা ঘটনায় নারী পুরুষের সাথে দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে পুরুষশাসিত এই সমাজ সাধারণত নারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এমনকি এরকম ক্ষেত্রে নারীকে হেয় করা, অপমান ও লাঞ্ছিত করা, কিংবা শাস্তি দানে সামাজিক নেতৃত্বকে খুবই তৎপর দেখা যায়। বলা বাহুল্য, নারী সুবিচার পায় না। নারীর বিরোধিতায় তৎপর এই সামাজিক নেতৃত্বের পেছনে মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলভীদের ভূমিকা থাকে প্রধান।

আর ধর্মের একচেটিয়া রক্ষাকর্তা হিসেবে মৌলভীদের রয়েছে ব্যাপক একতরফা প্রভাব। সেই প্রভাবকে সরকার ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, মসজিদভিত্তিক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার ও পরিবার পরিকল্পনার মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম শর্ত, তা সম্পাদনের কাজে ব্যবহার করতে চাইছেন। তাঁদের জন্যে প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রণোদনা কাজের নানা ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক সমাজে এর কোন ইতিবাচক প্রভাব এখনও অনুভূত হচ্ছে না। আমাদের সাধারণ সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী মোল্লা-মৌলভীদের কাছ থেকে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নারী নির্যাতনের পথের বাধা দূর করবার কাজে নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন এখনও আসছে না, এখনও বাধার পাল্লাই ভারী। বরং নিজেদের শিক্ষাগত ঘাটতির কারণে মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সুবিধাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে তারা প্রায়শই শোষিত-বঞ্চিতের বিরুদ্ধেই দাঁড়ান। যদি উন্নয়নের ধারণা থেকে সরকার-বেসরকারি উদ্যোগে যেসব নতুন চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা সনাতন রক্ষণশীল সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তায় আঘাত করে থাকে তাহলেও তা হয়ত তাদের অনেকের মধ্যে বিরোধিতার তীব্রতা হ্রাস করেছে, কারওবা বিরোধী মনোভাবের কিছুটা উপশম ঘটিয়েছে, কিন্তু এর সমর্থনে কর্মোদ্যোগে নেতৃত্ব দান ও ঝাঁপিয়ে পড়ার মত প্রণোদনা তৈরি হয়নি।

যে কোন ক্রান্তিকালীন পরিবর্তমান সমাজের মত আমাদের সমাজেও রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল ধ্যানধারণার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দ্বন্দ্বের একটি প্রকাশ ঘটে রক্ষণ ও অর্জনের দ্বন্দ্বে। অর্থাৎ রক্ষণশীলতা এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যখন তা নানা কিছু অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গোঁড়া মতাদর্শ প্রায়শই এই নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আমাদের সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের একটি বিরাট অংশ এই অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ গোঁড়া অন্ধ মতাদর্শের ধারক। তাছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষা ও প্রভাবে বৃহত্তর সমাজে সচেতনভাবে ধর্মচর্চার আগ্রহের চাইতে ব্যক্তিবাদী মৌলভী ও পীরের প্রভাব বেড়েছে। এরা এমনকি ইংরেজি শিক্ষিত বহু মানুষকে সংস্কারাচ্ছন্ন ও গোঁড়া মনোভাবের দিকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

বর্তমানে সমাজে বিভিন্ন দিক থেকে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রভাব থাকলেও এই সমাজব্যবস্থায় জীবিকা নির্বাচন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা একেবারেই কার্যকর নয়। সমাজে যেসব চাকরি ও জীবিকা মর্যাদাপূর্ণ ও সফল বলে বিবেচিত হচ্ছে তার কোনটিই মাদ্রাসা ডিগ্রির মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুৎপাদনশীল, অলাভজনক এই শিক্ষা একজনকে কেবল হতাশই করে না তার ভিতরে হীনম্মন্যতারও জন্ম দেয়। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে এই মনোভাবও কাজ করে থাকে।

ফলে এই শিক্ষা একটি উচ্চ ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের প্রচারণা চালালেও বাস্তবে শিক্ষা গ্রহণকারীদের তা ধারণ, লালন ও বর্ধনের পক্ষে কোন বাস্তব সহায়তা দিতে পারে না। এ অবস্থায় হতাশা, বিভ্রান্তি, হীনম্মন্যতা মিলে মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথোচিত ভূমিকা পালন করতে পারে না।

এই শিক্ষার ইতিবাচক দিক খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। নারী ও সংখ্যালঘু ভিন্নধর্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও এমনকি দরিদ্রের প্রতিও যথাযথ মানবিক চেতনার অভাব রয়েছে। দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে সরল বিশ্বাসী দরিদ্র মানুষকে ঝাড়ফুঁক, তাবিজ, পানিপড়া দিয়ে অন্ধকারে ঠেলে রাখতে ও

www.pathagar.com

অর্থনৈতিকভাবেও শোষণ করতে দেখা যায়। জীনের আছরের দোহাই দিয়ে নারী ও দরিদ্রকে নির্যাতনেও অংশ নিতেও দেখা যায়। এছাড়াও আধুনিক জীবনচেতনা ও জীবনাচরণের প্রতি নির্বিচারে বিরূপ মনোভাব, রাজনৈতিক ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাধারণত প্রগতিশীল চিন্তার বিরুদ্ধে গোঁড়া রক্ষণশীলতা, প্রায়শ প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান গ্রহণ এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এভাবে রক্ষণশীল চেতনার সাথে আধুনিক চেতনার দ্বন্দ্বে কেবল রক্ষণশীল অবস্থান গ্রহণই নয়, এই মনোভাব জিইয়ে রেখে ও উস্‌কে তুলে যে কোনভাবে সমাজে দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা ও উষ্মার ভাব জাগিয়ে রাখাই যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এমনকি ধর্মচর্চার যে ব্যক্তি প্রশান্তিময় ধারা আছে তাতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে বিশেষ মতবাদী রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা থেকে।

শেষ পর্যন্ত এ প্রশ্ন না উঠে পারে না, যে-শিক্ষার এত সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা তাতে কেন এত ছাত্র এখনও আসছে, ছাত্রসংখ্যাই বা বাড়ছে কেন? এর উত্তরে দুটি মূল কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, দারিদ্র্য— বহু মাদ্রাসায় ছাত্রদের বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে বলে দরিদ্র কৃষকমজুর শিক্ষার জন্যে মাদ্রাসার দ্বারস্থ হয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় বিশ্বাস—আমাদের সমাজে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, পরিবারে একজন মৌলভী হলে অধঃস্তন সাতপুরুষ পর্যন্ত বেহেস্তে যাবে। তাই দেখা যায়, অনেক পরিবারের অন্তত এক ছেলেকে মৌলভী বানানোর চেষ্টা করা হয়। এছাড়া মৌলভীদের অনেকে ও অনেক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ প্রভাব বাড়ানোর জন্যে নানাভাবে প্রচার চালিয়ে প্রভাব খাটিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে থাকে।

১৩. মধ্যপ্রাচ্যের ভাবাদর্শে চালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ

মোটামুটি স্বাধীনতার অল্প কয়েক বছর পর থেকে দেশীবিদেশী অর্থ সাহায্য নিয়ে ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কিছু কেজি পদ্ধতির স্কুল চালু হয়। এগুলোর নামকরণ থেকেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও অর্থের উৎস এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাদশাহ ফয়সল ইন্সটিটিউট, ১৯৭৬ সালে। এরপর কিং খালেদ ইন্সটিটিউট, বাদশাহ ফাহাদ ইন্সটিটিউট, মানারাত ঢাকা, চট্টগ্রামে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইন্সটিটিউট প্রভৃতি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যাদর্শে 'আদর্শ মানুষ' গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। বিশদ ব্যাখ্যায় এই আদর্শ মানুষ বলতে 'সৎ, চরিত্রবান ও প্রকৃত মোসলমান' (প্রসপ্রেকটাস, বাদশাহ ফাহাদ ইন্সটিটিউট) তৈরির আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে। নৈতিক শিক্ষার উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হলেও এর জন্যে ব্যবস্থা হিসেবে প্রধানত স্কুল সময়কালে নামাজ (প্রধানত জোহর) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া গোঁড়া থেকেই (কেজি থেকে) আরবি ভাষা এবং দীনিয়াত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। ফলে শৈশব থেকেই তিনটি ভাষা শিখতে হয় ছাত্রদের। যদিও এরাও কোরান ও দীনিয়াত পড়ে সাধারণ শিক্ষার ছাত্রদের মত অর্থ না বুঝে। মানারাতে সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যম। আরবি

www.pathagar.com

ও দীনিয়াত ব্যতীত অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ভারত থেকে মুদ্রিত পাঠ্য বইয়ের ওপর নির্ভর করা হয়। ছুটিছাটার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মেনে চলা হলেও জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত দিবসসমূহ যেমন শহীদ দিবস, নববর্ষ, বিজয় দিবসে প্রতিষ্ঠান ছুটি রাখা ব্যতীত কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের তথ্য পাওয়া যায় না। বাদশাহ ফয়সল ইন্সটিটিউটের অনুষ্ঠানাদির তালিকায় এসব জাতীয় দিবসতো নেইই, পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্র জয়ন্তী বা এগারোই জ্যৈষ্ঠ নজরুল জয়ন্তীর মত বাঙালি ঐতিহ্যের অনুষ্ঠান ও বাঙালি মনীষীকে স্মরণ করার কোন গরজ দেখা যায় না।

এসব প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটির ছাত্রী শাখা আছে, কোথাও প্রাথমিক পর্যায়ে সহশিক্ষাও আছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, বাঙালি সমাজে যে চিরাচরিত শালীনতা বোধ ও চেতনা নারীসমাজের মধ্যে চলে এসেছে তার সাথে সামঞ্জস্য না রেখে মধ্যপ্রাচ্য ও ইরানী ঐতিহ্যের পোশাক বা পর্দার ধারণা প্রচলনের চেষ্টা দেখা যায়।

এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মধ্যপ্রাচ্য ও ইরানি ধারার 'ইসলামী প্রগতিশীল' চেতনার প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু এটি তারা আয়ত্ত করতে চাইছেন মেয়েদের জন্যে সে ধরনের পোশাক প্রবর্তন, আরবি ভাষা শিক্ষা বাড়িয়ে এবং সেই সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করে। এর ওপরে রয়েছে ইংরেজি ভাষার বাড়তি চাপ ও বাংলা, বাঙালি কৃষ্টি এবং জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্য। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংকট, আত্মপরিচয়ের সংকট প্রবল হওয়ার কথা।

এসব প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটির বয়স প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত হলেও এখান থেকে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল করার রেকর্ড যেমন পাওয়া যায় না তেমনি সমাজে শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও পেশাগত জীবনে সাফল্যের নজিরও দেখা যায় না। ক্যাডেট, প্রি-ক্যাডেট, পাবলিক স্কুলের নামে এদেশে শিক্ষা নিয়ে বহুতর পরীক্ষা চলছে, তার মধ্যে এ ধরনের ইসলামী ভাবধারার আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বশেষ সংযোজন। শিক্ষাবিদ ও সমাজসচেতন মানুষ যে ক্ষেত্রে স্কুল পর্যায়ে অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলছেন সেখানে আরেকটি নতুন বিভাজনে কোন ভাল ফল কেউই আশা করেন না। জাতীয় চেতনার প্রতি উদাসীন, বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদৌ দেশ ও জাতির উপকারে লাগতে পারে কিনা সেটাই ভাববার বিষয়।

১৪. মাদ্রাসা শিক্ষা ও নারী

মাদ্রাসা শিক্ষার যে চিত্র আমরা দেখতে পেলাম তা এককথায় নারীর প্রতি সুবিচার করে না। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে এই শিক্ষায় বরাবর নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল সীমিত। মক্তবে বালিকারা যোগ দিলেও তারা গণ্য হয়েছে গৌণ ছাত্র হিসেবে, মুখ্য ছাত্র ছিল বালকেরাই। সাম্প্রতিক কালে মহিলা মাদ্রাসা চালু হলেও এখনও পর্যন্ত তার সংখ্যা একশ'র চাইতে বেশি হবে বলে মনে হয় না।[২০]

অধ্যক্ষা নূরজাহান আকবরের 'বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন' গ্রন্থে ৩২টি মহিলা মাদ্রাসার নাম আছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে মাদ্রাসার মোট ছাত্রের

www.pathagar.com

৯% ও শিক্ষকদের মাত্র ১% মহিলা। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয়িত মোট অর্থের শতকরা ৫ ভাগও নারীর জন্যে ব্যয়িত হয় না। দেড়শত বছরের সম্পূর্ণ উপেক্ষা আর বর্তমানে অংশগ্রহণ ও সুযোগপ্রাপ্তির হিসেব থেকে বলা যায় যে, জাতীয় বাজেটের এই বড় খাতে নারীর ভাগ অত্যন্ত কম। চলতি অর্থবছরের দুইশত কোটির মধ্যে নারীর জন্যে সর্বোচ্চ ব্যয় হতে পারে মাত্র ১০ কোটি টাকা।

এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও এ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী কাজে প্রশাসনিকভাবে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ। তাছাড়া গত দুই শতাধিক বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শাস্ত্রালোচনা, সামাজিক ধর্মীয় নেতৃত্বের যে ঐতিহ্য ও কৃষ্টি তৈরি হয়েছে তা গোঁড়াভাবে পুরুষপ্রধান। নারী চিরকাল এই নেতৃত্বের বাধ্যগত শ্রোতা ও অনুসারী থেকেছে মাত্র। পাঠ্যপুস্তকে, পাঠ্য বিষয়েও নারীর বিশেষ গৌরবময় অংশগ্রহণ বা নারীকে সেভাবে উপস্থাপনার কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। নবীর কন্যা, স্ত্রী বা এরকম ইসলামের আদিপর্বের মহীয়সী কিছু চরিত্র ব্যতীত সাধারণ পর্যায় থেকে কারও অর্জন-যোগ্যতার কথা দেখা যায় না। আর সামগ্রিকভাবে যে মনোভাব এ শিক্ষাঙ্গনে তৈরি হয় বলে আমরা প্রমাণ পাই তাও নারীর প্রতি প্রায়শই বিদ্বেষপূর্ণ। বিভিন্ন ঘটনায় নারীর স্বাধীন অবস্থান, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, উচ্চতর পদলাভ ও ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, এমনকি তাদের উচ্চতর শিক্ষার প্রতিও বিরুদ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে ভয়ানক তীব্রতায় এবং ভয়ঙ্কর নির্মমতায়।

তবে মহিলা মাদ্রাসা গোঁড়া মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার একধরনের সুযোগ তৈরি করেছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর এমন কোন কোন সমাজ আছে যেখানে ছেলেদের সাথে বালিকাদের পড়তে দিতে আপত্তি। সেরকম অঞ্চলে এই মাদ্রাসা, তার সকল ঘাটতি সত্ত্বেও পড়ার কিছুটা সুযোগ তৈরি করছে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, ভ্রান্তি এবং অকার্যকরতা মনে রাখলে সংশয় জাগা স্বাভাবিক যে, এই সুযোগ সত্যিকারের শিক্ষার সুযোগ কিনা। তবে এটুকু বলা যায়, যার মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা প্রবল এবং সত্যিকার জ্ঞানের জন্যে বাধা পেরুবার মনোবল ও সাহস আছে সে হয়ত এরকম সীমিত সুযোগ থেকেও বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সে তো ব্যতিক্রম। হয়ত তাই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলা মাদ্রাসার উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা বা অবকাশের কথা আমরা জানতে পাই না। আর সামগ্রিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কৃতি যেভাবে নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ, উপেক্ষাপ্রবণ, নির্যাতনমূলক তাতে এই শিক্ষায় নারীর মুক্তি সুদূরপরাহত বলেই মানতে হয়। আর জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর মুক্তির প্রশ্নটিকে যারা সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন তাঁরা এরকম একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় মুক্তি ও উন্নয়নের জন্যেও প্রতিকূল বলেই গণ্য করবেন।

১৫. ইসলামী ভাবাবেগ-চালিত অন্যান্য প্রকাশনা

আমরা আগেই বলেছি মাদ্রাসা মক্তব বা ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট শিক্ষায়তন ছাড়াও দেশে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে আরও বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেগুলো গ্রন্থ.

www.pathagar.com

সাময়িকী, পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকে। দেশে ইসলাম, ইসলামী ভাবধারা প্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি তাগিদ গত শতাব্দী থেকেই আমরা দেখে আসছি। এই তাগিদ থেকে সবসময় এদেশে নিছক ধর্মসাধনা ও চর্চার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের চাইতে বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ, মুসলমানদের প্রাধান্য বিস্তারের একটি সামাজিক রাজনৈতিক জঙ্গি মনোভাব ও কর্মপ্রয়াসের পরিচয় আমরা পাই। এর ভিতরে একটি বিবাদমুখর মনোভাব যেমন কাজ করে তেমনি এসব কার্যক্রমে সমাজে উত্তেজনার ভাব বিরাজ করতে থাকে। এটি সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার লেখনী, ওয়াজ মাহফিলের বক্তৃতা-বয়ান, এমনকি জুমার খোৎবাতেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। ফলে এদেশে ইসলামী সাহিত্যের নামে যা রচিত, প্রকাশিত হয় তার সিংহভাগই হল নিছক প্রচারমূলক, অগভীর তত্ত্বালোচনার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব জাহির। এই অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত দর্শন ও জ্ঞান সম্পর্কে ধারণাবিহীন একদেশদর্শিতা। এসব উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনা বা ভিন্নমতের প্রতি উগ্র অসহিষ্ণুতা, কুপিত মন্তব্য ও কঠোর হুঁশিয়ারি প্রকাশের মাধ্যমে তারা একধরনের অন্ধ উত্তেজনার খোরাক জোগায়। বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে কম করেও অর্ধশতক এ ধরনের নিয়মিত, অনিয়মিত সাময়িকী প্রকাশিত হয়। তাছাড়া এ ধরনের পুস্তকের সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইসলামিক একাডেমি কিছু বুনিয়াদী ও আকর গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে কিছু মৌলিক সাহিত্য ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িকী ও পত্রপত্রিকার মধ্যে ইসলামিক একাডেমি পত্রিকার অ্যাকাডেমিক কিছু গুরুত্ব আছে, বাকি অধিকাংশ পত্রিকা ও সাময়িকীর লেখনিতে হয় ভাবালুতা নির্ভর উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা নয়তো সস্তা রাজনৈতিক বাজিমাৎ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

পরিশিষ্ট ১ : সূত্র

১. বাঙালির ইতিহাস : আদিপর্ব—নীহাররঞ্জন রায়
বাংলা ও বাঙালি—আহমদ শরীফ
বাংলা ও বাঙালির কথা—আবুল মোমেন
২. Social and Cultural History of Bengal—M.A. Rahim
৩. তারিখ-ই-ফিরিশতায় এ উল্লেখ আছে।
৪. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস—আবদুস সাত্তার (মূল উর্দু গ্রন্থ তারিখ-ই-আলিয়ার অনুবাদ)।
৫. বাংলাদেশের শিক্ষা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—বাংলাদেশ লেখক শিবির (এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ 'বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষা : ঐতিহাসিক পটভূমি'—শহিদুল ইসলাম)
৬. প্রাগুক্ত সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ 'এ যাবৎ কালের শিক্ষানীতি ও বিকল্প কাঠামো'—আবদুল মতিন খান
৭. ঐ

www.pathagar.com

৮. প্রাগুক্ত সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধ 'বাংলাদেশের ধর্মশিক্ষার চালচিত্র'—আলী আনোয়ার

৯. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ—আবদুল হক ফরিদী

১০. জামাত নেতা দেলওয়ার হোসেন সাইদীর ক্যাসেট

১১. Girls and our School Education : Question of Equality and the Position of Women in our Education—Abul Momen

১২. বাংলাদেশের শিক্ষা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—বাংলাদেশ লেখক শিবির। প্রবন্ধ 'বাংলাদেশে ধর্মশিক্ষার চালচিত্র'—আলী আনোয়ার

১৩. ক. নাজিরহাট বড় মাদ্রাসা কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'মাসিক দাওয়াতুল হক' পত্রিকার জুলাই ১৯৯৫ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে (দরবারে দাওয়াতুল হক) একজন প্রশ্নকারিণীর প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে, 'কপালে টিপ দেওয়া মুসলমান মহিলাদের শোভা পায় না। হিন্দু রীতিনীতির আলামত হিসেবে এটা সমাজে প্রচলিত।' আবার চিঠিপত্র বিভাগে (পাঠকের কথা) জনৈতিক পাঠক প্রগতিশীলদের ধর্মীয় রাজনীতি ও মৌলবাদ ঠেকানোর আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে লিখছেন, 'ওদিকে বাংলাদেশেসহ বিশ্বজুড়ে দাবি উঠেছে মৌলবাদ ঠেকাও। অর্থাৎ নীতিবোধ, নীতিজ্ঞানকে ঝাঁটা দিয়ে তাড়িয়ে সুবিধাবাদের প্রচলন কর, ইচ্ছেমত চল, ইচ্ছামত জীবনকে ভোগ কর। শরাব-মদ-গাঁজা ও নারীদেহের জমজমাট ব্যবসা চালাও। ...'

খ. একই পত্রিকার অক্টোবর ১৯৯৩ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে জনৈক প্রশ্নকারী অমুসলিমদের নাবালেগ সন্তান মারা গেলে বেহেস্ত পাবে নাকি তার পিতামাতার মত দোজখ পাবে জানতে চেয়ে যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে বলা হয়েছে, 'অমুসলিমদের নাবালেগ সন্তান মারা গেলে বেহেস্তে যাবে না দোজখে যাবে এ নিয়ে বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। কাহারো মতে তারাও পিতামাতার সঙ্গে দোজখে যাবে।' ঐ সংখ্যায় তিন মেয়ের প্রশ্ন ছিল এরকম : পিতামাতার সংসারে বসবাসরত এক মেয়ে নিজে কোন উপার্জন করে না, এমতাবস্থায় সে যদি কোন জিনিস পিতামাতার অগোচরে কাউকে দান করে, তবে সেটা বৈধ হবে কি? উত্তর হচ্ছে—'হবে না'। কিন্তু ছেলের ক্ষেত্রে কী হবে তার উল্লেখ নেই।

গ. একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া জায়েজ কিনা এরকম এক প্রশ্নের উত্তরে জানানো হচ্ছে—যেসব অনুষ্ঠানে মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন কল্যাণ নেই, সেসবে সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থব্যয় করা ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। এটা অপচয়। কোন স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল দেওয়া, মাল্য প্রদান করা, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, খালি পায়ে বা খালি মাথায় থাকা পৌত্তলিকদের ধর্মানুষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্য বিধায় মুসলমানদের পক্ষে এসব অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়।'

www.pathagar.com

ঘ. জামায়াত সমর্থক বলে পরিচিত মাসিক মদীনার এপ্রিল '৯৫ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে স্বেচ্ছায় রক্তদান, মরণোত্তর চক্ষু বা অন্য অঙ্গদান ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কিনা জানতে চাওয়া হলে উত্তরে বলা হয়—'রক্ত দান করা নিষিদ্ধ নয়, বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। এ ছাড়া মানবদেহের যে কোন অঙ্গ জীবদ্দশাতেই হোক বা মরণের পরেই হোক দান বা বিক্রয় করা বৈধ নয়।'

১৪. জামায়াত সমর্থক মাসিক মদীনার এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে জনৈক ব্যক্তি মসজিদে ছেলেমেয়ে পড়ানো হারাম বলে ঘোষণা দেওয়ায় তার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখলে তার উত্তরে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য দেওয়ার পর মন্তব্য হচ্ছে—'ইদানীং মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলো উচ্ছেদ করে মুসলমান ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাটা বিদেশী বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মসজিদে পড়ানো হারাম এই বক্তব্য সেই শত্রু শিবিরের ষড়যন্ত্র কিনা সেদিকটাও বিবেচনা করা দরকার।'
ঐ একই সংখ্যায় এক পাঠিকা ব্র্যাকের স্কুলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন বলে চিঠি শেষ করেছেন আল্লাহর কাছে 'আমাদের তলোয়ারের ধার বাড়াইয়া দাও'—এরকম প্রার্থনা জানিয়ে।

১৫. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ—হাসান মোহাম্মদ

১৬. সূত্র ১৩-এর গ অংশ দ্রষ্টব্য

১৭. সূত্র ১২ দ্রষ্টব্য

১৮. পাক্ষিক পালাবদল, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ১-১৫ আগস্ট '৯৩

১৯. Social History of the Muslims in Bengal- Dr. Abdul Karim
The Bengal Muslims-Rafiuddin Ahmed
Islam in Bengal-Jagadis Narayan Sarkar

২০. বাংলাদেশের মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন-প্রিন্সিপাল মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর

পরিশিষ্ট ২ : সহায়ক গ্রন্থ তালিকা

১. Constitution of the People's Republic of Bangladesh (upto the amendment of 10th October 1991), Dhaka, 1993

২. Statistical year book of Bangladesh 1993, 14th edition, Bangladesh Bureau of statistics, Dhaka, 1994

৩. Bangladesh Educational Statistics, 1992
BANBAIS, Ministry of Education, March 1992 (statistics updated)

৪. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, মে, ১৯৭৪ (সাধারণ্যে কুদরাত-ই-খুদা কমিশন নামে পরিচিত)

www.pathagar.com

৫. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ (সাধারণ্যে মফিজুদ্দীন কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত)
৬. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (৪র্থ) ১৯৯০-৯৫
৭. মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ— আবদুল হক ফরিদী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
৮. মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা—এস.এম. জাফর, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮
৯. বাংলাদেশের শিক্ষা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত- বাংলাদেশ লেখক শিবির, ঢাকা, ১৯৯০
১০. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রকাশিত বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা, সমাজবিজ্ঞান গ্রন্থসমূহ
১১. মসজিদভিত্তিক সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার প্রকল্পের গ্রন্থসমূহ
১২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচালিত মসজিদভিত্তিক সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যবর্তীকালীন মূল্যায়ন, অক্টোবর, ১৯৯৪
১৩. মানারাত, বাদশাহ ফয়সল ইন্সটিটিউট, কিং খালেদ ইন্সটিটিউট, বাদশাহ ফাহাদ ইন্সটিটিউট প্রভৃতির পরিচিত পুস্তিকা
১৪. শিক্ষা সংক্রান্ত ইউনিসেফ রিপোর্ট
১৫. Independent Review of Bangladesh's Development 1994/95, Centre for Policy Dialogue, Dhaka, 19 April, 1995
১৬. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম কর্তৃক ইংরেজি History & Problems of Moslem Education in Bengal-এর বাংলা অনুবাদ)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯
১৭. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস—ডক্টর এম. এ. রহিম (অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান) ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২
১৮. History of Traditional Islamic Education in Bangladesh-Islamic Foundation, Dhaka, 1983
১৯. বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন—প্রিন্সিপাল মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮
২০. বার্ষিক প্রতিবেদন, মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ, ১৯৯২ ঢাকা
২১. ইমাম প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, মসজিদ সমাজ বাংলাদেশ, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৫
২২. বাংলা ও বাঙালি—আহমদ শরীফ
২৩. বাংলা ও বাঙালির কথা—আবুল মোমেন
২৪. আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস—আবদুস সাত্তার
২৫. Social History of the Muslims in Bengal—Dr. Abdul Karim
২৬. The Bengal Muslims—Dr. Rafiuddin Ahmed
২৭. Islam in Bengal—Jagadis Narayan Sarkar

www.pathagar.com

নারীশিক্ষা—উপবৃত্তি—নারীমুক্তি

শফি আহমেদ

একটা সময় ছিল—ঠিক ওয়ান্স আপন আ টাইম দূরত্বে নয়—এই বছর চল্লিশেক আগেও গ্রামের ও মফস্বল শহরের বিভিন্ন রুচিবান গৃহে নারীদের শিল্পসমৃদ্ধ সূচীকর্ম শোভা পেত। বিভিন্ন চিত্রীর কর্মের অনুকরণে সেগুলোর বেশকিছুতে নিচের দিকে শিল্পীর স্বাক্ষরও থাকত, শোভা, রাশেদা বা বিউটি প্রভৃতি। এরকম গৃহ-দেয়ালশোভন ফ্রেমে বাঁধানো এক দারুণ আপ্তবাক্য প্রচার প্রবণ শিল্পকর্মের কথা আমার মতো আরো অনেকের মনে আছে বলে বিশ্বাস করি। সেই বাস্তবধর্মী ও মধুশ্রবণ আপ্তবাক্যটা এখন আর তেমনভাবে বিভিন্ন বাড়িতে সাঁটা না থাকলেও তার কার্যকারিতা নিয়ে আমাদের সমাজে অন্তত পুরুষদের মধ্যে তেমন ভিন্নমতে বিকাশ ঘটেছে বলে মনে হয় না। ওই মিতকলেবর আপ্তবাক্যটির কথা সবার মনে পড়ে গেলেও আবার একটু তা উদ্ধৃত করি—'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। যখন এমন প্রবাদের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তখন ভাষা ও শব্দের নারীবাদী বিচার-বিশ্লেষণের ধারা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। তাই 'রমণী' শব্দের প্রয়োগের মধ্যে বিস্তৃত ব্যুৎপত্তি না নারীদের না গৃহস্বামী, কারো জন্যই বিব্রতকর ছিল না। যাই হোক, ওই প্রবাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার যে এখনো আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল, তার একটা দারুণ প্রমাণ পাওয়া যায় সাম্প্রতিক কালে বসুন্ধরা আবাসন প্রকল্পের বিজ্ঞাপনে। সেখানে জনপ্রিয় এক মডেল ওই কথাটি আবৃত্তি করেন। আর তার বিপরীতে এক রূপসীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অন্ত্যমিলসন্ধানী এক সংলাপ। যার মানে হল—অমন রমণীর সঙ্গে যোগ্য স্বামীর থাকারও দরকার আছে। মেয়েটি কিন্তু প্রকারান্তরে পুরুষের উচ্চারিত সেই ওয়ান্স আপন আ টাইম-মার্কা প্রবচনকে স্বীকার করেই নিচ্ছে। আর পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও যে বড় পরিবর্তন ঘটেছে তা বলা যাবে না।

যে বিষয় নিয়ে আলোচনার কথা, তার গৌরচন্দ্রিকা একটু বড়ই হয়ে গেল। আসল কথা বলতে চেয়েছি তা হল, এই নিটক অতীতেও (অথবা ঠিক এই আজকের দিনেও)

www.pathagar.com

মনে করা হত (হয়) যে,নারীর প্রধান অথবা নির্দিষ্ট জায়গা হল গৃহকোণ। নারী গৃহকর্মে নিপুণা এবং চুল বাঁধতে নিপুণা না হলেও বাঁধতে দক্ষ কিনা তাই ছিল তার যোগ্যতার মাপকাঠি। অর্থাৎ বিবাহিত অথবা সংসার জীবনে প্রবেশাধিকারের টিকিট। তিন দশক বামপন্থায় বিশ্বাসী শাসকদের অধীন থাকার পর আজকেও কলকাতা *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালে যে চিত্রটা বেরিয়ে আসে তা নেহায়েৎই হতাশা ব্যঞ্জক। যাই হোক, ওই যে সংসারে সুখআনয়নকারী নারীর কথা বলছিলাম, সেই নারী শিক্ষিতা হবে কিনা অর্থাৎ নারী-শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা এমন কোন সঙ্কেত ওই প্রবচনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নারীর শিক্ষা নিয়ে বহুকাল আগে থেকেই রামমোহন রায় এবং রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন সমাজে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রাখলেও বিষয়টা আর এগিয়ে যাবার মত গতি পায়নি। কেন, তার বিচার-বিশ্লেষন পাঠকদের জন্য বাহুল্য বিবেচনা করি। রোকেয়া নামের সামনে, তিনি নিজে ব্যবহার করেননি, এমন স্ত্রীবাচক বেগম শব্দ যোগ করে তাঁর নামে বিভিন্ন নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রীনিবাসের নামকরণ করে এই মহীয়সী নারীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে আমরা সীমাবদ্ধ করেছি। কিন্তু যে নারীর জন্য সংসার সুখের হয়ে উঠতে পারে, সেই বালিকা বা কিশোরীর শিক্ষা পাবার প্রয়োজন অধিকার কতটা আছে, সে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা আমাদের সমাজে তেমন করে জমে ওঠেনি। সাম্প্রতিককালে তার কিছু আলামত দেখা যায়। তার কিছুটা সমাজ সচেতনতার অংশ; আর অনেকটা শিক্ষা সেক্টরে অনেক টাকার যোগান দেয় এমন সব দাতা সংস্থার নারীশিক্ষা বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার জন্যে।

আরো কিছু বাস্তব কারণ আছে। নানান সামাজিক চাপে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনটা পুরুষরা নিজেদের স্বার্থেই অনুধাবন করতে পারছে। মা কিছুটা লেখাপড়া জানলে শিশুদের প্রথম দিক থেকেই লেখাপড়া চর্চায় বাড়তি গতি ও সাফল্য পাওয়া যায়। ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে মেয়েরাও এখন নিজেদের অনুকূল-প্রতিকূল বিষয়াদি সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। দেশের গ্রামাঞ্চলেও এখন নারীশিক্ষার প্রসার বেড়েছে কারণ স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব অনেক কমেছে,মেয়েরা অনেক কম কষ্টে স্কুলে যাতায়াত করতে পারছে। আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বিভিন্ন স্কুলে নারীশিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে। শিক্ষকের সংখ্যায় পুরুষদের আধিপত্যের প্রাবল্য মেয়েদের স্কুলে আসার ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলত, তার মাধ্যমে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ প্রবণতাকেও আমরা চিনে নিতে পারি। তবে এখানেও উল্লেখ করা দরকার যে, নারীশিক্ষকদের নিয়োগ দানের বিষয়টিও ঘটেছে আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাদের ক্রমাগত চাপে এবং তাদের প্রতি নির্বিকল্প আনুগত্যে আসক্ত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সক্রিয় উদ্যোগের ফলে। সত্যি কথা বলতে কি, দেশের নানা অপছন্দ ও বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও একটা গর্ব করার মত বিষয় আমরা অর্জন করেছি,তা হল, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় 'ভর্তির ক্ষেত্রে' ছেলে-মেয়ের বৈষম্যহীনতা।

www.pathagar.com

'ভর্তির ক্ষেত্রে' শব্দ দুটির ওপর যে আলাদা জোর দিলাম, তার মাধ্যমেই এই লেখার মূল বিষয়টায় প্রবেশ করতে চাই। দেখা যাচ্ছে, নার্গিস, মিনা, সুচিত্রা, সুপ্রিয়া, শাবানা, ববিতা, করিমন, নসিমন—সবাই স্কুলে ভর্তি হতে আসছে। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী পরিস্থিতি কম-বেশি অপরিবর্তিত থাকলেও তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে দেখা যাবে, করিমন আর নসিমন ক্লাসে নেই। বেশি খোঁজখবর না নিয়েও বলা যায়, করিমনের আর একটি বোন বা ভাইয়ের জন্মগ্রহণের ফলে ঘরদুয়ারের কাজকর্মে তার অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে এবং ক্ষেতখামারে ফসল না হওয়ার ফলে নসিমনের বাবার আর মেয়েকে খাতা-পেন্সিল কিনে দেওয়ার ক্রয়ক্ষমতা নেই, অতএব সেও আর স্কুলে আসছে না। তাদের আরো দুই বন্ধুকে শারদীয় অবকাশের পর আর স্কুলে দেখতে পাওয়া যায় না, কারণ ইতোমধ্যে নদী ভাঙনের ফলে গ্রামের যে অংশ বিলীন হয়ে গেছে, তার ভুক্তভোগী ওই পরিবার। বাধ্য হয়ে শহরের পথে অজানা ঠিকানায় চলে গেছে। অতএব, ভর্তি হওয়া এবং লেখাপড়া ঠিকমত চালিয়ে যাবার মধ্যে শুভঙ্করের চেয়ে অধিকতর মাপের ফাঁকি রয়েছে। এই ফাঁকিটার যে একটা অকাট্য সমাধান আছে, দারিদ্র্য বিমোচন, তার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদি নানা উদ্যোগের পরও আমাদের মধ্যে এই প্রতীতি জন্মাচ্ছে যে, সত্যিই দিল্লী দূর অস্ত।

এই ফাঁকিটাকে উপশমবাচকভাবে সাময়িক পূরণের অংশ হিসেবে আমাদের দেশে নব্বই—এর দশকের শেষ দিকে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা লাভকে সহায়তা প্রদানের জন্য 'শিক্ষার জন্য খাদ্য" (Food for Education) নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। হতদরিদ্র পরিবার থেকে আসা শিশুরা স্কুলে পড়াশোনার বিনিময়ে নির্দিষ্ট বিরতিতে কিছু পরিমাণ গম পেত। এতে পারিবারিক দারিদ্র্য কিছুটা কমত এবং এমন বাড়তি বাস্তব সুবিধা লাভের আশায় দরিদ্র পিতা-মাতারাও শিশুদের স্কুলে পাঠাতে প্ররোচিত বোধ করে। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে খুবই সুফলপ্রত্যাশী, কিন্তু এর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত স্থানীয় প্রশাসন, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, এলাকার প্রভাবশালী মানুষজন এবং এমনকি স্কুলে কতিপয় শিক্ষকের দুর্নীতি পরায়ণতায় এই উদ্যোগ সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ওই একই সময়ে তৎকালীন সরকার মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর জোর দেবার অভিপ্রায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত বালিকা-কিশোরীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেন এবং পরবর্তী সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের রীতি প্রচলন করা হয়। মেয়ে-শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচলিত এই প্রকল্প সাধারণভাবে দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করে। দরিদ্র পরিবার থেকে আসা মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি এই উপবৃত্তি প্রদানের সপক্ষে একটি প্রধান যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নারীশিক্ষার প্রসারে এই উদ্যোগ যে বিশেষভাবে ইতিবাচক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু প্রকৃত নারী উন্নয়নে বা নারীর ক্ষমতায়নে এই উপবৃত্তি সত্যিই কোন সদর্থক প্রভাব ফেলেছে কিনা এবং পরবর্তী কালেও তেমন কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে কিনা—এই বিষয় আমাদের মধ্যে নানা সংশয় জাগায়। এটা খুবই সত্যি কথা যে,

www.pathagar.com

ক্ষমতায়নের একটা প্রাথমিক ও অর্থবহ সূচনা এর মাধ্যমে ঘটে। সাম্প্রতিক কালে দেশের বিভিন্ন মফস্বল এলাকায় আমার মত অনেককেই নিশ্চয়ই একটি দৃশ্য আনন্দ দেয়, আর তা হল, মাঠের আল দিয়ে বা রাস্তার ধার ঘেঁষে স্কুলগামী মেয়েদের ছন্দময় অভিযাত্রা। এই বয়সে মেয়েরা বাড়ির বাইরে আসছে প্রতিদিন। প্রতিদিনের যাওয়া-আসার পথে নিজেদের মধ্যে নানান আলাপ-আলোচনা করছে, সেই আলোচনার তালিকায় হয়ত টেলিভিশনে সিরিয়ালের গল্প, সংসারের নানান অভাব, চাচাত বোনের বিয়ে—এমনকি হাসিনা না খালেদা কাকে ভালো লাগে ইত্যাদি নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। আরো থাকতে পারে স্কুলে পড়ার বিষয়। কোন কোন শিক্ষকের সদাচরণ বা অসদাচরণ। আর এর মাধ্যমে এই বয়সী মেয়েরা যাদের অনেকেই এখনো ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী, তারা জাগতিক অনেক বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বর্তমান সমাজ-কাঠামোয় নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা প্রাথমিক ধারণা জন্মায়। এই সচেতনতা তাকে তার অবস্থান গড়ে নেবার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সে যুক্ত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এমন কিছু থাকে যা ছেলেদের মত মেয়েদের মধ্যেও পৃথিবী ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে। সমাজ ও সনাতন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়ে যায় কিশোরীর মনের ভেতর এবং অনেক সময়ই আমাদের অভিজ্ঞতায় যেমন দেখা গেছে, পড়াশোনার অধিকতর মনোযোগী হওয়ার জন্য মেয়েরা ছেলে-শিক্ষার্থীর চেয়ে শ্রেণী কক্ষের ভেতর ও বিভিন্ন সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল ফল করছে। এর মাধ্যমে ওইসব মেয়েদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে যে, তারাও পারে, কৃতিত্ব দেখানোর দৌড়ে তারা পিছিয়ে নেই, গ্রামের মওলানা-মৌলভীরা যে মেয়েদের পশ্চাৎপদতা ও কুণ্ঠিত অবস্থান বিষয়ে মন্তব্য করে থাকেন বাস্তবে তা সত্যি নয়। প্রশ্নাতীতভাবে তাঁদের কথাকে মেনে নেবার ব্যাপক প্রবণতা তাদের আর অতটা গ্রাস করতে পারে না। আর মেয়েদের মধ্যে যে এই নবতর ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে তাদের স্কুলমুখী হবার বাস্তবতা। এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

তবে একই সঙ্গে এটাও দেখা দরকার যে, এই চিত্রটা কতটা সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় এবং যে কারণে উপবৃত্তির পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তা কি সরকারের অন্য যে কোনরকম রুটিন বা দায়সারা কাজের মধ্যে পড়ে, না কি যারা এই প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছেন, তাদের মধ্যে সমাজ-সংগঠন পরিবর্তনের একটা আকাঙ্ক্ষা কাজ করে বা তারা সত্যি নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নিয়ে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে শিক্ষার প্রসারকে একটি উপাদান বিবেচনা করেন এবং মেয়েদের শিক্ষা পাবার অধিকারকে একটি অতিআবশ্যিক শর্ত বলে গণ্য করেন। তারা এই সবগুলোর মধ্যে যে ধারাবাহিকতা ও যুক্তিপরম্পরা আছে তা জানেন কিনা অথবা তার প্রয়োগে আন্তরিক কি না তাও বিচার্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা এমনই এক উপাদান যে, তা সত্য ও বাস্তব সম্পর্কে আমাদের নিরন্তর সন্ধানী করে তোলে ও যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনায় প্ররোচিত করে। অন্তত শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য যে এই, তা নিয়ে কেউ নীতিগতভাবে দ্বিমত

www.pathagar.com

পোষণ করতে চাইবেন না। ব্যাপারটা যদি এমনই হত, তা হলে ষোড়শ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁস বিস্তৃত ও বিকশিত হবার পর থেকে অথবা আমাদের এই অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-আন্দোলনের প্রসারের ফলে সমাজ-সংগঠনের মধ্যে যে ধরনের কাঠামো গড়ে ওঠার কথা, বিশেষত নারী-পুরুষ বৈষম্য অবসানের ক্ষেত্রে, তেমনটার পরিচয় কি পাই আমরা? আমাদের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত যেহেতু নারী, তাই এই বিষয়টার উত্থাপন খুবই প্রাসঙ্গিক ও জরুরি। সাধারণভাবে স্কুল-শিক্ষা মানে একটা নির্দিষ্ট পাঠক্রম। তা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, সুচয়িত ও সুপ্রণীত হতে পারে। কিন্তু শিক্ষাক্রমের ভূমিকা ও উপসংহারে যেসব মহৎ বুলি সংগ্রথিত করা হয় তা আসলে 'বিমূর্ত' শব্দাবলি।

শিক্ষার সকল মহৎ উদ্দেশ্যকে প্রায় নির্বিচারে গ্রহণ করার পরেও একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তো আমাদের বিদ্ধ করতেই পারে। শিক্ষা যদি যুক্তিবাদী চিন্তার প্রকৃত সুতিকাগার হয়, তাহলে নারীশিক্ষার বিষয়টা অগ্রাধিকার পাক বা না পাক, নারীরা কবে থেকে বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে এলো অথবা তারা বাইবেল পড়ছে না অন্য কোন আসমানী কিতাব পড়ছে এই বাস্তবতাকে পাশে সরিয়ে রেখেও তো প্রশ্ন তোলা যায় যে, শিক্ষিত পুরুষরাই শিক্ষা অর্জন করার সূত্রে এমন যুক্তিবাদী মন ও মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠবেন, সমাজ-কাঠামোকে এমনভাবে বিচার-বিবেচনা করতে পারবেন যার মাধ্যমে তারাই বুঝবেন যে, এই কাঠামোয় নারীকে অযৌক্তিকভাবে অধস্তন করে রাখা হয়েছে। নারীর মেধা ও যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার যে ক্ষমতা পুরুষের রয়েছে তারা তা প্রয়োগ করবেন, এমনটাই সমীচীন। কারণ, শিক্ষা তাদের এখন আলোকিত করেছে ও সত্য সম্পর্কে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সমাজসচেতন করে তুলেছে।

কিন্তু ইউরোপ ও আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা বলে, পুরুষ কর্তৃক অর্জিত শিক্ষা এবং কালপরম্পরায় তার প্রসার সমাজ-সংগঠনে তেমন প্রকারের কোন অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, কাঙ্ক্ষিত অবস্থা তো সৃষ্টি হয়ইনি, বরং অনেক সমাজে (আমাদেরটাও বোধ হয় তার অন্তর্ভুক্ত) পুরুষের শিক্ষালাভ নারীকে সমাজের আরো পেছনের কাতারে ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষা থেকে পুরুষ যা পাওয়ার তা (অধি) গ্রহণ করেছে এবং তার মাধ্যমে সে যে ক্ষমতা অর্জন করেছে, তার পরিপূর্ণ এমনকি মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার সে করেছে। প্রাথমিকভাবে সে নিজেকে নারীর চেয়ে শ্রেয়তর অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে শিক্ষাকে একটি বাড়তি হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে, আবার অশিক্ষিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগোষ্ঠীর ওপরও কর্তৃত্ব করার অধিকারও সে লাভ করেছে শিক্ষালাভের প্রতিক্রিয়ায়। অতএব, শিক্ষা যে শুধু নারী-পুরুষের চিরাচরিত বৈষম্য আলাদা করে তুলে ধরেছে তা নয়, শিক্ষা ব্যাপকভাবেই এই বৈষম্যের প্রতিষ্ঠানিকীকরণ, স্থায়ীকরণ ও নৈতিকতা নিরপেক্ষ যুক্তি গ্রাহ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে। তা না হলে পুরুষের শিক্ষালাভও জেন্ডারসুষম একটা সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যথাযথভাবে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু ইতিহাস তো এ পর্যন্ত তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে না।

www.pathagar.com

এরকম একটি অনস্বীকার্য তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত মেয়েদের শিক্ষালাভের সুবিধার্থে গৃহীত উপবৃত্তি কার্যক্রমকে বিশ্লেষন করতে হবে। এই উপবৃত্তি প্রদানের মধ্যে যে সব সুলক্ষণ আবিষ্কার করা যাবে, সেগুলোকে নাকচ না করেই ভিন্নমাত্রিক বিচারকে গ্রহণ করা যায় বলে আমার বিশ্বাস। একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই এই আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে এবং আমাদের দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতেও বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার বয়স ছয় বছর। এই ছয় বছরের মধ্যেই শিশুও তার শৈশবসুলভ অভিজ্ঞতার নিরিখে টের পায়, পরিবারের মধ্যে ভাইয়ের কদর বেশি এবং বোনের প্রতি অপেক্ষাকৃত অবহেলা সামাজিকভাবে যে খুবই গ্রহণযোগ্য, এমন একটা পরিবেশকেই ন্যায্য ও নির্বিরোধ হিসেবে গণ্য করে মেয়েশিশু স্কুলে যাবার বয়সে পৌঁছে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করার বয়োসীমার মধ্যে সমাজকাঠামোর অন্তঃস্থিত বৈষম্যের সঙ্গে তার পরিচিতি বাড়তে থাকে নিত্যদিন। অভিজ্ঞতা লাভের এই সমগ্র প্রক্রিয়া তার মনের অবচেতনে সমাজধর্ম মান্য করার বা নারীর অবস্থানের সুনির্দিষ্টতা গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তোলে। সমাজ থেকে তার লেখার পরিমাণটা বাড়তে থাকে এবং সম্ভবত, স্কুলে থেকে সে যে সাধারণ শিক্ষা পায় তার চেয়ে আরো বহুকৌণিক মাত্রায়। কৈশোরের একটা পর্যায়ে ওই মেয়েটি দেখে কোথায় কী করতে হবে, কী কী করলে বা না করলে ভালো ইত্যাদি বিষয়ে তার সমবয়সী ছোট ভাইও তাকে নির্দেশনা দেয় এবং আরো দেখে যে, তাদের অগ্রজ কিশোরীরা যেসব নির্দেশনা মেনে নিয়ে তাদের জন্যে আগে থেকেই একটা 'ঐতিহ্য' সৃষ্টি করে রেখেছে, তখন এর প্রতিকারের কোন ধরনের প্রয়োজনীয়তা আছে, এমন প্রশ্নও সাধারণভাবে তাকে বিচলিত করে না। সমাজের এমন সব পরিচর্যা ও পরিচর্চার মাধ্যমে লালিত একটা মানস-সংগঠন নিয়ে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার আরা যেসব সহপাঠী বন্ধু ছিল, তাদের অনেকের ঝরে পড়ার বেদনার অভিজ্ঞতা বহন করে একজন কিশোরী এসে ভর্তি হয় মাধ্যমিক স্কুলে।

পরীক্ষায় কিছুটা ভালো ফলাফল করার জন্য সে হয়ত একদিন বুঝে নিয়েছিল, ছেলেদের চেয়ে তার মেধা কম নয়। এবার সে আর একটা সত্য বুঝতে পারে, বাড়িতে ছোট ভাই যতই বাড়তি প্রশ্রয় পাক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অন্তত সরকার তাকে ছেলেদের চেয়ে অনেকটা বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে, সে উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছে তা পড়াশোনা চালিয়ে যাবার জন্য এবং এই সুযোগটি তার ভাইয়ের জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু মূলকথাটা হল, তার অনুভবের জায়গাটা এই সীমিত সুখভাবনার মধ্যে আটকে থাকতে পারে না। হয়ত খুব বেশিদিন লাগে না, মা-বাবার আচরণ থেকেই সে বুঝতে পারে, সরকার যদি এই নির্দিষ্ট অঙ্কের উপবৃত্তি না দিত, তা হলে সাংসারিক কষ্ট স্বীকার করে বাড়ি থেকে ভাইয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হলেও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সে ঠিকই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকত। অনেক ক্ষেত্রে এই উপবৃত্তি দেবার সময় শিক্ষকদের আচরণেও এমন একটা করুণাপ্রবণ ভাব থাকে, যা ওই বয়সের মেয়েটি সহজেই শনাক্ত করতে পারে। একটু বাড়তি অভাবী পরিবারের ক্ষেত্রে মা-

www.pathagar.com

বাবাও টাকাটা যে দ্রুততায় মেয়েটির কাছ থেকে নিয়ে নেয় অথবা মেয়েটির হাতে পৌঁছানোর যে কোন ঝুঁকি এড়াতে তারা নিজেরাই স্কুলে গিয়ে ওই উপবৃত্তির টাকা নিয়ে আসে, তাতে ওই শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে বুঝতে পারে অথবা এই বোধের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে যে, কোনটা আসলে জরুরি, তার নিজের লেখাপড়া না কি তার মাধ্যমে যৎকিঞ্চিৎ হলেও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি। এই ভাবনাটা একজন সম্ভাবনাময় কিশোরীর মধ্যে আকস্মিকভাবে উদিত হয়ে বৈশাখের একপশলা বৃষ্টির মত আবার হঠাৎ উধাও হয়ে যায় না। বরং সমাজের আরো বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা থেকে তার আহৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিষিক্ত হয়ে তার মনের মধ্যে এমন একটা ভাবনা প্রস্তরের মতো ভারী হয়ে ঝুলে থাকে যে, তার শিক্ষালাভ পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা রাখল অথবা এই শিক্ষা থেকে তার ব্যক্তিগত কী অর্জন ঘটল, তার চেয়েও কাঙ্ক্ষিত বিষয় হল উপবৃত্তির অর্থলাভ।

মেয়েশিক্ষার্থী নারী-পুরুষের বৈষম্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার চেয়ে তার প্রত্যক্ষত স্থিতাবস্থাকে মেনে নিতে আগ্রহী বা প্ররোচিত বা বাধ্য হয়। তার সহপাঠী ছেলেরাও একথা বুঝতে পারে যে মীনা, রাণু ও কাজল মেয়ে বলেই এই উপবৃত্তি পায় এবং অবচেতনে শিখে নেয় যে, মেয়েদের জন্যে সামাজিকভাবে এমন বাড়তি সাহায্যের দরকার আছে। সাধারণভাবে এটাকে একটা ইতিবাচক লক্ষণ বলে গণ্য করা যেত। কিন্তু সমগ্র সমাজকাঠামোর মধ্যে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এমন সুপিরিয়টি কমপ্লেক্স দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত যে, সহপাঠী বালক মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের রীতি থেকে যা শেখে তা হল, সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মেয়েদের এমন পরনির্ভরতা একটা অপরিহার্য বিষয়। নারীপক্ষ গ্রহণের যুক্তিটাকে একটু পাশে রেখে অন্য একটা বিপর্যয়কর কথা এখানে উল্লেখ করে নেয়া ভালো। উপবৃত্তি বিষয়ক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলে-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বিশেষত, তা লক্ষ করা যেতে পারে, যখন একই আর্থিক সক্ষমতার পটভূমি থেকে আসে ছেলে ও মেয়ে একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করছে, অথচ সুযোগের ভিন্নতার জন্য ছেলেদের মনে বঞ্চনার অনুভব সৃষ্টি হচ্ছে। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে ছেলেরা ওই পর্যায়ে লেখাপড়ায় কিছুটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, এমনকি ঝরে পড়ার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। লেখাপড়ায় মেয়েদের আগ্রহ হারানোর বিষয়টাও আমাদের গভীর মনোযোগ দাবি করে। যেসব মেয়ের বাড়ির পরিবেশ অতটা শিক্ষাবান্ধব নয় এবং সে কারণে শিক্ষালাভের গুরুত্ব ও পরবর্তী কালে এর প্রভাব সম্পর্কে যারা ও যাদের মা-বাবা তেমনভাবে সচেতন নয়, তারা এটা বুঝে নেয় যে, স্কুলে উপস্থিতি ও সাধারণ মানের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে উপবৃত্তি পাওয়ার নিশ্চয়তাই হল আসল কথা, অন্তত তার পরিবার তাই চায়। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো মেয়ে-শিক্ষার্থীরাও পড়াশোনার প্রতি মৌলিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তারা শুধু নিজেদেরকে অনুদান পাবার উপলক্ষ বলে বিবেচনা করে।

www.pathagar.com

শিক্ষালাভের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন এভাবে তার মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়। শিক্ষা থেকে আমরা কী অর্জন করি, এমন একটা তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ আগে উল্লেখ করেছি। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে পড়ছে, একই পাঠ্যক্রমের অধীনে,—এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু উপবৃত্তির মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষার বাড়তি সুযোগ তৈরি করে দিলে উন্নয়নের হিসেবটা কতটা মেলে, তার বিচার-বিবেচনা আমাদের জন্য জরুরি। বাড়ির ভেতরে বসে কিছুই না পড়ে অথবা কিছুই না বুঝে আরবী অক্ষরে কিছু শব্দাবলি গলাধ:করণ করে মেয়েরা যা শেখে সেই তুলনায় স্কুলের গণ্ডিতে প্রবেশ করে তারা আলাদা পৃথিবীর অংশীদার হয়ে ওঠে সেকথা স্বীকার করেছি আগে। কিন্তু আমরা যে মেয়েদের কথা বলছি, তারা যে শিক্ষাক্রমের অধীনে উপবৃত্তির সহায়তায় যে পাঠ লাভ করে, তা থেকে তারা দিনশেষে কী পায়! প্রাথমিক বা মাধ্যমিক যে পর্যায়ের কথাই বলি না কেন, আমাদের শিক্ষাক্রম তো অনেক সংখ্যক কর্মশালার পর, অনেক তথাকথিত আধুনিকতামুখী সংস্কারের পর, এখনো প্রবলভাবে পুরুষতান্ত্রিকতাচ্ছন্ন। তাই উপবৃত্তিভোগী মেয়েরাও শিক্ষার আলোক লাভের মাধ্যমে যা শিখছে তা হল, সমাজ সংসার সর্বত্র পুরুষরাই প্রধান, মেয়েরা বড় জোর সহযোগী শক্তি হিসেবেই তাদের আসন পেতে পারে। ফলত, এই প্রথাগত শিক্ষা যেমনভাবে আমাদের দেশে প্রচলিত হবার অর্ধশতক পরেও পুরুষের মানসিকতায় নারী-পুরুষের বৈষম্যের দিক থেকে কোন ন্যায্যতার মনোভঙ্গি সৃষ্টি করতে পারেনি, তা একইভাবে নারীর মস্তিষ্কের মধ্যে চালান হয়ে গিয়ে সমাজ-সংগঠনের বর্তমান কাঠামোকে স্বীকার করে নেবার মানসিকতারই জন্ম দেয়। উপবৃত্তির মাধ্যমে লভ্য শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের মধ্যে কোন সেতুবন্ধন রচিত করা গেছে, এমন দাবি করা যাবে না। আর নারীমুক্তির কোন নিশানাও তো এ থেকে বার করা যাবে না।

পরিবারের ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে উপবৃত্তিপ্রাপ্তি যেমনভাবে গরিব মাতা-পিতাকে কন্যাসন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত করেছে, ঠিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার সমাজের ঐতিহ্য চিহ্নিত রক্ষণশীলতাও প্রশ্রয় পেয়েছে। দরিদ্র পরিবার প্রায় এ কথা ভাবছেই না যে, এই শিক্ষা তার মেয়ের মধ্যে বাড়তি আস্থা বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে অথবা এই শিক্ষা তাকে প্রয়োজনে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। মাতা-পিতার ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই সমাজব্যবস্থার রক্ষণশীলতা-নিয়ন্ত্রিত। তারা উপবৃত্তি সহায়তাপ্রাপ্ত মেয়ের শিক্ষালাভকে তার জন্য একটু ভালো জামাতা লাভের সম্ভাব্য সোপান হিসেবেই বিবেচনা করে, তার অধিক আর কিছু নয়। আর উপবৃত্তি প্রাপ্ত মেয়েটিও চেতনে-অবচেতনে তার মাতা-পিতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই লালন করে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের অভিজ্ঞতা সে সুখবর তা তো বলা যাবে না। পূর্বে যে আলোচনা করেছি তার ভিত্তিতেই এটা পরখ করে নেয়া যায়। যার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হল, সেই পুরুষতো জন্মগতভাবেই এই সমাজের আধিপত্যবাদী মানসিকতার উত্তরাধিকার বহন করতে অভ্যস্ত ও গর্বিত, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তার ধ্যান-ধারণাকে আরো পরিপুষ্ট করেছে এবং উপবৃত্তির মাধ্যমে লাভ করা মেয়েটির শিক্ষাও তার মধ্যে শুধু বাড়তি

www.pathagar.com

আনুগত্যবোধের জন্ম দেয়, আর সে তাতেই অতীব খুশি বোধ করে। যে পারিবারিক ও পুরুষশাসিত কাঠামোর মধ্যে সে বড় হয়ে উঠেছে, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অস্ফুট বেদনাকে ধারণ করেছে, পিতৃগৃহে বা বিদ্যালয়ে নানা প্রতিকারহীন পরিস্থিতি শিক্ষা হয়েছে উত্তর-জীবনে সে আবার তারই পরিপোষণা করে, উপবৃত্তিনিঃসৃত শিক্ষা তাকে আর 'মানুষ' হয়ে ওঠার অবকাশ দেয়নি। 'মেয়ে-জীবন' থেকে তার মুক্তি নেই।

সমাজদর্শনের দিক থেকে যদিও কথাটা তেমন জরুরি নয়, তবে ব্যুৎপত্তিমূলক অর্থে উপবৃত্তি শব্দটিই একটা বৈষম্যমূলক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা নিজেদের যোগ্যতর মেধার পরিচয় দেয়, তাদের ওই দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী তার এবং ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষালয়ের জন্য বিশেষ গৌরব বহন করে আনে। কিন্তু মেয়েদের প্রতি শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির এই বর্তমান অনুদান স্বাভাবিক কারণেই বৃত্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, এর নাম দেয়া হয়েছে উপবৃত্তি, অর্থাৎ এটা অর্জনের জন্য কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি নেই। একমাত্র যোগ্যতা হল সে একজন মেয়ে-শিক্ষার্থী। এমন মেয়েরা শুধুই উপবৃত্তি পাবার যোগ্য। যদিও অনেক মেয়ে-শিক্ষার্থী আছে এবং সুখের কথা যে, তাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, যারা নিজেদের কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি পায়। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, উপবৃত্তিপ্রাপ্ত মেয়েরা যে শুধুই কিছু শিক্ষক, তাদের ছেলে—সহপাঠীদের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যাচ্ছে তা নয়, পড়াশোনায় অধিকতর সফল তাদের অন্যান্য মেয়ে-সহপাঠীরাও তাদের করুণার চোখে দেখে থাকে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সমাজের দুই প্রধান বৈষম্যের এলাকা,—ধনী ও দরিদ্র এবং নারী ও পুরুষ। সমাজের বহু শতাব্দী পুরানো এই বৈষম্যের পাহাড়প্রতিম সমস্যার বিপরীতে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য উপবৃত্তি ব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘ ও তীব্র খরায় ফেটে চৌচির মাঠে এক বালতি জল ঢালার উদ্যোগের তুলনা করা যেতে পারে। সীমাহীন দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের একটি মেয়ে স্কুলে যাওয়ার সুবাদে পাওয়া কয়েকটা টাকা কখনো চাল-নুন কেনা, কখনো মেয়েটির উকুন বিতাড়নের সাবান ক্রয়ে ব্যয়িত হয়ে যায় লেখাপড়া তখন হিসেবের সীমানার ওপারে থাকে শুধু মেয়ে হিসেবে আলাদাভাবে ওর এই টাকা পাওয়ার যোগ্যতা অভাবী সংসারের নারী-পুরুষ বৈষম্যহীন ক্ষুধার খাতে ব্যয়িত হয়। শিক্ষালাভ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় এক কিশোরীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের রেখার মত মিলিয়ে যায়।

অভিজ্ঞতায় আরো এক করুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। অভাবকে মেনে নিয়েছে আজীবন দরিদ্র মাতা-পিতা। উপবৃত্তির টাকা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং গরিব মেয়েটির মেধা এমন ত্রিবেণী মিলনের মেয়েটি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। শিক্ষার আলোকিত জগৎ তাকে আরো দূর পথের হাতছানি দিয়েছে। কিন্তু উপবৃত্তির টাকা অত দূর পর্যন্ত দেয়া হয় না। আকুল নয়নে গ্রামের যে মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এরপর সে কী করে পড়াশোনা করবে, কিন্তু আমি তার প্রতি ছুঁড়ে দিতে পারি আমার নিরুত্তর হতাশা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে নারীশিক্ষা : মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে একটি সমীক্ষণ

মাসুদুজ্জামান

এ দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ধারাবাহিকতার সূত্রে গড়ে উঠেছে মাধ্যমিক শিক্ষা। অনুন্নত একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে, ফলে মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষার চিত্র যে আশানুরূপ হবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।[১] তবু বৈশ্বিক ও জ্ঞাতীয় উন্নয়নের অংশ হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তাই অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সম্পর্কে জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে (বেইজিং) বলা হয়েছে :

> শিক্ষা একটি মানবিক অধিকার এবং সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্য অর্জনের একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। বৈষম্যহীন শিক্ষা ছেলে-মেয়ে উভয়েরই উপকার করে। এভাবে শেষ পর্যন্ত নারী-পুরুষের মধ্যে আরো বেশি সমতাভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অবদান রাখে। অধিকসংখ্যক নারীকে যদি পরিবর্তনের বাহক হয়ে উঠতে হয় তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগের ক্ষেত্রেও তা অর্জনে সমতা থাকা প্রয়োজন। পরিবারে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সমাজে শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। মেয়ে ও নারীদের জন্য আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের মাধ্যমে অত্যন্ত উঁচু মাত্রার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান পাওয়া গেছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা স্থায়ী ও স্থায়ী হওয়ার যোগ্য টেকসই উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায়।[২]

শুধু সাম্প্রতিক এই ঘোষণা নয়, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণাতেও (ধারা ২৬, ১৯৪৮) সুস্পষ্টভাবে "শিক্ষায় সবার সমান অধিকারের" কথা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে বলে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠন উল্লেখ করেছে। জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন কর্মসূচি

www.pathagar.com

(ইউএনডিপি) প্রায় এক দশক ধরে মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে।[৩] নারীসমাজ যেহেতু মানবগোষ্ঠীরই অর্ধাংশ, ফলে নারীশিক্ষা ছাড়া যে সামাজিক উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়, সে-কথা সর্বজনস্বীকৃত।[৪] নারী-উন্নয়নের জন্যে তাই অন্যান্য নানা উদ্যোগের পাশাপাশি নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশও নারীশিক্ষার ওপর পূর্বের যে-কোনো সময়ের তুলনায় গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি। শিক্ষার সামগ্রিক অগ্রগতির এই ধারাতেই মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষার হার বাড়ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত কালের তুলনায় আমাদের অর্জন একেবারে অনুল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যতটা সাফল্য অর্জন করার কথা ছিল তা কি আমরা অর্জন করতে পেরেছি, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষায়? এই প্রশ্নেরই উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে—আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনার রূপরেখা হিসেবে প্রবন্ধটি বিবেচিত হতে পারে।

ভারতের একটি সুপ্রাচীন জনপদ হিসেবে বাংলাদেশের রয়েছে হাজার বছরেরও সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে যেমন এই জনপদ সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের নানা ধর্ম ও সভ্যতার অভিঘাত—যেমন বৌদ্ধ, মুসলিম, ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা তা প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও পড়েছে এর ছাপ, নানা জনগোষ্ঠী ও সভ্যতার সংস্পর্শে তা সুগঠিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এদেশে প্রচলিত ছিল টোল-পাঠশালা, মাদ্রাসা-মক্তবের মতো সনাতন শিক্ষাব্যবস্থা। 'ওরিয়েন্টালিজমে'র প্রবক্তা, ইতিহাসবিদ ম্যাক্স ম্যুলার সরকারি নথিপত্র ও মিশনারিদের বিবরণ পরীক্ষা করে দাবি করেন যে, ইংরেজদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের মুহূর্তে বাংলায় প্রায় আশি হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল।[৫] এরও আগে প্রাচীন যুগে গড়ে উঠেছিল তক্ষশীলা ও নালন্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয়। পরে ঔপনিবেশিক কালপর্বে এই শিক্ষাধারা আরও নানা ধারায় বিকশিত হয় এবং এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাধারার ঐতিহ্য প্রায় আড়াই শো বছরের মতো। কিন্তু সুদীর্ঘ এই ঐতিহ্য সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষা যুগোপযোগী ধারায় বিকশিত হতে পারেনি, এই শিক্ষার রয়েছে নানা সমস্যা। বর্তমান নিবন্ধে পাওয়া যাবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সরকারি নীতি-পদ্ধতি, প্রস্তাবিত বিভিন্ন শিক্ষানীতি এবং পঞ্চাবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচির আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে নারীশিক্ষার রূপটি কেমন দাঁড়িয়েছে তার একটি সমীক্ষণ। এই সমীক্ষণের ভিত্তি হচ্ছে শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র— রিপোর্ট, জরিপ, কমিশনের সুপারিশ, পরিকল্পনাপত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি।

উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশ, যারা এখনো সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তার করে উঠতে পারেনি, সেই সব দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে প্রাধান্য দেওয়া হয় মৌলিক শিক্ষাস্তর—অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের ওপর। কেননা মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যত অর্থ ব্যয় হয় তা থেকে ব্যক্তি বা সমাজ উপকৃত হয়

www.pathagar.com

সবচেয়ে বেশি। এর পরই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদগণ। কেননা, এই শিক্ষাস্তর থেকে মৌলিক শিক্ষাস্তরের তুলনায় ব্যক্তি ও সমাজ উপকৃত হয় অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা কম।[৬] অবশ্য অর্থনীতিবিদদের মতে, কোনো দেশ যদি সর্বজননীন শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তাহলে প্রাধান্য দিতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর, প্রাথমিক শিক্ষার ওপর নয়। কেননা তখন প্রাথমিক স্তরের তুলনায় মাধ্যমিক স্তর থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফল পাওয়া যাবে।[৭] অর্থনীতিবিদরা অবশ্য একথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি যে, শিক্ষার একটি সুষম ধারা গড়ে তোলার জন্যে যে-সব দেশ এখনো সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেনি, তাদের শিক্ষার সবগুলি স্তরের উপর কমবেশি মনোযোগ দিতে হবে।[৮] সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশকে এখন বয়স্ক ও প্রাথমিক শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে, এর পরই গুরুত্ব দিতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর। কেননা বাংলাদেশে এখনো তিন কোটি বয়স্ক লোক নিরক্ষর রয়ে গেছে।[৯] প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৯৫ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আওতায় চলে এসেছে, যদিও আবার ৩৮ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে।[১০] তবে যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় এখন ভর্তির এবং সমাপ্তির হার সবচেয়ে বেশি—ফলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেই আগের তুলনায় অনেক বেশি শিশু মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি হতে চাইছে।

প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের ভর্তির হারও এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী মেয়েদের প্রায় ৯১ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং তদের সমাপ্তির হারও বেড়েছে। দু'হাজার সালের মধ্যে বাংলাদেশ যে চারটি জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে তাতে এই সময়পর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয় উপযোগী মেয়েদের ভর্তির হার ৯৪ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং ঝরে পড়ার হার ৩০ শতাংশে হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে।[১১] এই মুহূর্তে এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হতে থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর চাপ বাড়ছে, মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বাড়ছে; আর এজন্যেই নিঃসন্দেহে মাধ্যমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার যথার্থ দাবিদার। বাংলাদেশের জনসংখ্যার যেহেতু অর্ধাংশই নারী, ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর এই নারীরা তাই কিভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা-কাঠামো : বাংলাদেশে

বাংলাদেশের শিক্ষাকাঠামো অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী এবং ডিগ্রি শিক্ষার পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। এই শিক্ষাস্তরটি আমাদের শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর। উচ্চশিক্ষা সাধারণত ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা অর্জন করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত :

www.pathagar.com

১. নিম্ন মাধ্যমিক : ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী;
২. মাধ্যমিক : নবম ও দশম শ্রেণী; এবং
৩. উচ্চ মাধ্যমিক : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী।

উল্লিখিত দ্বিতীয় ও স্তরটি প্রান্তিক স্তর, অর্থাৎ এ দুটি স্তর শেষে দুটি প্রান্তিক পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট অর্জন করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষ এবং উপযুক্ত মানবসম্পদ সৃষ্টি করা, যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে।[১২] মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটি উচ্চশিক্ষা স্তরে প্রবেশের পূর্বপ্রস্তুতির স্তর হিসেবেও বিবেচিত হয়।

মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষা : বাংলাদেশে

বাংলাদেশ আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি অনুসারে আগামী শতাব্দীতে ঘটবে অর্থনৈতিক ভুবনীকরণ (globalization)। নারীর নিজস্ব উন্নয়ন এবং ভুবনীকরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রয়োজন পড়বে 'জ্ঞানপ্রাপ্ত' শিক্ষিত মানবগোষ্ঠীর। জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন কর্মসূচি এই জ্ঞানপ্রাপ্ত শিক্ষিত মানবসম্পদ সৃষ্টির ওপরই গুরুত্বারোপ করেছে সবচেয়ে বেশি। 'লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়ন সূচক' (Gender-related Development Index-GDI) অনুসারে নারীশিক্ষার সমস্ত দিক বিবেচনা করে তারা নারীদের অবস্থান নির্ধারণ করেছে।[১৩] শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্যে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ব্যাপক সহায়তা দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি অথবা আলাদাভাবে গ্রহণ করেছে ব্যাপক শিক্ষা কর্মসূচি। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে, নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটালে শুধু সামাজিক সমতা নয়, দারিদ্র্য দূর হয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে, শিশুমৃত্যুর হার কমে, পারিবারিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, শিশুজন্মের হার কমে—অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় এবং জীবনমান উন্নত হয়।[১৪]

বাংলাদেশও রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংবিধানের ১৭ ধারায় সর্বজনীন শিক্ষার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন "সমাজের সব মানুষের সকল বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ, গৃহের মান ও পরিবেশ উন্নতকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য নারীশিক্ষার" ওপর গুরুত্বারোপ করে।[১৫] এরপর কমিশন নারীশিক্ষা উন্নয়নের জন্যে যে সুপারিশগুলো করে তাতে "ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে শিশুর যত্ন, রোগীর সেবা, স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্যপুষ্টি, খাদ্য সংরক্ষণ, সূচিশিল্প, পুতুল ও খেলনা তৈরি, হাঁস-মুরগি পালন" এবং সুষ্ঠু জীবনযাত্রার জন্যে "প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণে দক্ষতা অর্জনের জন্য গার্হস্থ্য হিসাবরক্ষণ পাঠ্যসূচিতে থাকা আবশ্যক" বলে উল্লেখ করে।

www.pathagar.com

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) জনশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিকল্পনা দলিলে বলা হয়, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক শিক্ষা এখন শুধু উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিমূলক স্তর হিসেবে গণ্য হতে পারে না। অনেকেই যেহেতু নানা কারণে এই স্তরের শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষা স্তরে প্রবেশ না করে কর্মক্ষেত্রে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়, ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা হওয়া উচিত বহুমুখী; যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে কাজের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নিয়ে প্রবেশ করতে পারে। এ জন্যই শ্রমবাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কমিউনিটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুসারে গড়ে তুলবে। বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হার ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়, অর্থাৎ এই সময়ে মোট ভর্তি সংখ্যা ১৭.৯০ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২৬.৬২ লাখে। ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত এই সময়ে ৮৩ : ১৭ থেকে কমে দাঁড়াবে ৭৯ : ২১।[১৬] উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ভর্তিরসংখ্যা ২.৪ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩.২ লাখে। মেয়েদের ভর্তির হার এই সময়ে বৃদ্ধি করা হবে ৮.৫ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে।[১৭] মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে এবং উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয় যথাক্রমে ৫৯.৮ কোটি এবং ২৪.৭ কোটি টাকা (ডিগ্রিসহ)। এই বরাদ্দ ছিল শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের ১৮.৫৮ এবং ৭.৬০ শতাংশ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভবন নির্মাণ, বেসরকারি কলেজের উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভর্তির সংখ্যা ১৯৮০ সাল নাগাদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (ডিগ্রিসহ) স্তরে যথাক্রমে ২.৫৭ এবং .৭০ লাখ বাড়বে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪২.৬২ কোটি টাকা।[১৮]

কিন্তু প্রস্তাবিত এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির সংখ্যা ১৯৭৮ ও ১৯৮০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৯.৪৩ ও ২০ লাখে। ছাত্রী-ভর্তির সংখ্যা ১৯৭৩ সালের ২.২৭ লাখ থেকে ১৯৮০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫.২০ লাখে। মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে (ডিগ্রিসহ) ছাত্রীভর্তির সংখ্যা ১৯৭৩ সালের ০.২৭ (৮.৫%) লাখ থেকে ১৯৮০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ০.৫৩ (১০%) লাখে। মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রকৃত ব্যয়ও ছিল বরাদ্দের তুলনায় খুব কম, মাত্র ৩০.১১ কোটি টাকা। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরেও ভর্তির বিশেষ করে মেয়েদের ভর্তির হার লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে পারেনি, আর ব্যয় হয়েছিল মাত্র ১৪.৭৫ কোটি (ডিগ্রিসহ) টাকা।[১৯]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে বলা হয় যে, "যদিও মেয়েরা জনসংখ্যার অর্ধেক, তাদের মধ্যে শিক্ষার হার ছেলেদের শতকরা ৩০ ভাগের তুলনায় মাত্র ১৩.৭ ভাগ।" পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.pathagar.com

করা হয়। উল্লেখ করা হয় যে, এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির চাপ বাড়বে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় মাধ্যমিক স্তরে "ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমানো, মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি", ছাত্রীবৃত্তি দান, ছাত্রী সংখ্যা দ্রুত ৫.২০ লাখ থেকে ৮ লাখে বাড়ানো, প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজের উন্নয়ন এবং যত বেশি সম্ভব মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা।[২০]

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকটি দেখলে দেখা যাবে, এই সময়ে ১১টি বালিকা বিদ্যালয় এবং পুরনো প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করা হয়।[২১] মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মোট সংখ্যা ছাত্রদের বেলায় ১৯৮০ সালে ২০ লাখের তুলনায় ১৯৮৫ সালে ২৪.৮৫ লাখে এবং ছাত্রীদের বেলায় ৬.১৪ লাখের স্থলে ৮.০১ লাখে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় (ডিগ্রিসহ) ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল যথাক্রমে ৮৬.৮৬ এবং ১৯.০৮ কোটি টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫.৩৩ এবং ১৯.০২ কোটি টাকা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) লক্ষ্য করা হয় যে, বাংলাদেশের নারীশিক্ষা বৈষম্যমূলক। জাতীয় পর্যায়ে নারীশিক্ষার হার (১৩.২ শতাংশ) ১৯৮১ সালে পুরুষ শিক্ষার হারের (২৬ শতাংশ) প্রায় অর্ধেক। পল্লী এলাকায় এই হার আরও খারাপ ছিল—পুরুষের ২৩ শতাংশের তুলনায় মেয়েদের ১১.২ শতাংশ।

মাধ্যমিক স্তরে ষাটের দশক থেকে প্রচলিত বহুমুখী কোর্সের পরিবর্তে তৃতীয় পরিকল্পনায় একীভূত কোর্স চালু করা হয়। জোর দেওয়া হয় বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর। পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় দু'শোটি ছেলেদের এবং দু'শোটি মেয়েদের কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠার। এই স্কুলগুলো থেকে প্রায় ১৬ হাজার মেয়ে কৃষি, সেলাই এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সার্টিফিকেট অর্জন করবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।[২২]

দেখা যায় যে, পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা যতটা সম্প্রসারিত হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষা সেই তুলনায় সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ থাকলেও সম্প্রসারিত হতে পারেনি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২৭.৫ লাখ, কিন্তু তা দাঁড়ায় ৩২.৪ লাখে, বৃদ্ধির হার ছিল ১১৮ শতাংশে। মেয়েদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেলেও তা ছিল ছেলেদের তুলনায় খুবই কম। পরিকল্পনা দলিলে একটি সারণীর সাহায্যে এই তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে :

স্তর	ছেলে	মেয়ে	শতকরা হার	
			ছেলে	মেয়ে
নিম্ন মাধ্যমিক	১২৯৭২৫৫	৬৯৬১০৭	৬৫.০৮	৩৪.৯২
মাধ্যমিক	৫৮২১৫১	২৩২০৩৬	৭১.৫০	২৮.৫০

তথ্যসূত্র : গপ্রবাস, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯০

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা ও কলেজ শিক্ষায় (ডিগ্রিসহ) বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১২৫ ও ৫৮.৩৪ কোটি টাকা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয় ৮০.৪১ এবং ৩০.১৯ কোটি টাকা।

www.pathagar.com

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯০-৯৫) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, মাধ্যমিক শিক্ষায় পৌরসভার বাইরের স্কুলগুলোতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের বিনাবেতনে পড়াশোনার সুযোগ দান। এর ব্যাপক সুফলও পাওয়া গেছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই প্রকল্পের মূল্যায়ন করে বলা হয় যে, "বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক"। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের সংখ্যা ১৯৯০ সালের ৩০ লাখের তুলনায় ১৯৯৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪ লাখে। এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে ১০৪৪৮ থেকে ১৩২৫৫-তে। বেড়েছে কলেজে ভর্তির সংখ্যা—৯ লাখ থেকে ১৪ লাখে; বেড়েছে কলেজের সংখ্যা—৮৪৮ থেকে ১৬৬৭টিতে।[২৩]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) নারীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাকালে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবিবাহিত মেয়েরা বিনাবেতনে পড়াশোনার সুযোগ পাবে এবং তাদের বৃত্তি দেওয়া হবে। মেয়েরা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় কলেজে পড়তে পারে, সে জন্যে যে ২০টি জেলায় কোনো সরকারি মহিলা কলেজ নেই, সেই সব জেলার ১টি করে মহিলা কলেজকে জাতীয়করণ করা হবে; সামাজিক প্রয়োজনে এগুলোকে পর্যায়ক্রমে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। প্রকৃতপক্ষে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান লৈঙ্গিক ব্যবধান যাতে কমে আসে সেই লক্ষ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩১২০ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। নিচের সারণী ১-এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে তা উল্লেখ করা হলো :

সারণী ১ : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গৃহীত কর্মসূচি

	১৯৯০ সালের	ভিত্তি বছর	প্রান্তিক
	অবস্থা	১৯৯৭	২০০২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১০৪৪৮	১৩৫২৬	১৬৬৮৬
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা	২৯৯৩৭৩০	৬৩৩০৩২৫	৮৯৬৮৪৫০
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের সংখ্যা	৩৬৭	৭৬৬	৯২৫
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে ভর্তির সংখ্যা	১৪৩৩০৪	২৯৫৪২১	২৪৯৭৯০

তথ্যসূত্র : পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮

মাধ্যমিক স্তর : নারীশিক্ষার চিত্র

স্বাধীনতার পর থেকে গত ২৭ বছরে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তবে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদদের মতে এ

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে যতটা অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল ততটা হয়নি। সাম্প্রতিককালে অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই প্রসারিত হবে বলে ধারণা করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষায় যেভাবে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে, সেইভাবে বাড়ছে মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ।

একটি তথ্যসূত্র থেকে দেখা যায়, দেশে ১৯৯৭ সালে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। জুনিয়র বিদ্যালয়সহ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১৬৯৫, বালিকা বিদ্যালয় ১৯৪১টি।[২৪]

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত অন্য একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, দেশে যথাক্রমে ৩০০২ এবং প্রায় ১০৭৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাদান করা হয়েছে (সারণী ২)।

সারণী ২ : মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

	সংখ্যা	শিক্ষার্থী			হার	
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০০২	২৯১২২৯	৩৪০৯৮২	৬৩২২১১	৪৬.০৭	৫৩.৯৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০৭৭৬	২৯১১৫৩৬	২৫৮০৫৭৮	৫৪৯২১১৪	৫৩.০১	৪৬.৯৯
মোট	১৩৭৭৮	৩২০২৭৬৫	২৯২১৫৬০	৬১২৪৩২৫	৫২.৩০	৪৭.৭০

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাটিসটিক্স (অ্যাট এ গ্ল্যান্স) ১৯৯৮

এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬১ লাখ ২৪ হাজার ৩২৫। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৯ লাখ ২১ হাজার ৫৬০। এই সংখ্যা মোট ছাত্র-ছাত্রীর ৪৭.৭০ শতাংশ। এই হিসাব অনুসারে মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যরত মেয়েদের সংখ্যা গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সারণী ৩-এ বিভিন্ন বছরে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, লিঙ্গভিত্তিক ভর্তির প্রবণতা দেখানো হলো।

সারণী ৩ : ১০-১৬ বছর বয়সী মাধ্যমিক শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর (ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী) লিঙ্গভিত্তিক ভর্তির প্রবণতা

বছর	মোট ভর্তি (হাজারে)			লিঙ্গভিত্তিক ভর্তির হার (%)	
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে
১৯৭৫	১৫০৪	৪৭৬	১৯৮০	৭৫.৯৬	২৪.০৪
১৯৭৮	১৩৭১	৪৪৩	১৮১৪	৭৫.৫৮	২৪.৪২
১৯৭৯	১২৩৮	৪৩১	১৬৬৯	৭৪.১৮	২৫.৮২
১৯৮০	১৫৩৫	৬০৬	২১৪১	৭১.৭০	২৮.৩০
১৯৮৫	১৭৪৩	৮৪১	২৫৮৪	৬৭.৪৫	৩২.৫৫
১৯৮৬	১৭৯২	৮৬৮	২৬৬০	৬৭.৩৭	৩২.৬৩
১৯৮৭	১৮৪৯	৮৯৪	২৭৪৩	৬৪.৪১	৩২.৫৯
১৯৮৮	১৮৭৯	৯২৮	২৮০৭	৬৬.৯০	৩৩.১০
১৯৮৯	১৯২৯	৯৭২	২৯০১	৬৬.৪৯	৩.৫১

www.pathagar.com

বছর	মোট ভর্তি (হাজারে)			লিঙ্গভিত্তিক ভর্তির হার (%)	
১৯৯০	১৯৭৮	১০১৬	২৯৯৪	৬৬.১০	৩৩.৯০
১৯৯১	২০৮৬	১০৭০	৩১৫৬	৫৭.১০	৩৩.৯০
১৯৯২	২১৪৯	১৫৯৯	৩৭৪৮	৫৭.৩৪	৪৪.৬৬
১৯৯৩	২২৮৫	১৮৫৭	৪১৪২	৫৫.১৭	৪৪.৮৩
১৯৯৪	২৪৪৬	২০৭৯	৪৫২৫	৫৪.১০	৪৫.৯০
১৯৯৫	২৬৮৬	২৩৭৩	৫০৫৯	৫৩.১০	৪৬.৯০
১৯৯৭	৩২০২	২৯২১	৬১২৩	৫২.৩০	৪৭.৭০

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস এবং শামিমা ইসলাম, পৃ. ১৮৪

উল্লিখিত সারণী থেকে দেখা যায়, ১৯৭৫ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো মোট শিক্ষার্থীর ২৪ শতাংশ মেয়ে। এই হার একদশক পর ১৯৮৫ সালে মাত্র ৩০ শতাংশ ছুঁয়ে দেয়। ১৯৯২ সালে তা প্রথমবারের মতো ৪০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় এবং এর পর মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের সংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৯৭ সালে তা এসে পৌঁছায় প্রায় ৪৮ শতাংশে। বর্তমানে এই হার আরও বেড়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে মাধ্যমিক স্তরে দেশে ২০০২ সাল নাগাদ গড়ে প্রায় সাড়ে ৫ লাখের মতো শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, যার মধ্যে ছাত্রীদের ভর্তির বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।[২৫]

সারণীতে লক্ষণীয়, ১৯৯২ সালের পূর্ব পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীসংখ্যার হার মোট ভর্তির তুলনায় প্রায় স্থিতিশীল ছিল। ১৯৯২-১৯৯৭ পর্বে তা প্রতিবছর বেড়েছে। ১৯৭৫ সালে এই হার যেখানে ছিল মাত্র ২৪ শতাংশ, সেখানে বর্তমানে সেই হার দ্বিগুণ। ভর্তির মোট সংখ্যাও ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বেড়েছে দ্রুততর গতিতে। ছাত্রভর্তির হার ১৯৭৫ সালে ছিল ১৫ লাখ ৪ হাজার, ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ লাখ ৮৬ হাজার, ১৯৯৭ সালে ৩২ লাখ ২ হাজার। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ছাত্রী সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ৪ লাখ ৭৬ হাজার, সেখানে মাত্র দশ বছরে তা দ্বিগুণ হয়—৮ লাখ ৪১ হাজার। ১৯৯২ সালে এই সংখ্যা আবারও প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ১৫ লাখ ৯৯ হাজার, ১৯৯৭ সালে ২৯ লাখ ২১ হাজার। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সালে যেখানে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ১৯ লাখ ৭৮ হাজার থেকে ৩২ লাখ ২ হাজারে, সেখানে ছাত্রীসংখ্যা বেড়েছে ১০ লাখ ৭০ হাজার থেকে ২৯ লাখ ২১ হাজারে। অর্থাৎ ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বেশ দ্রুততর। ধারণা করা যায় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তির ব্যাপারে গুরুত্বারোপের পর মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বিনাবেতনে পড়ার ও বৃত্তির ব্যবস্থা থাকায় মাধ্যমিক ক্ষেত্রে ছাত্রীভর্তির হার বেড়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় ছাত্রভর্তির তুলনায় ছাত্রীভর্তির হার দ্রুততর ছিল। ১৯৯৭ সালে দেশে ১২৭৪টি কলেজে (ডিগ্রি কলেজসহ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে) দেওয়া হয়েছে। এসব কলেজে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল

www.pathagar.com

১২ লাখ ৭৩ হাজার ২২৮। এর মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ৪ লাখ ২৪ হাজার ৫৫৩। চলতি দশকেই মূলত মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির সংখ্যা ও হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ১৯৭৫ সালে যেখানে ছাত্রীভর্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪ হাজার সেখানে ১৯৯৭ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ২৪ হাজারেরও বেশি। ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির ব্যবধানও কমেছে। ১৯৭৫ সালের ১৩.৮২ শতাংশ থেকে ১৯৯৭ সালে ছাত্রীভর্তির হার মোট ভর্তির তুলনায় দাঁড়িয়েছে ৩৩.৩৩ শতাংশে (সারণী ৪)।

সারণী ৪ : উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) লিঙ্গভিত্তিক ভর্তির প্রবণতা

বছর	মোট ভর্তি (হাজারে)			বছর অনুসারে লিঙ্গভিত্তিক হার	
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে
১৯৭৫	২১২	৩৪	২৪৬	৮৬.১৮	১৩.৮২
১৯৭৬	১৮০	২৬	২০৬	৮৭.৩৮	১২.৬২
১৯৭৮	১৩৩	১৬	১৪৯	৮৯.২৬	১০.৭৮
১৯৯২	৪১৯	১৮২	৬০১	৬৯.৭২	৩০.২৮
১৯৯৩	৪০৯	২০৯	৬১৮	৬৬.১৮	৩৩.৮২
১৯৯৪	৬৫৪	২৫১	৯০৫	৭২.২৭	২৭.৭৩
১৯৯৫	৬৯২	৪১২	১১০৪	৬২.৬৮	৩৭.৩২
১৯৯৭	৮৪৮	৪২৪	১২৭২	৬৬.৬৬	৩৩.৩৩

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস, শামিমা ইসলাম

নারীশিক্ষা : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে মূল্যায়ন

ছাত্রীভর্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও বলা প্রয়োজন যে, মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের ঝরেপড়ার হার খুবই উঁচু। সারণী ৫১০ থেকে লক্ষণীয়, ষষ্ঠ শ্রেণীতে যত ছাত্রী ভর্তি হয় দশম শ্রেণী পর্যন্ত তত ছাত্র পড়াশোনা অব্যাহত রাখে না। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত ভর্তির সংখ্যা ও হার লক্ষ্য করলেই এই প্রবণতাটি সহজেই চোখে পড়বে। ১৯৭৫ সালে তাই দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে বেশি ছাত্রী (১ লাখ ৪০ হাজার) থাকলেও ঐ একই বছর দশম শ্রেণীর ছাত্রীসংখ্যা অনেক কম মাত্র ৪৪ হাজার। ১৯৯৫ সালেও ঐ একই প্রবণতা লক্ষণীয়। ঐ বছর ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৭ লাখ ছাত্রী ভর্তি হলেও দশম শ্রেণীর ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২ লাখ ৬৪ হাজার।

প্রকৃত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েরা ঝরে পড়ে। সারণী ৬-এ এই ঝরেপড়ার প্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে তাই দেখা যাবে বিভিন্ন তুলনায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে যেখানে ছাত্রীসংখ্যার হার ৩০.৬৩ শতাংশ (সকল শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ), সেখানে দশম শ্রেণীতে ছাত্রীসংখ্যার হার মাত্র ৯.৬৩ শতাংশ। ১৯৯৫ সালেও এই প্রবনতা অক্ষুণ্ন ছিল : ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছিল ২৯.৫০, দশম শ্রেণীতে ১১.১৩ শতাংশ।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের তুলনায় ১৯৯৭ সালে ঝরেপড়ার হারে সামান্য উন্নতি হয়েছে বলা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা যায়। অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীভর্তির হার ধীরে ধীরে বাড়ছে আর কমছে ঝরেপড়ার হার (সারণী ৬) :

সারণী ৫ : মাধ্যমিক বিভিন্ন শ্রেণীতে ছেলে-মেয়ে ভর্তির সংখ্যা (হাজারে) এবং মোট ভর্তির তুলনায় মেয়েদের ভর্তির হার

শ্রেণী	লিঙ্গ	বছর								মোট	ভর্তির হার (%)
		১৯৭৫	১৯৭৮	১৯৮৮	১৯৯০	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫		
	ছেলে	৪৪৩	৩৮৪	৪৬১	৪৮৫	৫৪১	৬০০	৬৪৩	৭২৬	৯২৮৩	৭৫.১৫
ষষ্ঠ	মেয়ে	১৪০	৪৬	২৬৯	২৯৪	৪৬২	৫৪৬	৬১৩	৭০০	৩০৭০	২৪.৮৫
	উভয়	৫৮৩	৫৩০	৭৩০	৭৭৯	১০০৩	১১৪৬	১২৫৬	১৪২৬	১২৩৫৩	১০০
	ছেলে	৩২২	৩৩১	৪৪২	৪৬৭	৫০৮	৫২১	৫৫৮	৬১৮	৩৭৬৭	৫৯.৪০
সপ্তম	মেয়ে	১৩১	৩১	২৩২	২৫৪	৩৮৩	৪৪৯	৫০৪	৫১৯	২৫৭৫	৪০.৬০
	উভয়	৪৫৩	৪৬২	৬৭৪	৭২১	৮৯১	৯৭০	১০৬২	১২০৯	৬৩৪২	১০০
	ছেলে	৩০১	২৭৪	৩৯৪	৪১৪	৪৫০	৪৫০	৪৮৮	৫৩৪	৩৩০৫	৫০.৮০
অষ্টম	মেয়ে	১০৫	১১১	১৯৫	২১৩	৩২৩	৩৭৮	৪২১	৪৭৫	২২২১	৪০.২০
	উভয়	৪০৬	৩৮৫	৫৮৯	৬২৭	৭৭৩	৮২৮	৯০৯	১০০৯	৫৫২৬	১০০
	ছেলে	২৩৫	২০৪	৩১৯	৩৩৬	৩৫৪	৩৯২	৪১০	৪৪১	২৬৯১	৬৩.৪৬
নবম	মেয়ে	৫৬	৬৪	১৩০	১৪২	২৩৮	২৭৫	৩০৩	৩৪১	১৫৪৯	৩৬.৫৪
	উভয়	২৯১	২৬৮	৪৪৯	৪৭৮	৫৯২	৬৬৭	৭১৩	৭৮২	৪২৪০	১০০
	ছেলে	২০৩	১৬০	২৬৩	২৭৬	২৯৬	৩২০	৩৪৭	৩৬৬	২২৩১	৬৪.৮৮
দশম	মেয়ে	৪৪	৪৮	১০২	১১২	১৯৩	২০৯	২৩৬	২৬৪	১২০৮	৩৫.১২
	উভয়	২৪৭	২০৮	৩৬৫	৩৮৮	৪৮৯	৫২৯	৫৮৩	৬৩০	৩৪৩৯	১০০
	ছেলে	১৫০৪	১৩৫২	১৮৭৯	১৯৭৮	২১৪৯	২২৮৪	২৪৪৫	২৬৮৬	১৬২৭৭	৫৯.৯০
মোট	মেয়ে	৪৫৭	৫৮২	৯২৮	১০১৫	১৫৯৯	১৮৫৭	২০৭৯	২৩৭২	১০৮৮৯	৪০.১০
	উভয়	১৯৬১	১৮৫৪	২৮০৭	২৯৯৩	৩৭৪৮	৪১৪১	৪৫২৪	৫০৫৮	২৭১৬৬	১০০

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

সারণী ৬ : মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছেলে-মেয়ের ভর্তির তলনামূলক হার

শ্রেণী	লিঙ্গ	বছর							মোট হার
		১৯৭৫	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০	১৯৮৮	১৯৯০	১৯৯৩	১৯৯৫	(সমস্ত বছর)
	ছেলে	২৯.৪৫	২৯.৬৯	২৮.৯২	২৮.৪০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৫.৪০	২৭.০০	২৭.২৩
ষষ্ঠ	মেয়ে	৩০.৬৩	৩০.০২	৩১.৫৫	২৯.০৮	২৯.০০	২৯.০০	২৮.০০	২৯.৫০	২৯.৫৯
	উভয়	২৯.৭৩	২৯.৭৭	২৯.৬০	২৮.৫৯	২১.০০	২৬.০২	২৬.৫০	২৮.২০	২৭.৪২
	ছেলে	২১.৪১	২১.৫৯	২৪.৫৬	২৪.৪৮	২৩.৫০	২৩.৫৯	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০

www.pathagar.com

শ্রেণী	লিঙ্গ	বছর								মোট হার
		১৯৭৫	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০	১৯৮৮	১৯৯০	১৯৯৩	১৯৯৫	(সমস্ত বছর)
সপ্তম	মেয়ে	২৮.৬৭	২৭.৭৭	২৮.৩১	২৬.১০	২৫.০০	২৫.০০	২৩.০০	২৫.০০	২৬.১০
	উভয়	২৩.১০	২৩.১০	২৫.৫২	২৪.৯২	২৪.০০	২৪.১০	২২.৫০	২৪.০০	২৩.৯০
	ছেলে	২০.০০	২০.১৩	২০.৬০	২০.২৭	২১.০০	২১.০০	২০.৬০	২০.০০	২০.৪৫
অষ্টম	মেয়ে	২২.৯৮	২২.৫৭	১৯.০০	২২.১১	২১.০০	২১.০০	২১.৫০	২০.০০	২১.২৭
	উভয়	২০.৭০	২০.৭৩	২০.১৯	২০.৭৭	২১.০০	২১.০০	২১.০০	২০.০০	২০.৬৭
	ছেলে	১৫.৬৩	১৬.৪৮	১৩.৮৯	১৬.০০	১৭.০০	১৭.০০	১৭.৩০	১৬.৪০	১৬.২১
নবম	মেয়ে	১২.২৫	১১.৯৬	১২.৫৮	১২.৭৫	১৪.০০	১৪.০০	১৫.৫০	১৪.৩৭	১৩.৪২
	উভয়	১৪.৪৮	১৫.৬৮	১৩.৫৪	১৪.৪৬	১৬.০০	১৬.০০	১৬.৫০	১৫.৪০	১৫.২৬
	ছেলে	১৩.৫০	১২.০৪	১২.১২	১১.৮৩	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৭০	১৩.৬০	১৩.২২
দশম	মেয়ে	০৯.৬৩	০৭.৬৭	০৮.৫৮	০৯.৫৬	১১.০০	১১.০০	১২.০০	১১.১৩	১০.১০
	উভয়	১২.৬০	১০.৯৭	১১.২০	১১.২২	১৩.০০	১৩.০০	১৩.৫০	১২.৪০	১২.২৩

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

সারণী ৭ : মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার

বছর	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১৯৯৩	৪৩.০০	৬৩.৭০	৫২.০০
১৯৯৪	৪২.২০	৫৩.৯০	৪৭.৫০
১৯৯৫	৩৮.৭০	৪৯.২০	৪৩.৬০

তথ্যসূত্র : হামিদা বানু, বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ভূমিকা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, শিক্ষা মন্ত্রাণালয়, ১৯৯৭, পৃ. ৩১

উল্লিখিত প্রবণতাটি নিঃসন্দেহে ছাত্রীদের শিক্ষার্জনকে ব্যাহত করছে, তাদের সাফল্যে বাধা সৃষ্টি করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলেও নারীশিক্ষার অপচয়ের ছবিটি স্পষ্ট। আমরা নমুনা হিসেবে তিনটি বোর্ডের (ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর) ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, মাধ্যমিক স্তরে যত ছাত্রী অংশগ্রহণ করে তত ছাত্রী উত্তীর্ণ হয় না। আবার মাধ্যমিক স্তরে সামগ্রিকভাবে ছাত্রীরা (ছাত্রসহ) বেশি সংখ্যায় উঁচু গ্রেড পেলেও এবং পাসের হার বেশি হলেও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উঁচু গ্রেড পাওয়া কিংবা পাসের হার দুটোই খুব কমে যায়।

১৯৯৪ সালে এই তিন বোর্ডে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় ২ লাখ ৫৮ হাজার ৬১২ জন ছাত্রী। তাদের মধ্যে পাস করে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯২০ জন। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় বিভাগ পায় যথাক্রমে ৮৪ হাজার ১৩৯ এবং ৯২ হাজার ৫১২ জন। তাদের পাসের হার ৬৯.৫৭ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে পরীক্ষা দেয় ১ লাখ ৯৬ হাজার ৭৮১ জন। পাস করে ৭৭ হাজার ৩৬৮ জন। তাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ পায় যথাক্রমে ৩৩ হাজার ৭ জন এবং ৪২ হাজার ৮৭৪ জন।

www.pathagar.com

সারণী ৮ : মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল (ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর বোর্ড) এবং অপচয়ের খতিয়ান

		উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী					মোট পরীক্ষার্থীর তুলনায় পাসের হার
বছর	লিঙ্গ	পরীক্ষার্থী	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	মোট	
১৯৯৪	ছেলে	৪০৭২১৯	১৬১৯৭২	১৪৪৩৭৪	৩৮৩৩	৩১০১৭৯	৭৬.১৭
		(৬১.১৬)	(৫২.২২)	(৪৬.৫৪)	(১.২৩)	(১০০.০০)	
	মেয়ে	২৫৮৬১২	৮৪১৩৯	৯২৫১২	৩২৬৯	১৭৯৯২০	৬৯.৫৭
		(৩৮.৮৪)	(৪৬.৭৬)	(৫১.৪২)	(১.৮১)	(১০০.০০)	
	মোট	৬৬৫৮৩১	২৪৬১১১	২৩৬৮৮৬	৭১০২	৪৯০০৯৯	৭৩.৬০
		(১০০.০০)	(৫০.২১)	(৪৮.৩৩)	(১.৪৫)	(১০০.০০)	
১৯৯৫	ছেলে	৪৬৩৯৮৯	১৭০৭৪৮	১৬৭৫৬৬	৬২৫২	৩৪৪৫৬৬	৭৪.২৬
		(৬০.৬৪)	(৪৯.৫৫)	(৪৮.৬৩)	(১.৮১)	(১০০.০০)	
	মেয়ে	৩০১১৪৬	১০০৫১৬	১১০৬৪৮	৪৩৮৪	২১৫৫৪৮	৭১.৫৭
		(৩৯.৩৬)	(৪৬.৬৩)	(৫১.৩৩)	(২.০৩)	(১০০.০০)	
	মোট	৭৬৫১৩৫	২৭১২৬৪	২৭৮২১৪	১০৬৩৬	৫৬০১১৪	৭৩.২০
		(১০০.০০)	(৪৮.৪৩)	(৪৯.৬৭)	(১.৯০)	(১০০.০০)	
১৯৯৬	ছেলে	২৬৭৪৮৬	৬৬৫৭৯	৫২৭২৮	১১৩৬	১২০৪৪৩	৪৫.০২
		(৫৭.৬১)	(৫৫.২৮)	(৪৩.৭৮)	(০.৯৪)	(১০০.০০)	
	মেয়ে	১৯৬৭৮১	৩৩০০৭	৪২৮৭৪	১৪৮৭	৭৭৩৬৮	৩৯.৩১
		(৪২.৩৮)	(৪২.৬৬)	(৫৫.৪১)	(১.৯৯২)	(১০০.০০)	
	মোট	৪৬৪২৬৭	৯৯৫৮৬	৯৫৬০২	২৬২৩	১৯৭৮১১	৪২.৬০
		(১০০.০০)	(৫০.৩৪)	(৪৮.৩২)	(১.৩২)	(১০০.০০)	

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের (ছেলেদের মতে) সাফল্য আরও কমে আসে। ১৯৭৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় ১৫ হাজার ৪৭৩ জন ছাত্রী, এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী পায় ৩৪৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী পায় ২ হাজার ২২ জন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্তির হার যথাক্রমে ৪.৭০ এবং ২৩.৬৪, আর অধিকাংশই (৭২.২৮ শতাংশ) তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। পাসের হার (৫৫.২৬) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রায় ৪৫ শতাংশ ছাত্রী অসফল। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালেও এই একই প্রবণতা লক্ষণীয়। বরং আগের তুলনায় মেয়েদের (ছেলেদেরও) সাফল্যের হার কমে গেছে। আগের তুলনায় তারা উঁচু গ্রেডপ্রাপ্তির হার বাড়াতে পারলেও সামগ্রিকভাবে তাদের পাসের হার কমেছে। ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে এই হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪১.৯০ ও ৪৬.৩১ শতাংশে। অর্থাৎ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অর্ধেকের বেশি সংখ্যক নারী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না।

www.pathagar.com

সারণী ৯ : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল (ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর বোর্ড) এবং অপচয়ের খতিয়ান

			উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী				মোট পরীক্ষার্থীর তুলনায় পাসের হার
বছর	লিঙ্গ	পরীক্ষার্থী	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	মোট	
১৯৭৮	ছেলে	৫৫২৭১	৯৬৭	৬৮৩৭	২০১৯৬	২৮০০০	৫০.৬৬
		(৭৮.১৩)	(৩.৪৫)	(২৪.৪১)	(৭২.১৩)	(১০০.০০)	
	মেয়ে	১৫৪৭৩	৩৪৮	২০২২	৬১৮১	৮৫৫১	৫৫.২৬
		(২১.৮৭)	(৪.৭০)	(২৩.৬৪)	(৭২.২৮)	(১০০.০০)	
	মোট	৭০৭৪৪	১৩১৫	৮৮৫৯	২৬৩৭৭	৩৬৫৫১	৫১.৬৬
		(১০০.০০)	(৩.৯০)	(২৪.২৩)	(৭২.১৬)	(১০০.০০)	
১৯৯৪	ছেলে	২০৮২৬১	১৭২৮৭	৪৯৮০৩	১৪১৫৮	৮১২৪৮	৩৯.০১
		(৬৭.৩৫)	(২১.২৭)	(৬১.২৯)	(১৭.৪২)	(১০০.০০)	
	মেয়ে	১০০৯৪৪	৯২৯২	২৫৫৯৭	৭৪১২	৪২৩০১	৪১.৯০
		(৩২.৬৪)	(২১.৯৬)	(৬০.৫১)	(১৭.৫২)	(১০০.০০)	
	মোট	৩০৯২০৫	২৬৫৭৯	৭৫৪০০	২১৫৭০	১২৩৫৪৯	৩৯.৯৫
		(১০০.০০)	(২১.৫১)	(৬১.০৩)	(১৭.৪৬)	(১০০.০০)	
১৯৯৫	ছেলে	২৩৪১২৬	৬৬৬১৭	৬৬৬১৭	১৬৯৬২	১০৪১৪৭	৪৪.৩৩
		(৬৫.৯৬)	(৬৩.৯৬)	(৬৩.৯৬)	(১৬.২৮)	(১০০.০০)	
	মেয়ে	১২১২৩৯	৩৫২৩৪	৩৫২৩৪	৯৭৭৬	৫৬১৫০	৪৬.৩১
		(৩৪.০৪)	(১৯.৮৪)	(৬২.৭৫)	(১৭.৪১)	(১০০.০০)	
	মোট	৩৫৬১৬৫	৩১৭০৮	১০১৮৫১	২৬৭৩৮	১৩৩৫৫৯	৩৭.৫০
		(১০০.০০)	(২৩.৭৪)	(৭৬.২৬)	(২০.০২)	(১০০.০০)	

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

কোনো সন্দেহ নেই, এটা একধরনের বড়ো জাতীয় অপচয় (পুরুষের বেলায়ও এটা সত্য)। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? কেন আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়ার হার হ্রাস এবং সাফল্যের হার বাড়াতে পারছি না? চলতি দশক থেকে যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদগণ তা লক্ষ্য করেছেন; তবু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য এখনো আহামরি কিছু নয়। আসলে নানা সামাজিক-পারিবারিক-অর্থনৈতিক সমস্যা এক্ষেত্রে সাফল্য পেতে দিচ্ছে না। বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনাবিদ ও শিক্ষাবিদগণ এই বাধাগুলো চিহ্নিত করেছেন যা নিম্নরূপ :

— অভিভাবকদের সামাজিক প্রেক্ষাপট মেয়েদের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

— দারিদ্র্য।

www.pathagar.com

— জমির মালিকানা : ১৭ শতাংশ মেয়ে এমন পরিবার থেকে স্কুলে আসে যাদের পরিবার ৫ বিঘা জমির মালিক, ৬২ শতাংশ মেয়েরা আসে ৫ বা তদূর্ধ্ব জমির মালিকানাসম্পন্ন পরিবার থেকে।
— পিতা-মাতার শিক্ষা, বিশেষ করে মায়ের শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ৫৪ শতাংশ মেয়ে সেই সব পরিবার থেকে আসে যারা শিক্ষিত।
— বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব বেশি হলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে চায় না।
— গৃহকর্মে সহায়তা করার জন্যে মেয়েরা অনেক সময় স্কুলে যায় না, বিশেষ করে দরিদ্র গ্রামীণ মাতা যখন গর্ভবতী হয় তখন বাড়ির কাজ করার জন্যে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। আবার বাল্যবিবাহের কারণে মেয়ে নিজে গর্ভবতী হলে স্কুলে যাওয়া তার বন্ধ হয়ে যায়।
— বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের অভাবে পিতা-মাতারা মেয়েদের বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাতে চায় না।
— বিয়ের কারণে সহপাঠিনী পড়া ছেড়ে দিলে সঙ্গী মেয়ে অনেক সময় পড়া ছেড়ে দেয়।

সামাজিক-পারিবারিক এই কারণগুলো ছাড়াও উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী ও যথাযথ কর্মসূচির অভাবে মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো কাজ করেছে তা হলো :

— নারীশিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় অপ্রতুলতা।
— নারীশিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও গবেষণার অভাব।
— লক্ষ্য, পরিকল্পনা, সম্পদ-সন্নিবেশ, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়নের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্রের অভাব।
— কর্মসূচি গ্রহণে অনীহা।
— কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে গণ-অংশীদারিত্বের অভাব।
— জেন্ডার সচেতনতা এবং উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।
— জেন্ডারভিত্তিক উপাত্তের অভাব।
— স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের অভাব।
— দুর্বল অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন কাঠামো।
— লিঙ্গবৈষম্যমূলক অনাকর্ষণীয় শিক্ষাক্রম।
— পুরুষ প্রাধান্যের ফলে নারীকে অধস্তন রেখে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা।
— ধর্মীয় অনুশাসনের নামে নারীশিক্ষায় বাধাদান।
— সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমন্বয়ের অভাব।
— মেয়েদের শিক্ষণ চাহিদা ও তাদের শিক্ষা কার্যকারিতা গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় প্রাধান্য পায়নি।

বাধাগুলো দূর করার জন্যে যা করণীয় তা হলো :

www.pathagar.com

— পিতা-মাতার শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে শিক্ষিত মাতা-পিতা ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষালাভের জন্য মেয়েরা উৎসাহ পায় না। সেই জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সবার জন্য শিক্ষা, বিশেষ করে ব্যাপক বয়স্ক সাক্ষরতা অর্জনের ওপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

— সাধারণত দেখা যায় যে, ধনী পরিবার থেকেই বেশিরভাগ মেয়ে শিক্ষায় আসে, বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায়। দরিদ্র পিতা-মাতা মেয়েদের পড়ানোর ব্যাপারে ততটা উৎসাহী হয় না। এ কারণেই মেয়েদের ভর্তির হার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃদ্ধি করার জন্য যে বৃত্তি চালু আছে তা অব্যাহত রাখা দরকার। সেই সঙ্গে আরও কিছু উৎসাহমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত।

— অর্থ সমস্যার কথা বিবেচনা করে বালকদের বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা প্রচলন করা যায়। ঐসব বিদ্যালয়ে মেয়েদের আলাদা কমনরুম এবং বিনোদনমূলক ব্যবস্থা থাকতে পারে।

— আরও বেশি সংখ্যায় নারীশিক্ষক নিয়োগ করা।

— নারী শিক্ষকদের ক্যাম্পাসে বাসস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মেয়েদের জন্য আবাসিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা হলে বিদ্যালয় ও কলেজে মেয়েদের ভর্তির হার নিঃসন্দেহে বাড়বে।

— ভর্তির নিয়ম মেয়েদের বেলায় শিথিল করা যায়, যাতে দীর্ঘ বিরতির পরও তারা সুবিধামতো সময়ে আবার শিক্ষায় ফিরে আসতে পারে।

— মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশের জন্যে মধ্য স্তরের দক্ষ মানবসম্পদ ও পেশাদার ব্যক্তি তৈরি করা। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকেন্দ্রিক ও তত্ত্বীয় ধরনের অ্যাকাডেমিক কর্মসূচি এই মানবসম্পদ ও পেশাদার জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ফলে এই দুটি ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিক সংখ্যায় আকৃষ্ট করতে হলে শিক্ষাক্রম হতে হবে চাকরিকেন্দ্রিক, বৃত্তিমূলক, পেশাদার মানবসম্পদ তৈরিতে সমর্থ।

সবশেষে মেয়েদের যদি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমান অংশীদার মনে করা হয়, তাহলে তাদের শিক্ষা বিস্তারের জন্যও ব্যাপক কর্মসূচি (প্রয়োজনে পৃথক কর্মসূচি) গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নারীশিক্ষার দিকটিও অন্তর্দৃষ্টি, কার্যকর কর্মসূচি, অঙ্গীকার ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনার অভাবে পিছিয়ে পড়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটিও এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। ফলে আমাদের এই স্তরের মেয়েদের যতটা শিক্ষায় এগিয়ে আসার কথা ততটা এগিয়ে আসতে পারেনি। শিক্ষাকে "নারীদের সামাজিক বা পেশাগত অবস্থানের পূর্ণ সংবর্ধন ও

www.pathagar.com

উন্নয়নের ভিত্তি" বলা হলেও আমরা সেই সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। অথচ বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন দু'ধরনের বিনিয়োগ : মানবিক পুঁজি (human capital) এবং বস্তুগত পুঁজির (physical capital) সামগ্রিক সমন্বয়ের।[২৬] শিক্ষা অর্জিত হলে মানুষ মানবিক পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখলে আমাদের দেশে কখনোই যে মানবিক পুঁজি সৃষ্টি করা যাবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ কেন, 'বিশ্ব শিক্ষা রিপোর্ট ১৯৯৫'-এর ভূমিকায় ইউনেস্কোর ফ্রেডেরিকো মেয়র আরও বৃহৎ পটভূমিতে নারীশিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন, যা বাংলাদেশের জন্যও জরুরি :

> নারী প্রাশয়ই বিরূপ আচরণের শিকার, নির্যাতিত—চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে (বেইজিং, ১৯৯৫) সে কথাই বেশ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। বিশ্বের নিরক্ষর মানুষের দুই-তৃতীয়াংশই নারী। স্কুলের বাইরে থাকা তরুণদেরও প্রায় সম-সংখ্যক (দুই-তৃতীয়াংশ) নারী এই মুহূর্তে স্কুলের বাইরে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এই অসমতা শুধু সম-সুযোগ নয়, উন্নয়নেও বাধা দিচ্ছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাও এর ফলে সাধারণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। নারীর প্রতি এই অবিচার অক্ষুণ্ন রেখে সমতাসূচক, টেকসই ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণ করা অসম্ভব। ... শিক্ষা সর্বত্রই শান্তি, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করতে পারে এবং করে।[২৭]

তথ্যপঞ্জি

১ আবদুল্লাহ আল-মুতী, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮।

২ জাতিসংঘ, জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন : বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫১।

৩ ইউনাইটেড নেশন্‌শ্‌ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৮, নিউইয়র্ক, ১৯৯৮, পৃ. ১৫।

৪ এ জন্য দ্রষ্টব্য দ্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এনহ্যানসিং উইমেন্স পারটিসিপেশন ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (১৯৯৪) এবং প্রাইওরিটিজ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিজ ফর এডুকেশন (১৯৯৫); ইউএনডিপি'র হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৮ এবং মাহবুব উল হক ও খাদিজা হকের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া ১৯৯৮ (১৯৯৮)।

৫ আবদুল্লাহ আল-মুতী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪।

৬ দ্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাক, প্রাইওরিটিজ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিজ ফর এডুকেশন, ওয়াশিংটন, ১৯৯৫, পৃ. ৯।

৭ দ্রষ্টব্য : বালবির জৈন, 'রিটার্নস টু এডুকেশন : ফারদার এনালাইসিস অফ ক্রসকান্ট্রি ডাটা', ইকোনোমিকস অভ এডুকেশন রিভিউ ১০, ১৯৯১, পৃ. ২৫৪; এবং টিপি শুল্‌ৎজ, ১৬ ইনটিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচেস টু হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট', বিশ্বব্যাংক, ১৯৯৪, পৃ. ৮

৮ দ্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ১৯৯৫, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯।

www.pathagar.com

৯ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, দ্যা ফিফথ্ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯৭-২০০২, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩৭।
১০ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৩।
১১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৭-৯৮, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২।
১২ আসফিয়া দুজা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), এডুকেশন অ্যান্ড জেন্ডার ইকুইটি : বাংলাদেশ, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫৫।
১৩ দ্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ১৯৯৫, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯।
১৪ দ্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ১৯৯৫, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭।
১৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৯৬।
১৬ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, দ্যা ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৭৩-৭৮, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৪৫৫।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬।
১৮ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, দ্যা টু ইয়ার প্ল্যান ১৯৭৮-৮০, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ২৩৮।
১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১।
২০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫ (বাংলা সংস্করণ), ১৯৮০, ষোড়শ অধ্যায়-২৪, পৃ. ৩৮, ৪০।
২১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫ (বাংলা সংস্করণ), ১৯৮৬, পৃ. ৩৬৮, ৩৮২।
২২ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, দ্যা ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯০-৯৫, ১৯৯০, পৃ. এক্স-২।
২৩ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, দ্যা ফিফ্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯৫-২০০২, ১৯৯৮, পৃ. ৪৪১।
২৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, প্রতিবেদন, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯।
২৫ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৪২।
২৬ দ্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ১৯৯৫, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯।
২৭ ইউনাইটেড নেশন্স্ এডুকেশনাল, সাইন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অরগানাইজেশন (ইউনেস্কো), ওয়ার্ল্ড এডুকেশন রিপোর্ট ১৯৯৫, প্যারিস, ১৯৯৫, পৃ.।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় নারী

রীতা ভৌমিক

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের একটি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো এখানেও নারীর উচ্চশিক্ষার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি, সমঅধিকার ইত্যাদির জন্য নারীর উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একজন নারী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সমাজের নেতিবাচক মনোভাব, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংতা, কুসংস্কার, আইনি বিধানের ভুল ব্যবহার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সঠিক ভূমিকা রাখার যোগ্য হয়ে উঠবে। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করেই বলা যায় নারীজীবনের সাথে উচ্চশিক্ষার একটি যোগসূত্র রয়েছে। নারীকে তাই শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া রাষ্ট্রীয়ভাবে অপরিহার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা প্রচলনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরুষের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ও সম্প্রসারণ কতটুকু হয়েছে, তা উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ও অবস্থান এবং তাদের পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়। পরিসংখ্যান থেকে উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার আগের তুলনায় বেড়েছে। ফলাফলও আশানুরূপ, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনায়—রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে অগ্রগতি যে ততটা আশানুরূপ নয়, বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সেটাই। তবে তার আগে উচ্চশিক্ষা বলতে কী বোঝায় সেই প্রসঙ্গ। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ডিগ্রি অর্জনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেই সাধারণত উচ্চশিক্ষা বলে। এবার বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রচলন প্রসঙ্গ। শিক্ষার উঁচু স্তরে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঐতিহাসিকভাবে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

২. সহশিক্ষার প্রচলন : বৃটিশ ও পাকিস্তান আমল

তৎকালিন ভারতবর্ষের বৃটিশ সরকার বাংলার জনগণের উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই লক্ষ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৃটিশ সরকারের অনুপ্রেরণায় ১৯১২ সালে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য স্যার রবার্ট নাথানকে সভাপতি ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৪সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে নাথান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ মূলতবি হয়ে যায়। এর বছর তিনেক পর নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াবআলী চৌধুরী, শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হক প্রমুখ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে নাথান কমিটির সুপারিশের আলোকে ১৯১৭ সালে ড. মাইকেল ই স্যাডলারের নেতৃত্বে আরও একটি কমিশন গঠন করে। ওই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত অ্যাক্ট অনুযায়ী আবাসিক ও একক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এতে সহশিক্ষার উল্লেখ ছিল না।

ওই বছরই লীলা নাগ (পরবর্তী কালে বিপ্লবী নেত্রী) কলকাতার বেথুন কলেজ হতে ইংরেজি সাহিত্যে বি এ অনার্স পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক ও একশত টাকার পুরস্কার পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি এখানে এম এ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সহশিক্ষার প্রচলন না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু দৃঢ়চেতা লীলা নাগ এই ব্যাপারটা সহজভাবে না মেনে নিয়ে নিজের ভর্তির সপক্ষে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ও চ্যান্সেলারের (বাংলার গভর্নর) সাথে দেখা করে নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করেন। উপচার্য স্যার পি জে হার্টগ তার যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমতি দেন। ১৯২১ সালে তিনি ইংরেজ সাহিত্যে এম এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। বলা বাহুল্য তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। তার মাধ্যমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯২৩ সালে তিনি এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন, আর প্রথম হন সহপাঠী আলতাফ হোসেন। ওই বছর সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র দুজন।

সে সময় মুসলমান সমাজ নারীর উচ্চশিক্ষার প্রতি উদার মনোভাবাসম্পন্ন ছিল না। প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলাতুননেসা ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশ্রগণিত শাস্ত্রে এম এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালে তিনি এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, এই সময়ে ঢাকার একমাত্র মহিলা কলেজের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে সেই কলেজের আই, এ পাস করা প্রায় সকল ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ত্রিশের দশকের প্রথমভাগে অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী করুণা গুপ্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হন।

www.pathagar.com

ওই সময়ের আরেক মেধাবী ছাত্রী ছিলেন কিরণ দত্ত। যিনি দর্শনে অনার্সসহ কৃতিত্বের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে সংস্কৃত বিষয়ে অনার্সে সুনীলা গুহ, অংক নিয়ে অনার্সে আভা দত্ত ও সাধনা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সুনীলা গুহ ১৯৩৮ সালে বি, এ সংস্কৃত সাম্মানিক ডিগ্রিতে রাজা কালীনারায়ণ বৃত্তি, নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক ও অভয়চন্দ্র দাস মেমোরিয়াল প্রাইজ ও ১৯৩৯ সালে এম, এ ডিগ্রিতে স্বর্ণপদক পান। অন্য দু'জনও প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশের দশকের নারীর উচ্চশিক্ষার গৌরবোজ্জ্বল ফলাফলের স্বাক্ষর রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ছাত্রী ফজিলাতুননেসার দীর্ঘ দশ বছর পর দ্বিতীয় মুসলমান ছাত্রী খোদেজা খাতুন ১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হন। ত্রিশের দশকের শেষভাগে আরো অনেক ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ভারতলক্ষ্মী অর্থনীতি বিষয়ে অনার্সে এবং অনুপমা সেন ইংরেজি বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হন। মুসলমান ছাত্রীদের মধ্যে যারা নারীশিক্ষা অর্জনে এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে ছিলেন জামশেদুন নেসা, মালিকা আখতার বানু (মালিকা আল রাজি) প্রমুখ।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে দর্শন বিষয়ে অনার্সে ঊষা রানী মুখার্জি, ইংরেজি বিভাগে আফিয়া খাতুন, আরবি বিভাগে আসিয়া খাতুন, অর্থনীতিতে আজিজুন নেসা প্রমুখ নারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন। ওই বছরই আখতার ইমাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম, এ পার্ট ওয়ানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং পার্ট টুতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হন। এরপর ১৯৪৮ সালে বৃত্তি নিয়ে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ঘটলে কলকাতা থেকে অনেক মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অন্যদিকে অনেক হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী পূর্ববাংলা ছেড়ে ভারতে চলে যান। এতে হিন্দু ছাত্রী সংখ্যা যেমন কমে যায়, মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা তেমনি বৃদ্ধি পায়। দেশ বিভাগের পর এভাবেই বেড়ে যায় মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা।

চল্লিশ দশকের শেষভাগে ছাত্রী হিসেবে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন তাদের মধ্যে লুলু বিলকিস বানু, লায়লা আরজুমান্দ বানু, নূরজাহান বেগম, শামসুন নাহার, তাওহিদা রহমত আরা হোসেন, হোসনে আরা, আনোয়ারা সোবহান, হাসিনা আহমেদের নাম উল্লেখযোগ্য। চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৬০ জন।

ত্রিশের দশক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নারীদেরকে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করার জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেয়। এই সময় একটা বাংলোতে ছাত্রী হোস্টেল চালু করা হয়। পরে চল্লিশের দশকে মেয়েদেরও এই হোস্টেলটি সেগুনবাগিচায় চামেরী হাউসে স্থানান্তরিত হয় এবং অনাবাসিক ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চাশের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার হার পূর্বের চেয়ে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায়

www.pathagar.com

দেড়গুণ। ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'উইমেন্স হল' নামে ৯২ জন ছাত্রীর জন্য একটা স্বতন্ত্র ছাত্রী হল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছাত্রী হল প্রতিষ্ঠার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিদেশী ছাত্রীরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহী হন। পাকিস্তানের (পশ্চিম) আজিজা ফাতেমা, পারভিন কাওসার, রেহানা ইউনুস, সেগুফতা খুরশিদ আনজুম, থাইল্যান্ডের ললিতা কিমারামান, শিরিকার্ন প্লেক্রম ভিলাই, পালং কার্চন চুনহং, জার্মান ছাত্রী জুলেটা চৌধুরী, জাপানি এইকো তাবে, ইন্দোনেশিয়ার গণগেয়াল ইয়েম, নেপালের রাধা শ্রেষ্ঠা, যুক্তরাজ্যের জ্যানেট রিচার্ডসন, ভারতের ফয়জুননেসা প্রমুখ আবাসিক-অনাবাসিক ছাত্রী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এভাবে নারীর উচ্চশিক্ষার গতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

৩. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় নারী

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা, সংস্কার ও উন্নয়নে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীশিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে নারীর উচ্চশিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি লাভ করেনি। তবু ১৯৭০-এর দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের পটভূমিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে নারীদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে শিক্ষালাভের উপর আগ্রহ বাড়ে। এর প্রভাবে উচ্চশিক্ষা অর্জনেও নারীরা পূর্বের যে-কোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি এগিয়ে আসেন।

৩.১ শিক্ষার্থীর হার ও ছাত্রী সংখ্যা

নিচের সারণির দিকে দৃষ্টি দিলেই অগ্রগতির এই চেহারাটা বোঝা যাবে।

সারণী ১

বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান

বছর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		শতকরা হার	মেয়ে শিক্ষার্থীর	শতকরা হার
	ছেলে	মেয়ে	উভয়		
১৯৭০	২১৯৪২	৪৪৪৮	২৬৩৯০	—	১৬.৮
১৯৭৫	২২৮৫০	৪৭০৩	২৭৫৫৩	৪.৪	১১.১
১৯৮০	২৯৫৭২	৬৯৫৮	৩৬৫৩০	৩২.৬	১৯.১
১৯৮৫	৩৪৪৮৬	৭২৯৪	৪১৭৮০	১৪.৪	১৭.৫
১৯৯০	৪১১০৮	১০৬৭২	৫১৭৮০	২৩.৯	২০.৬

www.pathagar.com

বছর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		শতকরা হার	মেয়ে শিক্ষার্থীর	শতকরা হার
	ছেলে	মেয়ে	উভয়		
১৯৯৫	৫৬০১০ (৪৬৬৪৯)	১৬৮৬২ (১৫৪৭৬)	৭২৮৭২ (৬২১২৫)	৪০.৭ (২০.০)	২৩.১ (২৪.৯)
২০০০	৮৩২১৯ (৫৯০৫৫)	২৭৪৩৭ (১৮৮১০)	১১০৬৫৬ (৭৭৮৬৫)	৫১.৮ (২৫.৩)	২৩.৪

সূত্র : ব্যানবেইস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা ১৯৭০-এর পর থেকে দ্রুতিগতিতে বেড়েছে। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ হাজার ৩৯০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল ৪ হাজার ৪৪৮ জন। তিন দশক পর ২০০০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ হাজার ৪৩৭ জনে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার ৬৩৫ জন। এর মধ্যে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল ১৭৮ জন। মোট শিক্ষার্থীর ১৯ হাজার ৯৬৩ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সর্বনিম্ন ২৮০ জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ও ইসলামী এই পাঁচটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৫২২ জন। কৃষি, প্রকৌশল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খুলনা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পাঁচটি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার ১১৩ জন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬.২৮ শতাংশ ছিল ছাত্র, ২৩.৭২ শতাংশ ছাত্রী।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ২০০৪ সালে ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এরকম : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৪৬ জন; দূরশিক্ষণ পদ্ধতি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১ লক্ষ ২১ হাজার৭৬৬ জন; ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮১ হাজার ৫৩৯ জন। অন্যদিকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখমুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার ৭৮৮ জন। সবমিলিয়ে ২০০৪ সালে সর্বমোট

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৮২২। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৬২.৪৮ শতাংশ; আর ছাত্রীর ৩৭.৫২ শতাংশ। এখানে লক্ষণীয় হলো, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা যেখানে ছিল ২৩.৭২ শতাংশ, সেখানে ছয় বছর পর (২০০৪ সালে) ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭.৫২ শতাংশে। তবু এই পরিসংখ্যান অনুসারে সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ক্রমান্বয়ে বাড়লেও ২০০৪ সালের ছাত্রীদের হার ছিল ছাত্রদের প্রায় অর্ধেক। সারণি ২ থেকেই এই চিত্রটি স্পষ্ট হয়।

সারণি ২

১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা

সাল	ছাত্র (শতাংশ)	ছাত্রী (শতাংশ)
১৯৯৯	৭৬.২৮	২৩.৭২
২০০০	৭৫.৮৪	২৪.১৬

২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা

সাল	ছাত্র (শতাংশ)	ছাত্রী (শতাংশ)
২০০২	৭৪.৮০	২৫.২০
২০০৩	৬৩.৭৮	৩৬.২২
২০০৪	৬২.৪৮	৩৭.৫২

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৯৯-২০০৪।

এবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকানো যাক।

সারণি ৩

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর তুলনামূলক হার

সাল	ছাত্র (শতাংশ)	ছাত্রী (শতাংশ)
২০০৪	৭৭.২০	২২.৮০

সূত্র : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

উল্লিখিত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ সালে ছাত্রীর শতকরা হার ছাত্রের শতকরা হারের অর্ধেক হলেও একই বছরে ৫৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর হার ছিল ছাত্রের এক-তৃতীয়াংশ। এতে দেখা যাচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যার বর্তমান চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারে না। মেধার ভিত্তিতে বিষয় বণ্টন করা হয়। এতে করে যার ইচ্ছে ছিল ইংরেজি পড়বে, দেখা যায় মেধার ভিত্তিতে আগেই তা পূরণ হয়ে যাওয়ায় তার সামনে ইংরেজি বিষয়ে ভর্তির দ্বাররুদ্ধ হয়ে যায়। এভাবেই দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের পছন্দ বর্হিভূত বিষয়ে ভর্তি হয়। এখানে কয়েকটা কেসস্টাডি দিচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী প্রজ্ঞা সুস্মিতা নিতুর ইচ্ছে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পড়বে। কিন্তু ভর্তির মেধা তালিকার প্রতিযোগিতায় তার বিষয় নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এ সম্পর্কে নিতু জানায়, নিজের পছন্দ করা বিষয়ে ভর্তি হতে না পারায় মন খারাপ হলেও যে বিষয়ে ভর্তি হয়েছে সেই বিষয়টিকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করছে। ভালো করার চেষ্টা করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টাডিজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী জুঁই চক্রবর্তী আর্কিটেক্ট হবার স্বপ্ন দেখলেও তার সেই স্বপ্ন পূরণ হবে না। কেননা সে এখন পড়ছে উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগে। জুঁই এর মতে মেধাক্রম অনুসারে এই বিষয়টিতে ভর্তি হলেও এখন পড়তে ভালোই লাগছে এই ভেবে সে একজন মেয়ে হিসাবে অন্য মেয়েদের জন্য ভবিষ্যতে কাজ করতে পারবে। জুঁই তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, নারী সংক্রান্ত বিষয় হওয়ার ছেলেরা এই বিষয়টি পড়তে আগ্রহী হয় না। আমার ক্লাসে মাত্র ২০ জন ছাত্র যা পুরো ক্লাসের ছাত্রীর অর্ধেক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দুটি বিভাগে ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের সংখ্যা কম, উইমেন্স স্টাডিজ তার একটি। এর কারণ তারা হয়তো মনে করে এই বিষয়টি পড়লে নারীদের জন্য কাজ করতে হবে। এই প্রবণতা নারীর প্রতি পুরুষ কতটা সহানুভূতিশীল তা বোঝা যায়। অন্যদিকে মেয়েরা আবার এই বিভাগে পড়লে মেয়েদের উপর সরাসরি কাজ করা যাবে বলে বিষয়টি পড়ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সুলতানা আফরোজা জানান, আমার ক্লাসে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। এই বিভাগটিই মূলত দ্বিতীয় সেই বিভাগ যেখানে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। মেয়েদের এই বিষয়টিতে পড়তে আগ্রহী হবার কারণ হলো প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা শেষ করে একজন নারী কর্মক্ষেত্রে যোগদান করার সুযোগ পেতে পারে বলে তারা এই বিষয়ে পড়তে আসে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি গণিতের ছাত্রী লোপামুদ্রা চক্রবর্তী ইঞ্জিংনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ভর্তির মেধা তালিকায় স্থান না পাওয়ায় গণিতে ভর্তি হয়। লোপার মতে, গণিতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা অনেক এগিয়ে রয়েছে।

এছাড়া উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্রীরা প্রকট আবাসিক সমস্যার সম্মুখীন হন। হল-হোস্টেলে আসন পেতে এক বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। ছাত্রীরা ছাত্রদের মতো কয়েক জনে মিলে মেস করে থাকতে পারে না। এই ধরনের ব্যবস্থাও আমাদের সমাজে প্রচলিত নেই। 'আবাসন' ভাড়া পেলেও নিরাপত্তার শঙ্কা, যানবাহন সমস্যাসহ নানা সংকটের মধ্য দিয়ে মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়। এতে

www.pathagar.com

পড়াশোনায় যে ঘাটতি পড়ে, তা পূরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলাফলে গিয়ে এর প্রতিক্রিয়া পড়ে। এসব সমস্যা না থাকলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা যে আরও ভাল করতে পারত, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৩.২ উচ্চশিক্ষার মেধাবৃত্তিতে নারী

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এবং তাদের মেধাবিকাশে অনুপ্রাণিত করার জন্য উচ্চশিক্ষা স্তরে বৃত্তি প্রচলন, ছাত্রী নিবাস তৈরি ইত্যাদি উদ্যোগ দেওয়া হয়। এ লক্ষ্যেই ১৯৮২ সালে ইউজিসি মেধাবৃত্তির প্রচলন শুরু হয়।

সারণি ৪
ইউজিসি মেধাবৃত্তি

সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৯৯৭	২৭	০৫
১৯৯৮	২৮	০৫
১৯৯৯	৩৪	০৯
২০০০	৩৩	০৬
২০০৩	৪৪	১৮
২০০৪	৩৭	০৮

সূত্র : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্টে ১৯৯৭-২০০৪ বর্ষে ইউজিসি মেধাবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ফলাফলে দেখা যায়, ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর মেধাবৃত্তি প্রাপ্তির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন ছাত্রী ইউজিসি মেধাবৃত্তি পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, জাহাঙ্গীনর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন ছাত্রী ইউজিসি মেধাবৃত্তি পেয়েছে। ২০০০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর ১ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন ছাত্রী ইউজিসি বৃত্তি পেয়েছে।

www.pathagar.com

২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন ছাত্রী ইউজিসি মেধাবৃত্তি পেয়েছে।

২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন ছাত্রী ইউজিসি মেধাবৃত্তি পেয়েছে। এই জরিপ থেকে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের থেকে উচ্চশিক্ষার মেধা তালিকায় এগিয়ে থাকলেও ছাত্রদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

৩.৩ উচ্চশিক্ষার মেধাবৃত্তির শিক্ষিকাদের সংখ্যা

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ১৯৭৭-৭৮ সালে ইউজিসি পিএইচডি ফেলোশিপ (জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ), ১৯৮৭ সালে সার্ক চেয়ার ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ, কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, যুক্তরাজ্যও কানাডা ২০০০ এবং কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ এওয়ার্ড ২০০০-এর প্রচলন শুরু হয়।

সারণি ৫

কমনওয়েলথ স্কলারশিপে (যুক্তরাজ্য) মনোনীত শিক্ষক-শিক্ষিকা

সাল	শিক্ষক সংখ্যা	শিকিক্ষকা সংখ্যা
১৯৯৭	১৭	০৫
১৯৯৯	১৭	০৪
২০০০	২৫	০৭
২০০১	১৭	০৩
২০০৪	০৪	০০
২০০৫	১৯	০৩

সূত্র : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিসংখ্যানে (সারণি ৫) দেখা যায় পিএইচডি ডিগ্রি করার জন্য কমনওয়েলথ স্কলারশিপ (যুক্তরাজ্য) মনোনীত শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য ১৯৯৭ সালে যথাক্রমে ১৭ ও ৫ জন, ১৯৯৯ সালে ১৭ ও ৪ জন, ২০০০ সালে ২৫ ও ৭ জন, ২০০১ সালে ১৭ ও ৩ জন, ২০০৪ সালে ৪ ও শূন্য জন এবং ২০০৫ সালে ১৯ ও ৩ জন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকদের তুলনায় শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণ ছিল অনুল্লেখযোগ্য। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১১২ জন শিক্ষকের বিপরীতে মাত্র ২৩ জন শিক্ষিকা কমনওয়েলথ স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এই ২৩ জন শিক্ষিকার মধ্যে আবার ১৫ জনই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। অর্থাৎ উচ্চতর ডিগ্রি (পিএইচডি) করার ক্ষেত্রে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণ তেমন আশাব্যঞ্জক নয়।

সারণি ৬
ইউজিসি পিএইচডি ফেলোশিপে সমাপ্ত অভিসন্দর্ভ

সাল	ফেলোর সংখ্যা	নারীর ফেলোর সংখ্যা
১৯৯৭	০৮	০২
১৯৯৮	১০	০২
১৯৯৯	০৭	০১
২০০০	১১	০০
২০০৩	১২	০৩
২০০৪	০৭	০২

সূত্র : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্টে ১৯৯৭-২০০৪ সালের উচ্চশিক্ষায় ইউজিসি পিএইচডি ফেলোশিপের অধীনে সমাপ্ত অভিসন্দর্ভের সংখ্যা থেকে দেখা যায় পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ ছিল এক-চতুর্থাংশ। ১৯৯৭ সালে ৮ জনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন অর্থাৎ মোট ২ জন নারী সহকারী অধ্যাপক তাদের অভিসন্দর্ভ জমা দেন। ১৯৯৮ সালে ১০ পুরুষের মধ্যে ইডেন সরকারী মহিলা কলেজের ১ জন প্রভাষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন নারী সহযোগী অধ্যাপক তাদের অভিসন্দর্ভ জমা দেন। ১৯৯৯ সালে অভিসন্দর্ভ জমা দানকারীর সংখ্যা ছিল ৭ জন। এদের মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ছিলেন ৬ জন এবং একজন ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী সহকারী অধ্যাপক। ২০০০ সালে অভিসন্দর্ভ জমা দেওয়া ১১ জন শিক্ষকের মধ্যে কোনো নারী শিক্ষক ছিলেন না। ২০০৩ সালে অভিসন্দর্ভ জমা দেন ১২ জন শিক্ষক। এদের মধ্যে ৩ জন ছিলেন নারী শিক্ষক। ২০০৪ সালে ৭ জন শিক্ষক অভিসন্দর্ভ জমা দেন। এদের মধ্যে ২ জন ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক।

www.pathagar.com

সারণি ৭
কমনওয়েলথ একাডেমিক এওয়ার্ড

	ফেলোশিপ		স্কলারশিপ	
সাল	শিক্ষক-শিক্ষিকা	শিক্ষিকা	শিক্ষক-শিক্ষিকা	শিক্ষিকা
১৯৯৮	১৬	০১	১৬	০২
১৯৯৯	১৬	০৩	১৩	০৩
২০০০	১৪	০১	১৩	০৩
২০০১	১৩	০২	১৩	০২
২০০৪	০৮	০১	০৩	০২
২০০৫	১৮	০১	০৯	০৪

সূত্র : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৯৭-২০০৪

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কমনওয়েলথ একাডেমিক এওয়ার্ডের ফেলোশিপ ও স্কলারশিপে মনোনীত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ১৯৯৮ সালে মনোনীত হয়েছেন ১৬ জন করে ৩২ জন শিক্ষক। এদের মধ্যে ফেলোশিপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা এবং স্কলারশিপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা ছিল। ১৯৯৯ সালে ফেলোশিপে ১৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্কলারশিপে ১৩ জন মনোনীত হন। এদের মধ্যে ফেলেশিপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষিকা এবং স্কলারশিপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা মনোনীত হয়েছেন। ২০০০ সালে ১৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ফেলোশিপ পান। এদের মধ্যে ১ জন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। স্কলারশিপে শিক্ষিকা মনোনীত হন। ২০০১ সালে ১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ফেলোশিপে মনোনীত হয়েছেন। এদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা মনোনীত হন। স্কলাশিপে মনোনীত হন ১৩ জন শিক্ষিক-শিক্ষিকা। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হন। ২০০৪ সালে ৮ জন শিক্ষিক-শিক্ষিকা ফেলোশিপ পান। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা ছিলেন। স্কলারশিপে মনোনীত ৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা মনোনীত হন। ২০০৫ সালে ফেলোশিপে মনোনীত হন ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এদের মধ্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা মনোনীত হন। স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন ৯ শিক্ষক-শিক্ষিকা। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষিকা মনোনীত হয়েছেন।

www.pathagar.com

কয়েক বছরের কমনওয়েলথ একাডেমিক এওয়ার্ড ফেলোশিপ ও স্কলারশিপে (শিক্ষক-শিক্ষিকা) মনোনীতদের ফলাফলে দেখা যায়, পুরুষ শিক্ষকের তুলনায় নারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিল এক-চর্তুথাংশেরও কম। কমনওয়েলথ একাডেমিক এওয়ার্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের হার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের চেয়ে বেশি হলেও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের হার ছিল অনেক কম। এই পরিসংখ্যাণ থেকে বোঝা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নারীশিক্ষার হার যেমন কম ছিল, তেমনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনেও নারীরা পিছিয়ে ছিলেন।

৩.৪ ফলাফলে ছাত্রীদের হার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান শ্রেণীর কয়েকটি বর্ষের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যাবে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের ভর্তির হার যেমন কম ছিল (যা আগেই উল্লেখ করেছি), তেমনি সাফল্যের দিক থেকেও তারা ছাত্রদের তুলনায় পিছিয়ে থেকেছে। এই প্রবন্ধের শেষের দিকে যুক্ত সারণিগুলো থেকেই এর প্রমাণ মেলে।

ফলাফলের সারণীগুলো থেকে যে প্রবণতাটি প্রথমেই চোখে পড়ে তা হলো ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত অনার্স পরীক্ষার ফলাফলে ছাত্রীদের সাফল্যের হার ক্রমশ বাড়ছে। ২০০১ সালে বি, এ অনার্সের ৯টি বিষয়ে ২৪ জন ছাত্র ও ১৩ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৩১৪ জন ছাত্র ও ২৯৮ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, বিএসসি অনার্সের ১৫টি বিষয়ে ১১৮ জন ছাত্র ও ৬০ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৩১১ জন ছাত্র ও ১৭৫ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, বিবিএ অনার্সের ৪টি বিষয়ে সিজিপিএ ৩.০ থেকে ৪.০ পেয়েছে ১৪৭ জন ছাত্রী, বিএসএস অনার্সের ৮টি বিষয়ে ১৮ জন ছাত্র ও ২৪ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৫৪০ জন ছাত্র ও ৩৫৫ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ এবং অনার্সের অন্যান্য ২টি বিষয়ে ২৯ জন ছাত্র ও ১৩ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ এবং ৯৯ জন ছাত্র ও ৪১ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। ২০০২ সালে বি এ অনার্সের ১২টি বিষয়ে ৩২ জন ছাত্র ও ১৫ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৩০৪ জন ছাত্র ও ২৭৬ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, বিএসএস অনার্সের ৭টি বিষয়ে ২১ জন ছাত্রও ও ৩০ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৪০৯ জন ছাত্র ও ২৮১ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, বিবিএ অনার্সের ৪টি বিষয়ে সিজিপিএ ৩.০ থেকে ৪.০ পেয়েছে ১৬৪ জন ছাত্রী, বিএফএ অনার্সের ৭টি বিষয়ে ৮ জন ছাত্রও ও ৩ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ এবং ৪০ জন ছাত্র ও ৩৩ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, বিএসসি অনার্সের ১৯টি বিষয়ে ১৪৯টি জন ছাত্র ও ১২২ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ এবং ৩৭৮ জন ছাত্র ও ২১০ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। অনার্সের ২টি বিষয়ে ২৮ জন ছাত্র ও ১৫ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ এবং ৭৭ জন ছাত্র ও ৪৫ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। ২০০৩ সালে বিএসসি অনার্সের ১৬টি বিষয়ে ১৮৬ জন ছাত্র ও ১১৮ জন ছাত্রী প্রথম

www.pathagar.com

বিভাগএবং ৩৪০ জন ছাতও ও ২১৩ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, বিএসএস অনার্সের ৮টি বিষয়ে ২৩ জন ছাত্র ও ৪৪ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ এবং ৫২৬ জন ছাত্র ও ৩৫৬ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, বিএ অনার্সের ১৩টি বিষয়ে ০৭ জন ছাত্র ও ১৬ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ এবং ৪৪৮ জন ছাত্র ও ২৯৮ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, বিবিএ অনার্সের ২টি বিষয়ে সিজিপিএ ৩.০ থেকে ৪.০ পেয়েছে ৮৬ জন ছাত্রী, অনার্সের অন্যান্য ২টি বিষয়ে ৩৪ জন ছাত্র ও ১৫ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ এবং ৭৪ জন ছাত্র ও ৩৭ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ পায়।

অনার্সের তিন বছরের এই ফলাফলে দেখা যায়, সমাজ বিজ্ঞান, আন্তজার্তিক সম্পর্ক, ইতিহাস, দর্শন, ইংরেজি, বাংলা, অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন, ভূগোল ও পরিবেশ, আইন, পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ, একাউন্টিং ও ইনফরমেশন সিস্টেম প্রভৃতি বিষয়গুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল বেশি। অর্থাৎ মেয়েরা মূলত এইসব বিষয়ই বেশি পড়ে। এছাড়া লোকপ্রশাসন, অর্থনীতি, প্রাণিবিদ্যা, সমাজকল্যাণ উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, আইন, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, সংগীত, সংস্কৃত ইত্যাদি বিষয়ে ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরা এগিয়ে ছিল।

এবার ২০০১ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এমএ / এমএসএস / এমএলএল / এমএসসি-র ফলাফল প্রসঙ্গ। এই ফলাফল সংক্রান্ত সারণী থেকে দেখা যায় ২০০১ সালে এমএ-র ৪টি বিষয়ে ৫ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৩২ জন ছাত্র ও ৮ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমএসসি-র ১৭টি বিষয়ে ১৪৫ জন ছাত্র ও ৯৬ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ১১২ জন ছাত্র ও ৭৭ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমএসএস-এর ৮টি বিষয়ে ৫৭ জন ছাত্র ও ৩৯ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৩৪৫ জন ছাত্র ও ২৮১ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমবিএ-এর ১টি বিষয়ে সিজিপিএ ৩.০ থেকে ৪.০ পেয়েছে ৩০ জন ছাত্রী এবং এমএ-এর অন্যান্য ৪টি বিষয়ে ১৬ জন ছাত্র ও ১৭ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৭০ জন ছাত্র ও ৩০ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ পায়। ২০০২সালের এমএসসি-এর ১৭টি বিষয়ে ৭৩ জন ছাত্র ও ৭৮ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ১২০ জন ছাত্র ও ৪৪ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমএ-র ১১টি বিষয়ে ২৫ জন ছাত্র ও ২৯ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ২৪৬ জন ছাত্র ও ২২৬ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমএসএস-এর ১০টি বিষয়ে ৯০ জন ছাত্র ও ৭৭ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৪১১ জন ছাত্র ও ৩২০ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমএ-র ২টি বিষয়ে ৯ জন ছাত্র ও ৫ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৭১ জন ছাত্র ও ৩২০ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমএ-র ২টি বিষয় ৯ জন ছাত্র ও ৫ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৭১ জন ছাত্র ও ৩৪ জন ছাত্রী দ্বিতীয বিভাগ এবং এমবিএ-র ২টি বিষয়ে সিজিপিএ ৩.০ থেকে ৪.০ পেয়েছে ৬৮ জন ছাত্রী। ২০০৩ সালে এমএসএস-এর ৭টি বিষয়ে ৪৭ জন ছাত্র ও ৬৩ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ৩১৪জন ছাত্র ও ২২৪ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমএ-এর ১১টি বিষয়ের ৩৭ জন ছাত্র ও ২৫ জন ছাত্রী প্রথম বিভাগ, ২২৮ জন ছাত্র ও ২০৪ জন ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগ, এমবিএ-এর ৩টি বিষয়ে সিজিপিএ ৩.০ থেকে ৪.০ পেয়েছে ৮৯

www.pathagar.com

জন ছাত্রী এবং এমএসসি-র ১টি বিষয়ে ১৩ জন ছাত্র ও ৯ জন ছাত্রী প্রথম ও ৩ জন ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগ পায়। অনার্স পরীক্ষার মতো এমএ পরীক্ষার ফলাফলে ছাত্রীদের সাফল্য ক্রমান্বয়ে বাড়লেও এমএতে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ছিল অনেক বেশি। অনার্সের পর বিয়ে, চাকরি বা সাংসারিক সমস্যাসহ নানা কারণে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে এমএ পর্যন্ত পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারে না। পুরুষশাষিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারী এখনও জড়িয়ে রয়েছে। নারীশিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশু পালন ও ঘরকন্নার কাজ হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশে নারীর উচ্চশিক্ষা বিস্তারে যে-সব সমস্যা রয়েছে তন্মধ্যে-প্রতি বছর এস, এস, সি ও এইচ, এসসির ফলাফলে দেখা যায়, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাশের হার কম। পাশের হার কম হওয়াতে মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় কম অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও যারা পাশ করে বের হয় তাদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হয় না। এর কারণ অভিভাবকরা মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলেই বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিয়ে দেবার প্রবণতা দেখা দেয়। অনেক ছাত্রী পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল সংখ্যা কম হওয়ার কারণে ভর্তি হতে আগ্রহী হয় না। কিন্তু ছাত্র হল সংখ্যা কম হলেও ছাত্ররা মেস করে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে যা একজন মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু যে আবাসিক বাসস্থানের সমস্যা তা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকদের মন মানসিকতায় লক্ষণীয় যে, ছেলেরা সংসারের হাল ধরবে আর মেয়েরা বিয়ের পর অন্যের বাড়িতে চলে যাবে। কাজেই অর্থনাশ করে শুধু ছেলেটিকে শিক্ষিত করা হয়। মেয়ে যেহেতু তার সংসারে কোনো দায়িত্বই বহন করে না সেহেতু ময়েটির শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকরা অর্থ খরচ করে না। এছাড়া আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কারণে একজন ছেলের তুলনায় মেয়ের শিক্ষার খরচ বেশি হয়। যদি মফস্বলের একজন ছাত্রর উদাহরণ দেওয়া যায়, দেখা যায় ছেলেটি হেঁটে, বাসে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌছতে পারে। একজন মেয়ের পক্ষে যাতায়াত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দূরত্বের কারণে মেয়েটিকে রিকশায় যেতে হয়। এতে তার পড়াশুনার খরচ বেড়ে যায়। খরচের ভয়ে বা নিরাপত্তাহীনতার কারণে অভিভাবকরা মেয়েটির পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়। এর চেয়ে প্রধান সমস্যা অভিভাবক উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেটিকে দূরে পাঠাতে দিধাগ্রস্ত হয় না। অন্যদিকে নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা মেয়েটিকে দূরে পাঠাতে স্বস্তি পায় না। অনার্স বা এমএ ভর্তি হয়ে সেশনজটের কারণে ছাত্রীদের বয়স বেড়ে যাওয়ায় অভিভাবকরা পড়াশুনার মাঝপথে বিয়ে দিয়ে দেয়। ফলে সাংসারিক ঝামেলা বা শ্বশুরবাড়ির বিধিনিষেধের কারণে মেয়েটি পড়া বন্ধ করে দেয়।

এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন দরকার। উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের হার বাড়ানোর জন্য প্রথমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সংখ্যক আবাসিক ছাত্রী হল সংখ্যা বাড়াতে হবে। পরিবারের ভবিষ্যত উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত শিশুদের উন্নয়নে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা অনেক। এক্ষেত্রে প্রতিটি মায়েরই উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি প্রচার

www.pathagar.com

মাধ্যমের সাহায্যে ভবিষ্যত শিশুদের উন্নয়নে শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা, সমাজের প্রচলিত ভুল ধারণা—যেমন মেয়েরা অংকে কাঁচা, মেয়েরা প্রকৌশলী বিষয়ে ভালো ফল করতে সক্ষম নয়; কতগুলো পেশা—যেমন সাংবাদিকতা, প্রশাসন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নারী অযোগ্য বলে অভিভাবকের ধারণা করে নেওয়া, পরিবারের আর্থিক চাহিদা ছেলেরা মেটায় কিন্তু মেয়েরা নয়, সনাতন এসব ধারণা বর্জন করে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। নারীর অতিরিক্ত পোশাক পরাই পর্দা নয়, বরং শালীন পোশাক পরাই পর্দা। অতিরিক্ত পর্দাপ্রথার কারণে নারী স্বচ্ছন্দ্যে চলাফেরা ও কাজ করতে বাধাগ্রস্ত হয়। পর্দাপ্রথার কারণে নারীর সহশিক্ষাও নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এসব বিষয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, রেডিও, টেলিভিশন এবং গণমাধ্যমে বহুল প্রচার করে জনগণের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়ালে উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে।

তথ্যসূত্র

১. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, বসুধারা প্রকাশনী, ১৩৭০, কলিকাতা, ১৩৭০।

২. মহসিন শাস্ত্রপাণি (সম্পাদনা), অধ্যাপক আখতার ইমাম সংবর্ধনা গ্রন্থ, ঢাকা, ২০০১।

৩. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যান : ১৯৯৭-২০০৪।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত অনার্স ও এম-এর বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ফলাফল জগন্নাথ হলের প্রাধাক্ষ্যের কার্যালয় থেকে সংগৃহীত।

৪. সাক্ষাৎকার : প্রজ্ঞা সুস্মিতা নিতু, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সুলতানা আফরোজা, গণযোগাযোগ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জুঁই চক্রবর্তী, জেন্ডার উইমেন্স স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লোপা মুদ্রা চক্রবর্তী, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. Planning Commission, The Five Year Plan (1997–2002), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

www.pathagar.com

স্বশিক্ষায় নারীর ভূমিকা

মানিক মাহমুদ

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। আমাদের সংবিধানেও (অনুচ্ছেদ-১৫) এর স্বীকৃতি মেলে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য সাংবিধানিক এই শর্ত আজও আমাদের পুরোপুরি পূরণ হয়নি। নারী শিক্ষায় এ শর্ত আরো পূরণ হয়নি। হতাশাজনক চিত্র হলো বাংলাদেশে এখনও ৫৯.৯%[১] মানুষ নিরক্ষর। তলিয়ে দেখলে পাওয়া যায় এর মধ্যে নারী (বয়স্ক) পুরুষের তুলনায় ২২%[২] বেশি নিরক্ষর।

শিক্ষায় অসমতা : কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য[৩]

সাংবিধানিক অধিকার থাকলেই সবকিছু হলো না, অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ চাই। সত্যি করে বললে নারী শিক্ষা এবং শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নে আমরা এখনও সেই সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারিনি। নইলে এখনও বেশি নারী নিরক্ষর থাকে কি করে! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারীর ভর্তির ৮৬%। এটুকুই আনন্দদায়ক। মাধ্যমিকে গিয়েই ভর্তির এ হার দাঁড়ায় ৪৭%। হতাশার চিত্র এরপরেই আমরা পাই। উচ্চ মাধ্যমিক ও তার উপরে ভর্তির হার মাত্র ৪% নারী কোটা থাকলেও পুরণ করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৩৭%। বর্তমানে দেশে নারী সচিব নেই একজনও। নেই সুপ্রিমকোর্টে একজনও বিচারপতি। রাজনৈতিক দলগুলির নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে মাত্র ৫% নারী সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুহার এখনও বিশ্বে সর্বোচ্চ। বৈশ্বিক চিত্রও বেদনাদায়ক। এখনও বিশ্বের মোট সম্পদের ১০০ ভাগের মাত্র ১ ভাগের মালিক নারী, যদিও নারী পুরুষের তুলনায় ১৫ গুণ বেশি পরিশ্রম করে। অনেকেই সরল মন্তব্য করেন, আমাদের দুই প্রধানমন্ত্রীই তো নারী। এই সরলমতিরা বোঝার চেষ্টা করেন না

১. হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৫
২. হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৪
৩. হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৪-২০০৫, দৈনিক প্রথম আলো, ৮ ,মার্চ, ২০০৫

www.pathagar.com

যে, এটা উত্তরাধিকার, যা নিরক্ষরতার থেকেও ভয়ংকর! শিক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। নিরক্ষরতার প্রভাব গ্রামে আরো প্রকট। আগ্রহ থাকার পরেও সেখানে অসংখ্য বাবা-মা আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মেয়ে সন্তানদের বেশি লেখাপড়া করান না। কিন্তু একইসাথে যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তাদের মধ্যেও একটি বড় অংশ মেয়ে সন্তানদের লেখাপড়া শেখান না। কারণ তারা বিশ্বাস করেন, 'এর দরকার নেই, কেননা মেয়েদের আসল জায়গা স্বামীর ঘর।' এর থেকে বড় বাধা আর কি হতে পারে!

একটি বেদনাদায়ক উদাহরণ[৪] এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের সময় ষোল বছর বয়সী মর্জিনা মৃত্যুবরণ করে। গত বছরের শুরুর দিকে মর্জিনাকে বাল্যবিবাহে বাধ্য করা হয়। গত বছরই মর্জিনা এ লেখককে জানায়, সে শিক্ষক হবার স্বপ্ন দেখেছিল। তার সে স্বপ্ন পুরণও হতে পারতো, তার বাবার সে সামর্থ্য ছিল। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হলো না, কারণ তার দাদা নাতী জামাই দেখে যেতে চান। এই অজুহাতে তার অমতেই বিয়ে দেয়া হয়। বিয়ের সময় মর্জিনার তার স্বামীকেও পছন্দ হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্বামীর বাড়িতে লেখাপড়া? বলেছে, প্রশ্নই ওঠে না।

নারী-পুরুষে অসমতা

শিক্ষায় নারীর প্রতি এই অসমতার কারণ বুঝতে হলে বিশ্লেষণের চোখ দিয়ে দেখতে হবে আমাদের সংস্কৃতিকে। এখানে নারীকে দেখাই হয় দুর্বল, পরনির্ভরশীল ও কোমল হিসেবে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্ম এই ধারণাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে কতই না অপব্যাখ্যা হাজির করেছে। এই অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গিটি যুগে যুগে সংক্রমিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। যদিও এর শুরু সেই আদিম যুগে। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যাকে বলেছেন *নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়*। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকেই। এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করে বলেন '... মানব সমাজে প্রথম যে শ্রেণী নিপীড়ন সেটাও হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে'[৫]। গর্ভধারণকে কেন্দ্র করেই নারীকে প্রথম ঘরে ফিরতে হলো। কিন্তু সন্তান ধারণ করা যে একটি কত বড় ক্ষমতা তা পাশ কাটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে সন্তান লালন-পালন করা নারীর মূল কাজ। পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে এ কাজটিও যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাও পাশ কাটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলো নারী ঘরের শোভা। এভাবে ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠিত হলো ব্যক্তি মালিকানা এবং এক পর্যায়ে উত্তরাধিকার আইন। এ ইতিহাস সকলেরই জানা।

নারীর প্রতি এই বৈষম্য সামন্ত যুগে আরো বিকশিত হয়। পুঁজিবাদের যুগে এ বৈষম্য ভয়াবহ রূপ নেয়। নারীকে বানানো হয় পণ্য। এই ধারণা যুগে যুগে বিকশিত হতে হতে সামাজিক কুসংস্কারে পরিণত হয়। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে গেঁথে

৪. মর্জিনা গাইবান্ধার মুক্তিনগর ইউনিয়নের মেয়ে। তার মৃত্যুর খবর পাই এ বছরের অক্টোবরে মুক্তিনগরের নারী গণগবেষকদের একটি কর্মশালায়। গত বছর একই গ্রামের নারী গবেষকদের একটি সাপ্তাহিক সভায় মর্জিনার সাথে আমার আলাপ হয়।

৫. নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠা ১৫৪

www.pathagar.com

গেছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এটাকেই আধুনিককালে বলা হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্য। এই বৈষম্যের প্রকটতায় নারীর শিক্ষা 'অধিকার'-এর পরিবর্তে হয়ে উঠেছে 'সুযোগ'। এতে বাধাগ্রস্থ হয়েছে নারী স্বত:স্ফূর্ততা। স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ায় মানুষের সৃজনশীলতা অর্থাৎ নিজে নিজে শেখা 'স্বশিক্ষা'-র প্রক্রিয়া ও আগ্রহ কোনটিই দাঁড়ায় নি ঠিকভাবে। এতে নারী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কারণ সমাজের সবচেয়ে দুর্বল একজন পুরুষও একজন নারীকে শোষণ করতে পারে, এই সংস্কৃতির জোরে।

স্বশিক্ষা

স্বশিক্ষার চর্চা আমাদের দেশে এমনিতেই কম। তার ওপর বিদ্যমান অসমতা নারীর মৌলিক অধিকারকে খন্ডিত করেছে। এ সকল কারণে আমরা এখনও ছক বাধাঁ শিক্ষায় আটকে আছি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নিজেকে আকাশের জন্য আলোকের জন্য প্রস্তুত কর' শিক্ষানুরাগীদের প্রতি এমন আহ্বান জানিয়েছেন অনেক আগেই। অর্থাৎ যে শিখতে চায়, সে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেবে জ্ঞান আহরণে, তবেই না তার শেখার শুরু। যে আলোকের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তার পক্ষেই কেবল প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত তাকেই বলেছেন, শিক্ষা দ্বারা যার চিত্ত জাগরিত হয়েছে, চিত্তে যার একটা জাগরণ ঘটেছে। এই জাগরণের মধ্যে দিয়ে একটি প্রাপ্তি ঘটে তা হলো তার আত্মমর্যাদা। শেখার এ প্রক্রিয়া ধারাবাহিক, বাক্স বন্দী করে রাখা বিষয় নয়। এ প্রক্রিয়ায় 'কেবল সত্যের জ্ঞানই যথেষ্ঠ নয়। অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অবিরাম সেই জ্ঞান *নবায়ন* করতে হবে'[৬] বলেছেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। এমন ধারণা বার্ট্রান্ড রাসেলও দিয়েছেন। নবায়নের এ ব্যাপারটিও আবার প্রতিদিনের। এর মধ্য দিয়েই একজন শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে বাছবিচার করা ও অনুসন্ধানী হবার ক্ষমতা বিকশিত হয়।

এমন খোলা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। আমাদের শিক্ষা আটকে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয়। এই কাঠামোর ফাঁদে ধর্ম তার শাখা ছড়িয়ে দিয়েছে নির্বিঘ্নে। ইতিহাস আমাদের জানায় 'ধর্মের গণ্ডিতে যে শিক্ষা, তা মানুষকে গণ্ডিতে বেঁধে ফেলে।'[৭] তারপরেও ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিনি।

স্বশিক্ষার সম্ভাবনা

অথচ, স্বশিক্ষার সহায়ক পরিবেশ মানুষের মধ্যে নতুনের প্রতি গভীর তাগিদ সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ততার সুযোগ থাকার কারণে মানুষ দ্রুতই তার অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। তৈরি হয় সমবেত স্বপ্ন। এই অধিকার-সচেতনতা মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলে। অধিকার আদায়ে এবং বড় বাধা অতিক্রমে প্রতিবাদের জন্য দরকার পড়ে

৬. আইনস্টাইন ১৯৫৬ সালে নিউয়র্কের আলবানিতে শিক্ষানুরাগীদের এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন।

৭. অনার্জিত শিক্ষাপুরাণ, মোজাফ্ফর আহমদ, পৃ: ৩৫

www.pathagar.com

সংগঠিত শক্তির, এ শক্তিও গড়ে ওঠে এ অধিকার-সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায়। আসলে স্বশিক্ষা পরিবর্তনের এমন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রও সৃষ্টি করে। স্বশিক্ষণের পুরো মিথস্ক্রিয়াটি জীবনের পাঠশালার অভিজ্ঞতা থেকে ঘটে বলেই এমনটা সম্ভব।

স্বশিক্ষায় নারীর ভূমিকা : একটি মূল্যায়ন

মানুষ স্বশিক্ষায় বিকশিত হতে পারলে, তা সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে হলেও, কত বড় যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে তা বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। একটি সচল দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। দৃষ্টান্তটি গাইবান্ধার মুক্তিনগর ইউনিয়নকে ঘিরে এবং এটি আমার একটি ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। দৃষ্টান্তের মূল পাত্র-পাত্রী স্থানীয় সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত একদল নারী। তারা একসাথে বসে ঠিক করেছেন পরিবর্তন চান এবং এ লক্ষ্যে উদ্যোগ নেন। তারা আরো ঠিক করেছেন এ জন্যে তারা নিজেদের তৈরিও করতে চান। এই তাগিদের কারণেই শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়ক পরিবেশ না পেলেও তারা হাল ছাড়েন নি। নিজেরাই গড়ে তুলেছেন এক স্বশিক্ষণ প্রক্রিয়া। *পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ* থেকে তাদের এ ধারণা আসে। পরবর্তীতে তারা এই স্বশিক্ষণ প্রক্রিয়ার নামকরণ করেন *'গণগবেষণা'*। এমন গণগবেষণা বাংলাদেশে মুক্তিনগর বাদেও আরো একাধিক ইউনিয়নে চলছে। আমি মুক্তিনগরে খুঁজে দেখার করেছি, কী প্রক্রিয়ায় এ স্বশিক্ষণ অর্থাৎ গণগবেষণা চলে এবং এর ফলে কী নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে যা পরিবর্তনের নতুন পথ দেখায়।

মুক্তিনগরের সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত এই দরিদ্র নারীরা তাদের শিক্ষা শুরু করেন ২০০৫-এর শুরুতে। শুরু করেন তারা কারো ওপর কোন কিছু পাবার প্রচলিত চিন্তা বাদ দিয়েই। মানুষ সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু ধারণা নিয়েই তারা নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। স্বশিক্ষা মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ গণগবেষণা করে করেই তারা বের করেন মানুষের সামর্থ্যের বিভিন্ন দিক। দরিদ্র নারীরা সমবেত মিথস্ক্রিয়া থেকে একটি বিশেষ শক্তি উপলব্ধি করেন। এই শক্তির জোরে একজন নারী সহজেই বলতে পারেন 'আমি মুখ্য মানুষ, তাতে কি হচ্ছে। ... মানুষ হিসেবে হামার অনেক অধিকার'। এমন প্রকাশ তাদের সকলেরই। মানুষ হিসেবে তারা কে, কী তাদের সামর্থ্য, কী তাদের অধিকার? স্বশিক্ষা সাধারণত এ ধরনের প্রশ্ন সামনে রেখেই এগোতে থাকে, সেখানে তৈরি হয় একের পর এক প্রশ্ন এবং উত্তর এবং আবারো প্রশ্ন। এই প্রশ্ন ও উত্তর দু'টই থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে। একজন সহায়ক থাকেন, তার একমাত্র কাজ হলো, যাতে আরো প্রশ্ন আসে সে ব্যাপারে সহায়তা করা, তিনি কোনভাবেই উত্তরদাতা নন। স্বশিক্ষণ চলে নিজস্ব গতিতে, সমবেত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। সেখানে যতো না উত্তর, তার থেকে প্রশ্ন অনেক বেশি। মানুষের সামর্থ্য সম্পর্কে যে গবেষণা তা স্পষ্ট করার জন্যে মিথস্ক্রিয়ার খণ্ডিতাংশ তুরে ধরা হরো।

www.pathagar.com

মানুষ কে?

'মানুষ কে' এ আলোচনা শুরু হলে চিন্তার ঝড় ওঠে। মানুষ কে—এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, সামর্থ্য, সৃজনশীলতা, বিবেক, সম্মান, মর্যাদা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। আলোচনা একটু এগোলেই প্রশ্ন আসে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কী? উত্তরও আসে—মানুষ চিন্তা করতে পারে, প্রাণীরা পারে না। মানুষ সৃজন করতে পারে, অন্য প্রাণী পারে না। উল্টো প্রশ্নও আসে—তাহলে বাবুই পাখির বাসা বানানোটা কি চিন্তা করার কাজ নয়? আবার আলোচনার ঝড় ওঠে। না, বাবুই পাখির বাসা বানানোটা সৃজনশীলতা নয়, ওটা সহজাত প্রবৃত্তি। পাখির এই সৃষ্টি প্রাকৃতিক, জৈবিক প্রয়োজনে, নেহাতই বাঁচার তাগিদে। তাই সৃষ্টির ধরন ২০ বছর আগেও যা ছিল, এখনও তাই কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করে সচেতনভাবে। মানুষের সৃষ্টির রূপান্তর ঘটে। মানুষের চিন্তা করার সাথে পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে এবং এর সাথে আবার *স্বপ্ন* দেখার সম্পর্ক। এর ধারাবাহিকতায় আলোচনা চলে আসে মানুষের সামর্থ্য প্রসঙ্গে। প্রশ্ন ওঠে—মানুষ কি শেখাতে পারে? প্রথমে সবাই বলে, শেখাতে পারে। কেউ জোর দিয়ে বলে, অবশ্যই শেখাতে পারে। কোন শক্তির বলে মানুষ শেখাতে পারে? প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়—মানুষ শেখাতে পারে কারণ তার *বুদ্ধি* আছে।

তাহলে *বুদ্ধি* কী? মানুষের একটি শক্তি। একটি সামর্থ্য। এ সামর্থ্য বাড়ানো যায়। প্রশ্ন আসে—বুদ্ধিকে সামর্থ্য বলা হচ্ছে কেন? কারণ আমরা দেখি, একই পরিবেশে থেকেও কারো বুদ্ধি কম কারো বেশি। তাহলে কিভাবে বুদ্ধি বাড়ানো যায়? সামর্থ্য বাড়াতে ইচ্ছা থাকতে হয়। তবে ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। চেষ্টাও করতে হবে। *অনুশীলন* করে বুদ্ধি বাড়ানো সম্ভব। অনুশীলণ যতো বেশি হবে, ততো সামর্থ্যও বাড়বে, বুদ্ধি ততো তীক্ষ্ণ হবে। এরপর আর কোন পাল্টা ব্যাখ্যা থাকে না। ফলে সবাই একমত হতে *বাধ্য হন*—বুদ্ধি মানুষের একটি *সামর্থ্য*। এবং এই সামর্থ্য সকলের *সমান*। অনুশীলনের ফলে তার তারতম্য ঘটানো সম্ভব।

আবার প্রশ্ন আসে, বুদ্ধি যদি সামর্থ্য হয়, তবে *জ্ঞান* কী? এ ধরনের আলোচনা সাধারণত হয়ে ওঠে কৌতুহলপূর্ণ। কিন্তু দ্রুত এগোনো যায় না। আলোচনা নানা শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। কেউ বলেন, বুদ্ধিটাই জ্ঞান। কেউ বলেন, অজানাকে জানা, নতুন কিছু শেখাই জ্ঞান। কারো মতে, পরিপূর্ণভাবে কোনো কিছুকে জানাই জ্ঞান। প্রশ্ন ওঠে, সব জানাই কি তাহলে জ্ঞান? কারো মতে, সব জানাই জ্ঞান, কারো মতে নয়। তর্ক ফের জমে ওঠে। চলে অনেকক্ষণ। সমাধান হয় এভাবে—বই বা খবরের কাগজ পড়ে যা জানা যায় তা কেবলমাত্র *'তথ্য'*। এমন তথ্য নানাভাবে জানা সম্ভব। প্রশ্ন আসে, তাহলে শেখা কী? আবার আলোচনা গভীর হয়ে উঠতে থাকে। জানাটাই শেখা নয়, জানার সাথে অনুশীলন যোগ হলে তবেই তা শেখা হয়। অনুশীলন ছাড়া শেখা অসম্ভব। অর্থাৎ *শেখা=জানা+অনুশীলন*। সাঁতারের বই পড়ে সাঁতার সম্পর্কে 'জানা' যায় মাত্র। সত্যিকার অর্থে সাঁতার শিখতে হলে পুকুড়ে বই পড়ে নদিতে ঝাঁপ দিলে বিপদই আছে। অনুশীলন করে শেখাটাই কি তাহলে জ্ঞান? বুদ্ধি খাটিয়ে, গভীর অনুশীলণ করে কোন

www.pathagar.com

বিষয়ে নতুন উপলব্ধিতে বা সিদ্ধান্তে পৌছানোই জ্ঞান যা *সত্য*। যে সত্য পরীক্ষিত, যৌক্তিক। এভাবে চলতে চলতে জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয় এভাবে—*বস্তুই* জ্ঞানের উৎস।

মানুষ কি শেখাতে পারে? পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরে আবারো এ প্রশ্ন ওঠে। বুদ্ধি ও জ্ঞানের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে এবার উত্তর বেড়িয়ে আসে—না, মানুষ শেখাতে পারে না। কারণ, শিখতে হলে অনুশীলন *অনিবার্য*। যে শিখবে তার ভূমিকাই এখানে প্রধান। অন্য একজন সর্বোচ্চ সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে মাত্র। ফলে সিদ্ধান্ত বেড়িয়ে আসে মানুষ নিজে *শিখতে* পারে, শেখাতে পারে না। তবে শিখতে *সহায়তা* করতে পারে। প্রশ্ন ওঠে, মানুষ যে জ্ঞানের অহংকার করে, বলে যে—কম জ্ঞানী, বেশি জ্ঞানী, এসব তো তাহলে মিথ্যা? অবশ্যই মিথ্যা। কারণ, জ্ঞান *দান* করার বিষয় নয়। প্রতিটি মানুষই জ্ঞানী। যে যার কাজ ও অনুশীলন, তার ততো বেশি উপলব্ধি, তার ততো বেশি জ্ঞান। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তথ্যও ব্যবহার করা হয় এসব আলোচনায়। প্রাণীর তুলনায় মানুষ যে বেশি চিন্তা করতে পারে, তার প্রমাণ মানুষের মগজের পরিমাণ বেশি—১৩০০ থেকে ১৯০০ মি. মি. পর্যন্ত। অন্য প্রাণীর মগজের পরিমাণ তার শরীরের অনুপাতে বেশ কম। ফলে আবারো সিদ্ধান্ত—যতো অনুশীলন ততো জ্ঞান।

মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন—মানুষ সৃজনশীল প্রাণী। সৃজনশীল প্রাণী বলেই মানুষ অন্য প্রাণী থেকে আলাদা হতে পেরেছে। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। অনুশীলন করে এই বুদ্ধি অর্থাৎ সামর্থ্যকে আরো শাণিত করে তুলতে সক্ষম। এই সামর্থ্য সকল মানুষেরই সমান। কম বেশি হয় অনুশীলনের তারতম্যে। জ্ঞান হলো মানুষের সত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার এক গভীর *উপলব্ধি*। জ্ঞান *দান* করার বিষয় নয়। দান করা যায়ও না। আসলে *সবাই জ্ঞানী*। অনুশীলনটা এখানেও *মুখ্য*। মানুষ নিজে শেখে অনুশীলন করে। মানুষ অন্যকে শেখাতে পারে না। এটা অসম্ভব। যারা গণগবেষনা করেন মানুষ সম্পর্কে এমন উঁচু ধারণা নিয়েই 'পরিবর্তন'—এর জন্য তারা এগোতে শুরু করেন। এটাই তাদের স্বশিক্ষণ প্রক্রিয়া—নারীরা এভাবেই *শাণিত* করেন নিজেদের।

আরো কী হয় এই মিথস্ক্রিয়ায়? দরিদ্র নারীরা জানান 'আমাদের যা সমস্যা আমরা তা নিয়েই গবেষণা (আলোচনা) করি'। তবে শুধু সমস্যা নয়, সমস্যার সমাধান ও সম্ভাবনা নিয়েও তারা গবেষণা করেন। সাধারণ গবেষণার বিষয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয়ই হয়—স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ রোধ, ঝগড়ার কারণ ও মীমাংসা, শিশুর স্কুলে যাওয়া—না যাওয়া, নিরক্ষরতার খারাপ দিক, লেখাপড়া শিখলে কী লাভ হয়, মারামারি, পারস্পরিক-বন্ধন, দারিদ্র্যের কারণ, দারিদ্র্য দূর করার উপায়, অলসতার কারণ ও এর ক্ষতিকর দিক, গ্রামে চোর সৃষ্টি হবার কারণ, সঞ্চয়ের গুরুত্ব, সঞ্চয়ের বিনিয়োগ ক্ষেত্র, আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সরকারী সেবা প্রাপ্তির উপায়, মামলা-মোকদ্দমা না করা, নাগরিক অধিকার, দুর্বলকে সাহায্য করার উপায়, নিজেদের টাকা নিজেদের মধ্যে (সেক্ষ-হেল্প ক্রেডিট), চড়া সুদে এনজিওর থেকে ক্ষুদ্রঋণ না

www.pathagar.com

নেবার যুক্তি, ন্যায্য মূল্যে সার পাবার উপায়, প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার উপায়, গণগবেষণা অনুশীলন, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়াবার উপায়, নিজেদের মধ্যে সুসমন্বয় প্রক্রিয়া, ব্যাংকে হিসাব খোলার সুবিধা ও অসুবিধা, আরো শক্তি বাড়াবার উপায়, নতুন কাজ নতুন চিন্তা বাড়াবার উপায়, আরো নুতন গণসংগঠন গড়ার উপায় প্রভৃতি।

এ আলোচনায় কেউ বক্তৃতা দেন না। অবশ্য বক্তৃতা দেবার প্রয়োজনও হয় না। কমবেশি সবাই কথা বলেন এখানে। আনুষ্ঠানিক নিয়ম নেই বলে কখনও কখনও একসাথে সবাই মিলে কথা বলায় হট্টগোল লেগে যায়। তবে এতে কোন অসুবিধা হয় না। কেননা, এখানে বহিরাগত কেউ থাকেন না, থাকলেও জ্ঞান বিতরণের কোন সুযোগ পান না। এখানে নেই কারো শিক্ষার/অর্থের/চাকুরীর অহংকার দেখাবার তাগিদ। এ আলোচনায় তর্ক বাধে, ভীষণ তর্ক বাধে, দেখে মনে হবে যেন ঝগড়া, তর্কে দ্বিমত হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত যখন হয় তখন তাতে সবাই একমত হন। তাদের মন্তব্য, সব কাজ আমরা *একসাথে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত* নিয়ে করি।

মুক্তিনগরে দরিদ্র নারীরা নিজেরা আলোচনা করে তাদের সামর্থ বিকাশ করে চলেছে। এই বিকশিত শক্তি সেখানে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এর প্রকাশ আমরা দেখি 'মুক্তিনগরে আর বাল্যবিবাহ হবে না' সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের এই ঘোষণায়। এখানে দেখার বিষয়—সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র মানুষরা কিভাবে এই ঘোষণা দেবার জন্য নিজেদের সংগঠিত করতে সক্ষম হলো? সংগঠিত হয়ে *'একতা'* যে একটি শক্তি, যার একটি বহি:প্রকাশ এই ঘোষনা, কোন প্রক্রিয়ায় তা তাদের উপলব্ধিতে এলো? এইকসাথে একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীতে নারীদের এমন উদ্যোগ পুরুষরা বাধা না হয়ে কিভাবে সহযাত্রী হয়ে উঠলো তারও বিশ্লেষণ জরুরী। হয়তো অনেকের চোখে এই ঘোষণা অভিনব কোন ঘটনা নয়। কিন্তু বিশ্বায়ন ও তার দোসর এনজিওদের এই দাপটের সময়ে, যখন কি-না অধিকারের নামে শোষণের জাল আরো বহু দূর বিস্তৃত হচ্ছে, তখন প্রায়—বিচ্ছিন্ন, স্বপ্নহীন এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই গড়ে ওঠা 'একতা' এবং এর গুরুত্বের দিকটি ভেবে দেখার দাবি রাখে। মুক্তিনগরের স্বশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল্যায়ণ করার কারণ এটাই।

মুক্তিনগরের দরিদ্র নারীরা বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন এককভাবে ও দল বেঁধে। গণসচেতনতা সৃষ্টি করেই তারা এ কাজকে এগিয়ে নেন। নারী গবেষকরা বলেন 'বাল্যবিবাহের একটি অন্যতম কারণ দারিদ্র্য ও সামাজিক কুসংস্কার হওয়ায় সব সময় সচেতনতা সৃষ্টি করেও কাজ হয় না। ফলে আমাদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে আইনের আশ্রয় পর্যন্ত নিতে হয়েছে।' বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে মুক্তিনগরে কাজী, ইমাম, ঘটকের বিরুদ্ধে একাধিক *মামলা* পর্যন্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষ বাল্যবিবাহ বন্ধের পক্ষে। বহু দিনের একটি পুরোনো কুসংস্কারের আঘাত লাগায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে গত দেড় বছরে ৫০ টি বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে। 'বাল্যবিবাহ হচ্ছে, সেটা নিজের গ্রামেই হোক আর অন্য গ্রামে হোক, এ খবর শুনলে আমরা স্থির থাকতে পারিনা।'—নারীরা এভাবেই বলেন।

www.pathagar.com

'বাল্যবিবাহ মুক্ত মুক্তিনগর' ঘোষণা সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠার পথে অবশ্যই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র মানুষ মুক্তিনগরে বাল্যবিবাহের মতো একটি সনাতনী সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার। এটা সম্ভব হয়েছে তখনই যখন সেখানকার দরিদ্র মানুষ দেখতে পেয়েছে তারা 'সমবেত' এবং তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে 'একতা' নামের একটি বিশেষ শক্তি। তাদের মধ্যে এ উপলব্ধিও হয়েছে যে, এখন আমরা অনেক *সামর্থ্যবান* এবং যে কেউ চাইলেই যখন তখন আর 'আমাদের' ঘাটাতে পারবে না। এটা সত্য যে, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে এমনিতেই এক ধরনের একতা তৈরি হয়। কিন্তু স্বশিক্ষণ এই একতার সাথে যুক্ত করেছে *চেতনা ও সচেতনতা*। যার ফলে তাদের সামর্থ্য বেড়েছে বহুগুণ বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। এর প্রতিফলন দেখা যায় নানা পর্যায়ে—যৌথশক্তি, প্রচলিত কাঠামোর বিরোধিতা আর অবস্থান পরিবর্তন করার দৃঢ়তায়।

এই 'আত্মবিশ্বাস' শক্তির বলেই সেখানে যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে অনেক সংগঠন। তারা এ সকল সংগঠনের নামকরণ করেন 'গণসংগঠন' এবং বলেন এগুলো *'আমাদের সংগঠন'*। তাদের সরল মন্তব্য—আগেও সমিতি করেছি, তখন শুধু টাকাই জমিয়েছি, সেখানে সঞ্চয় ছাড়া আমাদের আর কিছুই ছিল না। এখন সবকিছু আমাদের। এখানে আমরা টাকা জমাই, টাকা কোথায় খাটাবো তা ঠিক করি, অধিকার নিয়ে ভাবি, আত্মসম্মান নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, গবেষণা করি, সমস্যার সমাধান করি। *এখানে সবই আমাদের; বুদ্ধি আমাদের, সিদ্ধান্তও আমাদের।*

এক জরিপে দেখা যায়, শুধু মুক্তিনগরেই গড়ে উঠেছে এ ধরনের ১১০ টি গণসংগঠন। যার মধ্য দিয়ে আড়াই হাজারেরও বেশি সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র মানুষ সংগঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৯৮ শতাংশই নারী। তারা যৌথভাবে সঞ্চয় করেছে সাত লক্ষাধিক টাকা। এ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে বিভিন্ন খাতে—ছোট ছোট ব্যবসায়, কৃষিতে, জমি বন্ধকে, রিক্সা-ভ্যান ক্রয়ে, পোলট্রি ফার্ম গড়ে তুলতে। এই সকল গণসংগঠন-এর মাধ্যমে কেবল আয় বাড়ছে এমনটাই নয়, পাশাপাশি গড়ে উঠছে সামাজিক পুঁজি। উল্লেখ্য, মুক্তিনগরের ১০৮টি গণসংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ দরিদ্র নারী। *পরিবর্তনের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সহায়ক পরিবেশ ও মালিকানাই এখানে মূল কথা। মানুষ যতোই দরিদ্র হোক, সম্পদ তার যতো সীমিতই হোক না কেন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ থাকলে, যতো ঝুঁকিই থাকুক, সেই দরিদ্র মানুষটি তার পূর্ণ সামর্থ্য দেখাতে এগোবেই।*

কেন সংগঠিত হলেন এবং কেন গণসংগঠন গড়ে তুলতে হচ্ছে? এর উত্তরে দরিদ্র নারী সংগঠকরা জানান, 'আগে যে সমস্যা সমাধান করতাম সাত দিনে, এখন তা করি এক দিনে', 'এখন আর আমরা শুধু গায়ের শক্তি নিয়ে চলি না, আমরা এখন একসাথে চিন্তা করি, সিদ্ধান্ত নেই, এখন আমাদের মনের *শক্তি* অনেক'। তারা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'বড় পরিবর্তনের জন্য দরকার বড় শক্তি, কারণ বড় পরিবর্তনের জন্য রয়েছে বড় বাধা, এ জন্যে আমাদের শক্তিও বাড়াতে হবে।' আমরা

www.pathagar.com

দেখি—*দরিদ্র মানুষের বঞ্চিত হবার কারণগুলি বেড়িয়ে এলে, বঞ্চনার বিদ্যমান পরিণতিগুলি তাদের উপলব্ধিতে আঘাত হানতে শুরু করে এবং এ আঘাত প্রতিবাদের ঝড় তোলে। আর এ ঝড় পর্যায়ক্রমে নিজেদের ভিতর তীব্র হতে থাকে। এখান থেকেই তৈরি হয় নিজেদের আরো সুসংহত করার তাগিদ।*

'টেকসই উন্নয়ন' এনজিওদের একটি প্রচলিত শব্দ। আমি বলবো এটি তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন। তাদের ভাবটা এমন যে, উন্নয়ন টেকসই করার ভাবনাটা কেবল তাদেরই। মুক্তিনগরের দরিদ্র নারীদের সংগঠিত ভাবনা দেখে সে ধারণা আমার পুরোপুরি পাল্টে গেছে।তাদের একটি আলোচনায় প্রশ্ন রেখেছিলাম, যে গণসংগঠনগুলো আপনারা গড়ে তুলছেন সেগুলি যাতে টেকসই হয় সেজন্যে কী পদক্ষেপ নেন? আমার ধারণা ছিল, একজন বহিরাগত হিসেবে এমন প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রশ্ন রাখামাত্র কয়েকজন নারী যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন তাতে আমি খুবই *লজ্জায়* পড়েছিলাম। তারা কোন রকম রাখঢাক না করেই বললেন, এটা তো *আপনি একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করলেন*। টেকসই-এর প্রশ্ন কেন আসছে? সবিতা আমাদের—সঞ্চয়, সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, সবকিছুই। এসব নিয়ে আমাদের *স্বার্থ-চিন্তা* আছে না! আর কোলকোন্দের গণগবেষকরা *বিস্ময়* নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, *আমাদের জিনিস আমরা ভাঙ্গবো কেন?* সমস্যা তো আছে, অনেক সমস্যা আছে। সংগঠনে ভাঙ্গনও ধরে, আলোচনা করে আমরা তা ঠিক করি। এর জন্য আমরা চিন্তা করি না।

এটি একটি লক্ষ্যণীয় অর্জন—যার মূলে রয়েছে পারস্পরিক দৃঢ় বন্ধন, দরিদ্র নারীদের ভাষায় যা *একতা*। এই একতা তাদের মধ্যে পরনির্ভরশীলমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণকে তরান্বিত করে। একতার কারণেই একসাথে চিন্তা করা, একসাথে ঝুঁকি মোকাবিলা করা এবং একসাথে *নতুন পথ অনুসন্ধান* করার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এক নিখাঁদ ঐক্য ও দৃঢ় বন্ধন। মুক্তিনগরে খামার ধনারুহা গ্রামের গবেষক মমিন তাই এ বন্ধন সম্পর্কে বলেন 'আমরা যারা গণগবেষক, যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবাই এক, আমরা সবাই বন্ধু, আমাদের এ বন্ধন *আত্মার*। *এ বন্ধন কুড়াল দিয়ে চোট মারলেও ভাঙ্গবে না*।' সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের একতার এমন উদাহরণ আমাদের জন্য *নতুন অভিজ্ঞতা* বৈ কি! এমন একতার কারণে দরিদ্র নারীরা এলাকায় একটি *বিশেষ শক্তি* হয়ে উঠেছে। তাদের এ *পজিশনকে* সরকারী-বেসরকারী সংগঠনও গুরুত্ব দিয়ে চলে। দরিদ্র নারীরা নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই সব সম্ভাবনা তাদের মধ্যে তৈরি করছে নতুন নতুন স্বপ্ন। ফলে দরিদ্র তো বটেই যতো বঞ্চিতই হোক, একতা যে একটি শক্তি, এটা উপলব্ধিতে আসামাত্রই পাল্টে যাচ্ছে তাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি। এর প্রকাশ আমরা দেখি প্রচলিত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সংগঠিত শক্তি হিসেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদের ধরনে।

মোমেনা বেগম মুক্তিনগরে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছেন কয়েকটি। এ কাজে তিনি বাধার মুখোমুখী হয়েছেন একাধিকবার। কিন্তু তিনি থামেন নি। মোমেনা বেগম জানান, 'আমার এলাকায় অনেক পুরুষ বাল্যবিবাহের পক্ষে। গতকাল একটা বাল্যবিবাহ বন্ধ

www.pathagar.com

করেছি। মেয়ের বয়স ছিল ১২ বছর এবং ছেলের বয়স ছিল ১৬ বছর। এ বিয়েতে ৫,০০০ টাকা যৌতুকও ছিল। আমি বাধা দেই। ইউপি সদস্য আমাকে বলেন, এ বিয়ে হবে। আমি তাকে বলি, আপনি কিভাবে অনুমতি দেন? আপনি তো আইনের লোক। এ বিয়ে নিয়ে আর একটা কথা বললে কাজী ও ঘটকের বিরুদ্ধে মামলা করবো। *আপনি বিরোধিতা করলে আপনার বিরুদ্ধেও মামলা করবো।* ইউপি সদস্য আমাকে ধমক দিয়ে বলেন, এই মহিলা তুমি এসব কি বলো? তুমি এত মাতবরী করো কেন? তুমি কি চাও? আমি বলি, ঘটক দু'দিক থেকে টাকা খাবে, কাজীও টাকা পাবে। *আমি গণগবেষক, আমি টাকা খেতে আসিনি। আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসেছি, সমস্যা সমাধান করতে এসেছি।* এ বিয়ে হবে না। মেয়ের বয়সের কাগজ দেখান।'

দরিদ্র এই নারীরা নিজেদের টাকা নিজেরা ব্যবহার করার স্বাদ পেয়েছেন। তাদের মতে, 'নিজেদের টাকা নিজেরা ব্যবহার করছি। অন্যের কাছে আর *হাত পাততে হচ্ছে না*। এতে আমাদের *সম্মান রক্ষা* পাচ্ছে। আর কেউ আমাদের *অপমান* করতে পারবে না।' নিজেদের সঞ্চয় ব্যবহার করে পূর্বের তুলনায় তাদের আয় বেড়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন আত্মকর্মসংস্থান। ফলে তাদের মধ্যে এনজিওর কাছে চড়া সুদে ক্ষুদ্রঋণ নেবার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তাদের অনেকেই মন্তব্য করেন, *'আমরা আর চড়া সুদে ক্ষুদ্রঋণ নেবো না'*, এমনও বলেন, *'আমরা এলাকা থেকে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসা বন্ধ করে দেবো'*।

নিরক্ষর জয়নাল আবেদীন মন্তব্য করেন, 'সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়, অনেক পরিবর্তন করা যায়।' তিনি জানান, আমি *নতুন পথ* খুঁজে পেয়েছি। এখন আমি বুঝি, আমি কি করতে পারি, কিভাবে তা করতে পারি। ... আমার বউ এবার কলেজে ভর্তি হবে। সবাই এটা নিয়ে হাসাহাসি করে। আমার কিন্তু অনেক আনন্দ। বউকে শিক্ষিত করেছি। অথচ আমি মুর্খ।'

মুক্তিনগরের পঞ্চাশোর্ধ রমিসা বেগম এই স্বশিক্ষণের মধ্য দিয়েই অনুকরণীয় হয়ে উঠেছেন। তার মতো 'ক্যারিসমেটিক' হয়ে ওঠার স্বপ্ন এখন অনেকেই দেখে। রমিসা বেগম এমনটা হয়ে উঠেছেন তার অনমনীয় কর্ম তৎপরতা থেকেই। তিনি ছুটে বেড়ান এই গ্রাম থেকে ওই গ্রামে। বাল্যবিবাহের খবর পেলেই আগে ছুটে যান তিনি, কোন নারীর বিপদ হয়েছে তো রমিসা আপা সেখানে অবশ্যই থাকবেন। তিনি এ ধরনের যে কোন কাজে রওনা হলে কিছু দূর যেতেই তা নানা বয়সী মানুষের একটা ছোটখাটো মিছিলে পরিণত হয়ে ওঠে। তার এই ক্যারিসমেটিক ভূমিকার কারণে সেখানকার অনেকের কাছে রমিসা বেগম এখন স্বপ্ন। তারা 'রসিমা বু-র মতো' হতে চায়।

মুক্তিনগরের দরিদ্র নারীদের এমন উদাহরণ আরো দেখা যায়। এখানে কিছু অভিজ্ঞতা আছে যার ইতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। গড়ে উঠেছে অনেক নতুন সম্ভাবনাও। সুবিধা ও অধিকার বঞ্চিত দরিদ্র নারীরা এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলেন কারণ তারা স্বাধীনভাবে মুক্তচিন্তার চর্চা করতে পেরেছেন বলেই। এর ফলেই সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সদস্য হয়েও এলাকার সবচেয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

www.pathagar.com

গড়ে তুলতে সক্ষম হন। উল্লেখ করার মতো আর একটি দিক হলো পুরো প্রক্রিয়াটিতে ব্যয় একটি গৌণ বিষয় হয়ে উঠেছে। মুখ্য বিষয় দরিদ্র নারীর নিজের চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও সৃষ্টির ওপর দৃঢ় মালিকানা। অনেকেই ভুল ব্যাখ্যা দেন, দরিদ্র মানুষের স্বেচ্ছাশ্রম দেবার সুযোগ কম। এ তথ্য সত্য নয়। বরং তারা যে স্বেচ্ছাশ্রম দেন তার পরিমাণ অন্য যে কোন পেশার মানুষের থেকে বেশি এবং তার সাথে যে গভীর দরদ জড়িয়ে থাকে তা অতুলনীয়। আমার নতুন অভিজ্ঞতা হলো—দরিদ্র নারীরা মুক্তভাবে চিন্তা করার মধ্য দিয়ে যে নতুন উপলব্ধি, যে একতা সৃষ্টি করেছে, তা কেবল তাদের বিদ্যমান অবস্থান পরিবর্তনের জন্যই জরুরী নয়, দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় *সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করাও একটি শক্তিশালী হাতিয়ার*। মুক্তিনগরের দরিদ্র নারীদের স্বশিক্ষণ থেকে এটাই অর্জিত শিক্ষা।

www.pathagar.com

মেয়েদের স্কুলযাত্রা ও ঝরে পড়া

সাইদুস সাকলায়েন

যে সময়ে আমরা নারীর মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ ও কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে পরিবর্তনের এক সফল চিত্র নির্মাণে ব্রতী, সেই একই সময়ে এদেশের নারীসমাজ নারী-বৈরিতার পরাকাষ্ঠারূপে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য পিতৃতান্ত্রিকতা, বৈষম্যমূলক আইন ও পক্ষপাতদুষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এক জটিল অচলায়তনে বন্দী এই বন্দিত্ব এবং অন্দরে অন্দরে পরিব্যাপ্ত প্রতিকূলতা ও অন্ধকার বিমোচনের আকাঙ্ক্ষায় পরিবর্তনের সর্বাত্মক সংগ্রামে নারীকে যে অস্ত্রে সজ্জিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন বাংলার নারীপ্রগতির পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন—তা হলো শিক্ষা। শিক্ষা বা জ্ঞানালোক থেকে নারীর বঞ্চনা এদেশে নানা উদ্যোগের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে কাটছে ঠিকই, কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক প্রতিবর্তনে পা রেখেও জেন্ডার বৈষম্য, নারীর অমর্যাদাকর অধস্তন অবস্থা এবং নারীসন্ত্রাসের ব্যাপকতা ও বিস্তার দেখে আমাদের মনে চরম-কূপমণ্ডূকতা-ধূলিশ্লিষ্ট এক সমাজচিত্রের পতিরূপই প্রকট হয়ে ওঠে। এমন অবস্থার পরিসমাপ্তি মানবতার এক অগ্রগণ্য দাবি এবং এর জন্য চাই ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশুর সর্বজনীন প্রাথমিক ও মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা।

বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা যেখানে নারী, সেখানে নারীসমাজে বৃহৎ এক অংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে যে-কোনো উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন মোটেই সম্ভবপর নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সনাতন শিক্ষা সাথে পাশ্চাত্য বিদ্যার একটা যোগসূত্র গড়ে ওঠার ঊষালগ্নেই এদেশ নারীশিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা শুরু হয়। যুগে যুগে সেই প্রচেষ্টার ঢেউ ঘরে ঘরে আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বজনবিদিত। একজন মেয়েশিশু শিক্ষিত হওয়ার অর্থ সমাজের একজন সদস্যেরই কেবল শিক্ষিত হওয়া নয়, বরং এর ভেতর দিয়ে বলা চলে সমাজের শিক্ষা-

www.pathagar.com

সাক্ষরতা উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসন প্রক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী শেকড় প্রোথিত হয়। মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করে ১৩৫২ সালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৬১ বছর পূর্বে প্রকাশিত *সওগাত* মহিলা সংখ্যা 'মায়ের শিক্ষা' প্রবন্ধে রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী লেখেন—

> কন্যারা যদি অযত্নে বর্ধিত বৃক্ষের মতো হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তাহারা সহজেই সমাজের বিষবৃক্ষ, অন্তত আগাছা হইয়া পড়িতে পারে এবং ব্যাপার যে সত্য সত্যই এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, শুধু শহরের গোটা কয়েক পরিবারের দিকে নজর না দিয়ে খোলা চোখে একবার সবদিকে তাকাইলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত মাতৃত্বের কবলে পড়িয়া শিশু ও বালকদের মন ও প্রাণের ভীষণ অপচয় ঘটিতেছে। এটা সমাজের পক্ষে একটা মহা বিপদস্বরূপ। ... কন্যাকে যদি সুশিক্ষা, স্বাস্থ্যজ্ঞান, জীবনাদর্শ প্রভৃতি ব্যাপারে সমুন্নত করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, স্ত্রীরূপে সে স্বামীর পক্ষে আশীর্বাদ হইবে। স্বামী তাহার দ্বারা চালিত হইয়া মানবতার উন্নততর নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইবে। সন্তানের কাছে হইবে সে কল্যাণকর উৎস।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরানীর লেখা থেকে চয়িত উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে ১৩৫২ সালের বঙ্গদেশে লেখকের পরিদৃষ্ট সমাজপ্রতিমার যে সমস্যাসঙ্কুল ছায়া আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়, ওই সময়কাল থেকে প্রায় পাঁচ যুগ পর আজকের বাংলাদেশের সমাজ পরিমণ্ডলেও সেই একইরূপ অশিক্ষা, অসচেতনতা ও কুসংস্কারের হতাশ্বাস অতটা গভীর নাহলেও নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা ও বাস্তবতায় এক অসম সামাজিক-অবদমনের চিত্র ভীষণ প্রকটিত। 'অসম' বলছি এই জন্য যে, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসহ অবদমনের যে একটা অবস্থা আমাদের সমাজে বিরাজিত, সেখানে এই অবদমনের মাত্রা মেয়েদের ওপর যতটা বেশি, ছেলেদের ওপর ততটা নয়। এই বিচারে অতীত ও বর্তমান যেন একসূত্রে গাঁথা। অতীতের ওই দিনগুলিতে আমাদের ভূখণ্ডে অশিক্ষা ও কুসংস্কারগ্রস্ততার যে প্রতিকূল মহীরুহ শাখা বিস্তার করে ছিল, তার ছায়াচ্ছন্ন বীজতলায় নারী-স্বাধীনতা ও নারী-মুক্তির বীজ নিষিক্ত হবার যেমন জো ছিল না, তেমনি এই সমাজের ধমনীতে এতদিনের শিক্ষা-গুরুত্বের বোধনপ্রবাহ অনেকটা প্রবল হলেও মেয়েদের শিক্ষাপরিবেশ খুব একটা প্রতিবন্ধকতামুক্ত হতে পারেনি আজো।

প্রতিবন্ধকতার ভিত্তি আমরা অবলোকন করি ঘরে ঘরে, এমনকি তার দুর্মরপ্রায় অস্তিত্ব আমরা টের পাই ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব সন্তানের জন্যই মঙ্গলআকুল যে বাবা-মা, তাদেরই অন্তরে। রূঢ় মনে হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। একটি পরিবারে বাবা-মা প্রথমেই ছেলেশিশুকে তাদের ভবিষ্যতের অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধকালের 'অন্ধের যষ্টি'রূপে পরিভাবনায় ঠাঁই দেন, আর মেয়েশিশু যেন সংসারে আসে 'সময়ের অতিথি' হয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেশিশুকে বাবা-মায়েরা 'মানুষ' করতে চান নিজেদের বৃহত্তর ও সুদূরপ্রসারী স্বার্থে, যাতে সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য 'ভবিষ্যত আশ্রয়' হয়ে উঠতে পারে সে। ব্যাপারটা আমাদের সমাজে এতটাই স্বত:সিদ্ধ যে, এ নিয়ে যেন অন্যথা ভাববারও অবকাশ নেই! এমন প্রেক্ষাপটে বংশধারার রক্ষাকবচ ভাবা হয় যাকে—সেই ছেলেশিশুই-যে বাবা-মায়ের সিংহভাগ মনোযোগ পাবে, তাতে আর আশ্চর্য

www.pathagar.com

কী! কাজেই তাকে ঘিরে সকল আয়োজন, সকল উল্লম্ফন, পরিতৃপ্তির শতভাগ স্ফুরণ! সচেতন ও সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারে অবশ্য এর ব্যত্যয় চোখে পড়বে। এটা কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষাহেতু বাবা-মায়ের মনস্তাত্ত্বিকতারই একটা ফল। আবার পরিবার যদি হয় দরিদ্র এবং শিক্ষিত, তবে ছেলে ও মেয়েসন্তানের লেখাপড়ার সমান অধিকার প্রদানে তাদেরকে আমরা আগ্রহান্বিত হতে দেখি। যা হোক, পল্লীপ্রধান আমাদের দেশের মেয়েদেরকে সবকিছুর জন্য থাকতে হয় নিজ পরিবারের মুখাপেক্ষী হয়ে। তাদের জন্য জোটেও কিছু মনোযোগ, জামা-কাপড়, এটা-সেটা কখনো-সখনো নিজের পারিপাট্যের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং হয়তবা যৎসামান্য লেখাপড়াও। একদিক থেকে বলা যেতে পারে, এসব ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের স্বার্থই নিহিত থাকে বেশি। এই যে কিছু লেখাপড়া, সৌন্দর্যচর্চার প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী—এ সবকিছু মেয়েকে মোটামুটি দেখতে-শুনতে ভালো একটা পাত্রীরূপে দাঁড় করাতে সহায়ক। উদ্দেশ্য একটাই—মেয়ে যেন কোনো ভালো ঘরে ঠাঁই পায়, তাকে নিয়ে যাতে বাবা-মায়ের আর হাপিত্যেশ করতে না হয়।

আমরা বলছি মেয়েশিশুর কথা; বাবা-মায়ের কাছে, পরিবারের কাছে তার নিজের 'সময়ের অতিথি' হিসেবে গণ্য হবার কথা। স্বামী-শাশুড়ি-শ্বশুর সম্পর্কের 'পরে'র বাড়িই যার পরবর্তী ঠিকানা, তাকে মানুষ করা তা এক প্রকার অপচয়েরই সামিল। এখানে অর্থলগ্নি করায় কোনো লাভ নেই। লেখাপড়া শিখে মেয়ে যদি হয় চাকুরে, তবে সেই চাকরি থেকে প্রাপ্ত অর্থের ষোলআনা প্রবাহ তো ওই 'পরে'র বাড়িটাকে ঘিরেই আবর্তিত হবে,তাতে বৃদ্ধ বয়সে মেয়ের বাবা-মায়ের পরিপুষ্টি হবে না। তবে মেয়েটি যেন শিক্ষা পেয়ে নিজেকে কিছুটা যোগ্যা করে তুলতে পারে—যাতে চাকুরে স্বামী কিংবা শিক্ষিত ঘরে তার আশ্রয় মেলে, সে চেষ্টাতেই মেয়েশিক্ষার প্রয়োজনটা বাবা-মা অনুভব করেন বেশি এবং তাকে বিদ্যালয়মুখী করার বাধ্যবাধকতা ওই চিন্তার পরিসর থেকেই পরিচারিত হয়।

ধরা যাক, বাবা-মা শিক্ষিত না হলেও শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন। তাই মেয়ের পড়ালেখার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার প্রতি নজর দেন। মেয়েটি প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পেরিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তার অবস্থান বরাবরই মেধা তালিকার ওপরের দিকে। তাকে নিয়ে প্রত্যাশা পরিবারের, স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী এবং হয়তবা স্কুল ব্যবস্থাপনা পরিষদেরও। শিক্ষার প্রতি তার যেমন নিজের প্রত্যয় ও একাগ্রতা আছে, তেমনি আছে অন্যদেরও সহযোগিতার প্রসারিত হস্ত। কিন্তু যে পথে মেয়েটি স্কুলে যায়, পাঠ শেষে বাড়ী ফেরে, সে পথটা কতটুকু শাপমুক্ত? স্কুলে গমনাগমনের পথে আছে অপাঙক্তেয় এবং অবাঞ্ছিত বাওরা-বখাটের দঙ্গল। প্রতিদিন তারা মেয়েদের উত্যক্ত করে, গায়ে জ্বারা-ধরা আজেবাজে কথা বলে। দেখা যায়, স্কুলগামী মেয়েদের ওপরেই বখাটেদের ব্যভিচারের যাবতীয় ভার গিয়ে পড়ে—যা চলতে থাকে অগণিত পথচারীর গোচরে—এবং প্রতিকারহীন!

কিশোরীর মনে ঘৃণা ও অব্যক্ত যন্ত্রণার ছায়াপাত ঘটে এবং দিনে দিনে তা প্রবলতর, কঠিনতর হয়। জানালার ধারে পড়ার টেবিলে বসে ঔদাস্যে তাকিয়ে থাকে

www.pathagar.com

শূন্যদৃষ্টি মেলে। পাঠে মনোনিবেশের চেষ্টা করে শুধু এবং রাত্রির অন্ধকার জীবনের পথে পথে জলৌকাময় পঙ্কের মতো বিস্তৃত হয়ে কেবলই শ্বাস রোধ করে তার। মন জুড়ে অস্বাভাবিকতার ঝড় ওঠে কখনো বা। এই বুঝি দুর্বৃত্তের অপূর্ণ-পশ্চাচারী-আকাঙ্ক্ষা হানা দেয় এসিড-সন্ত্রাসের কদর্যতা নিয়ে! অথবা কোনো একদিন স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিকেলের সান্ধরোদের আড়ালে হঠাৎ ঘনিয়ে-ওঠা কালবৈশাখীর মতো জীবন থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাকে রাস্তার মোড়ে আড্ডা-দেয়া কোনো বিকৃতমস্তিষ্কের অপহরণক্রীড়ার তোড় এই সুসভ্য সমাজে কিশোরী বা তার বাবা-মায়ের দুর্ভাবনা ও বেদনার পরিসমাপ্তির কি কোনো পথ নেই? আমরা কেবলই দেখছি, অহরহ খবরের কাগজে পড়ছি। তা হলে পরিণতিটা কী? পরিণতি হলো—ওই কিশোরী পাট চুকিয়ে অকাল 'পরিণীতা'-র ভাগ্য বরণ করা। অসহায়ত্বের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এমনতর 'সমাধান' আঁকড়ে ধরার পক্ষে অবস্থান নিই এবং এভাবে সহস্র মেয়ের শিক্ষালাভের অর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার গলা টিপে তাদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বাড়িয়ে তুলি।

কখনোবা পড়ুয়া মেয়েটির বিয়ের পয়গাম আসে স্বাভাবিক পথে। মেধাসম্পন্ন রূপবতী মেয়েটাকে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো পরিবার সেধে নিয়ে যেতে চান পুত্রবধূ করে। এক্ষেত্রে ছেলেটা হতে পারে মোটা মাইনের চাকুরে, অথবা ধনী-ঘরের উচ্ছন্নে যাওয়া কেউ—বিয়ের সুবাদে যাকে একটা 'সুন্দরী মেয়ে' উপহার দিয়ে সুপথে আনবার পারিবারিক প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। এমন ক্ষেত্রে মেয়ের অমতের কথাই আমরা শুনতে পাই বেশি। তবে বাবা-মায়েরা কিন্তু নড়েচড়ে বসেন। প্রথমত তারা ভাবেন—কবে মেয়েটা শিক্ষিত হবে, ততদিন পর্যন্ত শ্বশুর-শাশুরী বা জামাই বাবাজীদের আকৃষ্ট করার মতো মনকাড়া সৌন্দর্য কন্যার দেহে অটুট থাকবে কিনা। মেয়েটার ভালো একটা বিয়ে যখন মুখ্য বিষয়—তখন আর অপরাপর ভাবনারই বা কী দরকার। সুশ্রী বলে পাত্র-অপাত্রের কদাকার দৃষ্টিপাতে রাস্তাঘাটে কেলেঙ্কারির আশঙ্কাও তো বেড়ে গেছে অতি। সুতরাং দিয়ে দাও বিয়ে। হয়ও তাই। আত্মীয়-পরিজনেরা কিন্তু পরিতৃপ্ত; মেয়েটার 'মেয়েজীবন' নিয়ে এতদিন সবারই পেরেশানির একশেষ হয়েছে,—তাই এমন সমাধান তো লুফে নেয়ারই কথা। এ যেন—'নে বাবা, মেয়ের বিয়ে তো হয়ে গেল, তোরা এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমা।'

কিন্তু সে সমাজ আছে ঘুমিয়ে, তার তো আবার নতুন করে ঘুমাবার যৌক্তিকতা নেই। কুম্ভকর্ণ এই সমাজের ঘুমের মাঝে বিদ্যালয়ের ফটকের সামনে কিংবা রাস্তার মোড়ে মোড়ে উত্যক্তকারীদের উৎপাত কত যে পড়ুয়া মেয়ের হৃদয়ের অনিঃশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তা কি এই সমাজের যন্ত্রণা নয়? যে লজ্জার সন্নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়, তা কি প্রকারান্তরে এই সমাজেরই লজ্জা নয়? কখনো কখনো মনে হয়, আমাদের মেয়েরা তো আত্মহত্যা করে না; পুঞ্জিভূত ঘৃণার বোঝা বইতে পারে না বলে মৃত্যুযন্ত্রণা সয়েও এই পঙ্কিল সমাজ থেকে তারা কেবল মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ সমাজ কি তবে পঙ্কিলতার পোষক? এ সমাজ কি একটা বুনো মোষ, দেহে যার আলস্য-নিদ্রার পরিপুষ্ট ত্বক, নির্লিপ্ততার লোম, ল্যাম্পট্যের উকুন যেখানে

www.pathagar.com

গিজগিজ করে? মানবতার চরম অবমাননায়ও যার বোধোদয় হয় না? আমাদের এই অঙ্গন জুড়ে নারী-পুরুষের সমঅধিকার পূর্ণতা পাবেই পাবে, নারী-পুরুষের অনাবিল আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠবে আমাদের ঘর—এমন কামনা তো সকল মানুষের। এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সমাজ থেকে পাশবিকতার মূল্যোৎপাটন করতে হবে, এখানে মেয়েজীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। মেয়েশিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে—তারপরে তো 'সবার জন্য শিক্ষা'-র লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রশ্ন।

আমরা জানি, গ্রামের বা মফস্বলের মেয়েদের শিক্ষালাভের সাথে সাথে তাদের মধ্যে যে মননচেতনা গড়ে ওঠে, তার ফলে এক প্রমিত পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়া লাগে তাদের দেহ ও মনে। ইতিবাচক এই দিকটাও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবার বা প্রতিবেশীদের কারো কারো মধ্যে সন্দেহ ও ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে তোলে। কোনো কোনো সময় 'মেয়েটা প্রেমে পড়ে উচ্ছন্নে যাওয়ার পথে উঠেছে,' বলে রটনা উগড়ে দেয়া হয় লোকালয়ে। রাস্তার বাওরা-বখাটের উৎপাতযোগে মেয়েটির সেই গঞ্জনা যায় বেড়ে। মুরুব্বীজন ও স্থানীয় নেতৃবর্গের হস্তক্ষেপেও রাস্তাঘাটে উত্যক্ত হবার যন্ত্রণার কোনো উপশম না হলে তখন তার কার্যকারণ হিসেবে শেষ পর্যন্ত মেয়ের রূপ-যৌবন ও যথেচ্ছ অসাবধানী চলাফেরার ওপর গিয়েই দোষ চাপে। তখন আত্মীয়-পরিজন, এমনকি বাবা-মায়ের নিত্যকার তিরস্কার ও শাসন-অবদমনের নগ্ননখর সারাক্ষণ উদ্যত থাকতেই পারে মেয়েটার প্রতি।

এমন ঘটনা, সন্দেহ নেই, উৎসাহিত হয় রোমিওরা। বাস্তবতাজ্ঞানহীন কোনো ছেলে হয়ত প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলে স্কুলগামী কোনো মেয়েকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েটার অজান্তেই। মেধাসম্পন্ন—ভবিষ্যতে ডাক্তার, পাইলট, সামরিক অফিসার, শিক্ষক বা প্রযুক্তিবিদ হবার স্বপ্নে বিভোরা—একটি মেয়েকে ওই ছোকড়া কল্পনায় তার ভাঙা কুটিরের উঠোনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। আর বাস্তবে যথেচ্ছা প্রলাপ বকে সকালে, বিকালে, মেয়েটার গমনাগমন পথে। লজ্জায় ঘৃণায় জ্বলে ওঠে, বিষিয়ে যায় মেয়েটার অন্তর। এর প্রতিকার বিধানে মুখ খুলতেই তার স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়, লেখাপড়া লাটে ওঠে। এভাবে এই মেয়েদেরও বিয়ের পিঁড়িতে ওঠোর মধ্য দিয়ে শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমাজের এই অশনিধারার অবসান ঘটাতে হবে। আমাদের লক্ষ্য—এক সুন্দর সাক্ষর স্বদেশ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যের বাস্তবরূপ দেখতে হলে মেয়েসন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টাকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। আগেই বলেছি, একটি মেয়ের শিক্ষিত হওয়া মানে ভবিষ্যতের শিক্ষা, সাক্ষরতা ও অগ্রগতির শেকড় প্রোথিত হওয়া। দেখা গেছে, শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এমন মায়েদের সন্তান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই উচ্চ শিক্ষিত। বাবা-মায়ের শিক্ষার সঙ্গে, বিশেষ করে মায়ের শিক্ষার সঙ্গে সন্তানের শিক্ষা ও সাক্ষরতার ব্যাপক ইতিবাচক সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একটি গবেষণার ফলাফলের দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি। ওই গবেষণায় দেখা যায়, কোনোরকমে লেখাপড়া জানা মায়েদের সন্তানদের ২৯.৬ শতাংশ এবং প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া করেছেন এমন মায়েদের সন্তানদের ৭৪.৭ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জন করতে

www.pathagar.com

পেরেছে। আবার মাধ্যমিক স্তর অবধি লেখাপড়া করেছেন যে-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের ৮৭.৮ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন এমন মায়েদের সন্তানদের ৯৯.১ শতাংশই সাক্ষর। সুতরাং একজন মা, তিনি যদি হন লেখাপড়া জানা, শিক্ষার গুরুত্ব তিনি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন এবং ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সব সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি তার সতর্ক মনোযোগ নিবিষ্ট হয়।

শিক্ষা ও সাক্ষরতার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মেয়েদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য দেশে এ পর্যন্ত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে—মাধ্যমিক স্তরে গ্রামীণ দরিদ্র মেয়েদের জন্য শিক্ষার খরচ মওকুফ এবং তাদের জন্য উপবৃত্তি। এই উদ্যোগের ফলে বিগত এক দশকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। আর তা হলো 'সবার জন্য শিক্ষা'-র লক্ষ্য বাস্তবায়নের অতীত গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন। এর ফলে বিদ্যালয়গুলোতে ছেলে ও মেয়ের অনুপাত ৩:২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ সমতায় উপনীত হয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি।

বিশ্বপ্রেক্ষাপটে মেয়েদের শিক্ষার সাথে আমাদের অবস্থানটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। মেয়েদের শিক্ষা ও সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বিশ্বপরিস্থিতির তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা উন্নত বা আশাব্যঞ্জক কিছু নয়, যদিও বাংলাদেশসহ অনেক দেশই গত এক দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক সমতা অর্জন করেছে। কিন্তু বেশ কিছু এলাকায় বিশেষ করে আরব দেশসমূহ, সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশে এখনো বড় ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান। ২০০১ সালের হিসাব অনুসারে বিদ্যালয় বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের ৫৭ শতাংশই মেয়ে, এই হার আরব দেশসমূহ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশীয় দেশসমূহে ৬০ শতাংশেরও বেশি। লৈঙ্গিক অসমতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাস্তরে। তিরাশিটি উন্নয়নশীল দেশের তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, এদের অর্ধেক সংখ্যক দেশ প্রাথমিক স্তরে লিঙ্গসমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, এক-চতুর্থাংশেরও কম সংখ্যক দেশ মাধ্যমিক স্তরে এবং মাত্র চারটি দেশ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে লিঙ্গসাম্য সৃষ্টি করতে পেরেছে। ভাবতেও অবাক লাগে, বিশ্বের সমস্ত অসাক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী। আর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হলেও বাংলাদেশে সর্বমোট সরকারি চাকুরির মধ্যে নারীরা পূরণ করেছেন মাত্র ২২ শতাংশ। অথচ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষাসহ বৃহত্তর সমাজের পারিপার্শ্বিক দুরবস্থার সঙ্গে লৈঙ্গিক অসমতার বিষয়টি জড়িত, যা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক আচার-আচারণ থেকে উদ্ভূত।

শিশুদের বিশেষ করে মেয়েশিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া বা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার পেছনে দারিদ্র্য অন্যতম কারণ। গ্রামীণ এলাকার ছাত্রীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষালাভ এবং উপবৃত্তির মতো উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থা

www.pathagar.com

থাকা সত্ত্বেও ৫ম শ্রেণীতে এসে মেয়েদের একটা বড় অংশ ঝরে পড়ে। মেয়েদের ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাসহ শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যেমন খেলার মাঠ, বিদ্যালয় ভবনে কমনরুম ও পৃথক ল্যাট্রিনের অভাব ইত্যাদি কারণেও মেয়েদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

গ্রাম বা শহর নির্বিশেষে সকল মেয়ের বিদ্যালয়মুখী হতে না পারা বা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার নানাবিধ কারণ সম্পর্কে আমরা অবগত। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাসিক সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা আয়ের পরিবারের শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৮০%। ২ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়সীমার পরিবারে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৮% এবং ৭ হাজারে ঊর্ধ্বে আয়সীমার শিশুদের ঝরে পড়ার হার শূন্য। অর্থাৎ পারিবারিক আয়ের সাথে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অথচ বর্তমানে নানা কারণে শিক্ষা ক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে, যার যত বেশি টাকা, সন্তানের জন্য তিনি তত বেশি ভালো শিক্ষার যোগান দিতে পারবেন। আর শিক্ষা উপকরণের দাম বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র ছেলেমেয়েরা ঝরে পড়ছে। শিক্ষা ব্যয় বাড়ার ফলে প্রতি বছর দেড় কোটি কিশোর-কিশোরী ঝরে পড়ছে। গ্রামাঞ্চলের ৪০ লক্ষ শিশু এবং বস্তিবাসী ৩০ লক্ষ শিশু এখনো শিক্ষা-সুবিধার বাইরে আছে। এই বোধগম্যতার পরও সমস্যা থেকে উত্তরণের যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে, তা কেবলই—'এন্টিবায়োটিক' প্রয়োগে ভেতরের দগদগে ঘা শুকানোর ব্যবস্থা না করে—কোনোরকমে সমাজের উপরিত্বকের পরিচর্যা ও উপশম করারই নামান্তর। কাজেই আপাতভাবে অনেক কিছু করা হয়েছে, করা হচ্ছে, ইত্যাদি করতে পারলেও সমাজের ঘা কিন্তু শুকোচ্ছে না মোটেও। তবুও বলি—আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে যাচ্ছি এবং নতুন নতুন শৃঙ্খলে জড়িয়ে পা নানান নব্যসমস্যার বিজনন থেকে নারী-পুরুষ নামের এই সমাজের দু'হাত মুক্ত রাখার অভিপ্রায়ে বার বার দৃঢ়পদ হবার প্রত্যয় গ্রহণ করছি। এই যে প্রত্যয়, এই যে আমাদের পাহাড়প্রতিম সমূহঅন্তরায় অতিক্রমণের ইচ্ছা—তা কতটা দুর্দম্য, কতটা সাফল্যপ্রদায়ী—শিক্ষিত সাক্ষর সমাজ গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্যে আজ তা পুনর্বার—এবং বার বার—অবশ্য বিচার্য।

www.pathagar.com

শিক্ষার সম্প্রসারণে নারীর মুক্তি : কাজলী মডেলের অভিজ্ঞতা

সাইফুজ্জামান রানা

লিখতে পড়তে পারার মধ্যেই শিক্ষা শব্দটির তাৎপর্য নিহিত নয় বরং ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটায় শিক্ষা। এই শিক্ষা বা শিক্ষা ব্যাবস্থার সাথে মানুষের সম্পর্ক কখন থেকে তা নির্দিষ্ট করে না বলা গেলেও শিক্ষা এবং মানব সভ্যতা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে যে যাত্রা করেছিল আজও তা অব্যাহত আছে এবং আগামীতে তা থাকবে এ কথা বলা যায় নিশ্চয়। সূচনাতে মানুষ শিখেছে প্রকৃতির সাথে বসবাস করতে করতে। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে একেএকে জমা পড়েছে নানা অভিজ্ঞান আর মানুষ ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে বন্য থেকে সভ্য। আদিম অবস্থা থেকে মানুষকে আজকের আবস্থানে আসতে সময় লেগেছে চার হাজার বছর কিংবা তারও অধিক কাল। এই দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা পথ চলছি অবিরাম। শিক্ষার শুরু মূলত তখন থেকেই যখন থেকে মানুষ প্রয়োজন অনুভব করতে শিখল। শুরু করল দলবদ্ধভাবে বসবাস। তখনকার শিক্ষার আর আজকের শিক্ষার মধ্যে ব্যবধান অনেক কিন্তু অর্জন পদ্ধতি অভিন্ন। কেননা অভিজ্ঞতা অর্জন এবং আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যখন শিক্ষা তখন সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে আজকের সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষ যেভাবে বা যে প্রক্রিয়ায় শেখে তাতে কি ভিন্নতা আছে? কেউ কেউ হয়তো আমার সাথে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন কিন্তু এখানে পদ্ধতি বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে যে প্রক্রিয়ায় মানুষ শেখে বা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। হয়তো বিষয়ে ভিন্নতা, উপস্থাপনের ধরণ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া একই এবং অভিন্ন। যেমন একশ জন ব্যক্তির কাছে যদি আগুনের স্পর্শের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা কি রকম জানতে চাওয়া হয় তাহলে সকলেই বলবে উষ্ণ বা গরম। এখানে শিখন ফল এক এবং অভিন্ন কিন্তু এটি অর্জন করছে এক এক জন এক এক ভাবে। কেউ সরাসরি আগুনে হাত দিয়ে কেউ বা কাচের ভিতর আগুন রেখে বাইরে থেকে তাপ অনুভর করেছে। শিখন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা এ নিবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। ফিরে আসা যাক শিক্ষায় নারীর

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ বা সহায়তার প্রসঙ্গে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুতে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না বললেই চলে। গুরু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে অবস্থান করে গুরুর সকল কাজ সম্পন্ন করে বছরের পর বছর থেকে শিক্ষা নিতে হতো। তখনকার সময়ে নারীকে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে অন্দরে অবস্থান করতে হতো, এর বড় কারণ গুরু একজন পুরুষ আর শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গৃহ কেন্দ্রিক, প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক নয়। মক্তব ঘুরে শুরু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার। সেই মক্তব্যেই শিক্ষার সূচনা করেছিলেন মহীয়ষী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। তবে ব্যাপকভাবে নারী অংশগ্রহণ আরো পরের ঘটনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, সৈয়দ আমির আলী, বেগম রোকেয়া প্রমুখ বিদগ্ধজদের দিনরাত পরিশ্রমের ফলে নারী আসে শিক্ষার ভুবনে। শিক্ষার ভুবন সেই সময়ে রচিত হলেও শিক্ষায় নারীর উপস্থিতি সেভাবে লক্ষণীয় ছিলোনা, কেননা সেই সময়ে বিরাজমান সামাজিক অবস্থা নারীর এই ভিন্ন অথচ প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছে।

বিশেষ করে বেগম রোকেয়ার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল হাইস্কুল, নারী শিক্ষা মন্দির—এর পাশাপাশি নওয়াব ফয়জুন্নেসার অবদান নারীকে দিয়েছিল সাহস, করেছিল তেজোদীপ্ত। এরপরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, লীলারায় লড়াইয়ের পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গীয় বৈষম্যকে। বিশেষ করে, লীলা রায়, এই বৈষম্যকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসবই যুগ যুগ ধরে নারী শিক্ষার ইতিহাস।

সমাজ পাল্টায় সময়ের হাত ধরে, কিন্তু কতটুকু বদলায়? পুরোটাই কি পাল্টায়? এরূপ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমরা দেখতে পাই ২০০৬ সালে এসে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ বেশি, সেটি সরকারের নেয়া বিভিন্ন নীতি কিংবা বেসরকারী সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টাতেই হোকনা কেন। এমনকি কোন কোনো নারী তাঁর শিক্ষা, মেধার জোরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঈর্ষার কারণও হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে বৈষম্য ভিত্তিক নিয়ম নীতি যার পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যাস্ত আইন এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে তা স্থগিত হলেও তা বাতিল হয়নি।

শিক্ষায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার সম্প্রাসারণে নারীর ভূমিকা ইতিহাসও সুপ্রাচীন। কেউ কেউ হয়তো বলবেন অংশগ্রহণ কি যথেষ্ট নয় শিক্ষা সম্প্রসারণে। সাদা অর্থে তা হয়তো সত্য কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারণে যথেষ্ট নয়। শিক্ষার ফলে নারীর ক্ষমতা বেড়েছে বহুগুণে। নারী আজ জয় করে চলেছে সর্বত্র নদী কি সাগর, বন কি প্রান্তর, পাহাড় কি গুহা, কিন্তু যে শিক্ষা নারীকে দিল স্বাধীনতা, সাহস সেই শিক্ষা সম্প্রসারণে নারীর ভূমিকা কতটুকু সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে ফিরে যেতে চাই এই নিবন্ধের শিরোনামের কাছাকাছি।

শিশু বয়সকে সাধারণত ধরা হয় সকল কিছুকে শেখা এবং জানায় বয়স। শিশুরা থাকে লিঙ্গ, বর্ণ এবং সমাজে অপরাপর বৈষম্য নিরপেক্ষ। পরবর্তীতে সমাজের

www.pathagar.com

সামাজিক নির্মাণের সঙ্গে পরিচিত হয় শিশুরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে এবং সেইভাবে নিজেকে আত্মস্থ করে। তাই শিশুর মনস্তত্ব গঠিত হয় সেই শিশু বয়সেই। তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, দ্রারিদ্র্যের কারণে খুব অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন না দরিদ্র বাবা মা। বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ করা হলেও সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আছে সেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি সহজে আয়ত্ব করতে পারে। কেননা বাড়িতে তাদের একটি পড়াশুনার জায়গা থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা স্কুলে গিয়ে হোঁচট খায়, কেননা সেই পড়াশুনার সঙ্গে তাদের পূর্ব থেকে পরিচয় থাকেনা বলে।

শিশুদের এই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিশেষ করে দরিদ্র শিশুদের ক্ষেত্রে, খুবই প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে কাজলী শিশু বিকাশ কেন্দ্র—যেখানে একদিকে গ্রামের দরিদ্রতম শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাবে অন্যদিকে শিক্ষা সম্প্রসারণে নারীর ভূমিকা আরও স্পষ্ট এবং জোরালো হবে।

দেশের দরিদ্রতম পরিবারের শিশুদের শিক্ষা উপযোগী স্বল্প ব্যয় নির্ভর পদ্ধতির অন্বেষণ প্রক্রিয়ার ফসল আজকের কাজলী মডেল। ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)-এর অর্থ সহায়তার মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার কাজলী গ্রামে শুরু হয় গবেষণা কার্যক্রম। এক. দুই তিন করে চার বছরের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আলোকে কাজলী মডেল আজ পরিচিত নাম বাংলাদেশে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে। কাজলী মডেল নাম সম্পর্কে একটি বিষয় এখানে বলা প্রয়োজন তা হলো প্রথম গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয় মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার কাজলী গ্রামে। আর কাজলী থেকে এই মডেলের সূচনা বলে এটিকে বলা হচ্ছে কাজলী মডেল। এই মডেলটির রয়েছে দুটি বিশেষ দিক ক. লিখন-পঠনের দিক ও নান্দনিক দিক এবং খ. সামাজিক অংশগ্রহণের দিক।

ক. লিখন-পঠনের দিক : কাজলী মডেলের এই দিকটি একেবারে নতুন নয় তবে আঙ্গিকের ব্যবহার প্রণালীতে ভিন্নতা রয়েছে। লিখন-পঠনের দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এতে আইপি প্যাভলপের Try and Error Method-এর সমন্বয় রয়েছে। কেউ হয়তো একে বলবে Look and Say Method, অন্যদিকে Doing Learning Process বলা যেতে পারে। এখানেই শেষ নয় এই মডেলটির দার্শনিক ভিত্তিও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রুশো এবং মারিয়া মন্তোসরীর শিক্ষা দর্শনের সম্মিলন ঘটেছে কাজলী শিশুশিক্ষা বিকাশ মডেলে। এতসব প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সমন্বয় সত্ত্বেও কাজলী মডেলের রয়েছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন, শিক্ষা উপকরণ হিসেবে পকেট বোর্ড রয়েছে যা বই খাতার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। গতানুগতিক ধারার বিদ্যালয় থেকে ব্ল্যাকবোর্ডে রয়েছে ভিন্নতা। যেমন, সাধারণত স্কুলগুলোতে শ্রেণী কক্ষের একদিকে একটি ব্ল্যাকবোর্ড থাকে কিন্তু কাজলী কেন্দ্রের ব্ল্যাকবোর্ড থাকে

www.pathagar.com

কেন্দ্রের তিন দিকে। অর্থাৎ ২ ফুট চওড়া ৩২ ফুট লম্বা ব্ল্যাকবোর্ড যা কেন্দ্রের তিনদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেয়া থাকে। কেন্দ্রের সকল শিশু একই সাথে বোর্ডে কিছু লিখতে বা আঁকতে সুযোগ পায়। শিশুর ভাষার দক্ষতা এবং সৃজনশীল গুণাবলী বিকাশে গল্পবলা, ছড়া, কবিতা, গানের চর্চা হয়ে থাকে কাজলী কেন্দ্রগুলোতে। জীবনের নান্দনিক গুণাবলী বিকাশে কাজলী মডেলের ভূমিকা রেখে থাকে। মানবিকতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম কাজলী কেন্দ্রগুলোতে চর্চিত হয়ে থাকে। যেমন যে শিশুর মা যেদিন ক. কেন্দ্রের সকল শিশুর জন্য খাবার নিয়ে আসেন সেই দিন সেই শিশু ক্লাসে ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় থাকে। সেই দিন খাবার পরিবেশনার সময় শিশুটি দেখাশুনার দায়িত্বে থাকে। প্রথমে সকলকে দিয়ে অতঃপর নিজে খাবার খায়। এই শিশু বয়স থেকে সহনশীল হতে শেখা, ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা জীবনের নান্দনিক দিকের প্রকাশ বলেই প্রতীয়মান হয়।

খ. সামাজিক অংশগ্রহণের দিক : "বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান" এই কথাটির আজ আর কোন সত্যতা নেই বললেই চলে। প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনটির মালিক ও সরকার কোনটির বা বেসকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। এখানে সমাজের মালিকানার জায়গা নেই। এক সময় ছিল যখন সকল ভালো উদ্যোগ সমাজ থেকে নেয়া হতো। কাজলী মডেল কেন্দ্রের সাথে সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মূলত সমাজই এই কেন্দ্রগুলোর মালিক এবং রক্ষাকর্তা। প্রথমত যে ঘরে বা বাড়িতে কেন্দ্রটি বসে তার জন্য কোন ভাড়া দিতে হয় না। সমাজ/সমাজের কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে বিনা ভাড়ায় কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ঘর নিয়ে। সমাজ থেকেই নির্ধারণ করা হয় কে হবেন এই কেন্দ্রের শিক্ষিকা। শিক্ষিকা এবং সমাজ উভয়ে মিলে নির্বাচন করে থাকেন কেন্দ্রের শিশু। কাজলী মডেল কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একজন উদ্যোক্তা থাকে। তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহযোগী নিয়ে কেন্দ্রে পরিচালনা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি মূলত কেন্দ্রটি দেখাশুনা এবং পরিচালনা করে থাকেন। শিক্ষিকার সম্মানীর টাকাটাও সংগ্রহ করা হয় সমাজ থেকে। আর এটি করেন কমিটি বা উদ্যোক্তা নিজে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাজলী মডেলে শিক্ষিকারা সকলে নারী এবং যারা এই মডেলের এলাকায় উদ্যোক্তা তাদের মধ্যেও বেশ কিছু সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন, যারা সমাজকে এই ধরনের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করছেন। এর মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে নারীর এক ধরণের নেতৃত্ব তৈরি হয় যা পরবর্তীতে অন্যান্য সামাজিক কাজ এবং নেতৃত্বমূলক কাজে উৎসাহিত করে।

কাজলী মডেলের প্রাণশক্তি বলে বিবেচিত প্রতিদিন শিশুদের খাবার বা পুষ্টির ব্যবস্থা। আর এটির যোগান দিয়ে থাকেন শিশুর মায়েরা। কাজলী মডেলের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রের শিশুর সংখ্যা ২৬ জন। সেই হিসেবে মাসে চারটি শুক্রবার বাদ দিয়ে গড়ে মাসে ২৬ দিন কেন্দ্র খোলা থাকে। এই হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক মা মাসে একদিন করে কেন্দ্রের সকল শিশুর জন্য এক বেলার খাবার যোগান দেন। কেন্দ্রে শিশুদের জন্য খাবার দেয়াকে ঘিরে মায়েদের অংশগ্রহণ শুধু বাড়ছে না শিক্ষা বিষয়ে

www.pathagar.com

সচেতনতা বৃদ্ধিও পাশাপাশি শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ বাড়ছে দরিদ্রজনদের। এর বাইরে প্রত্যেকটি শিশু প্রতিদিনই এক ধরণের মাতৃস্নেহ পাচ্ছে এবং সকল মায়ের সঙ্গে প্রত্যেকে শিশুর এক ধরনের যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে।

এই খাবার পরিবেশনের কারণে প্রত্যেকটি মায়ের সঙ্গে এক ধরণের সংযোগ তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেক মা তাদের সন্তানদের নিয়ে তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, সন্তানদের কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা, স্কুল বিষয়ে আলোচনা, স্কুলের ভালো-মন্দ দিকগুলো তারা নিজেরাই বের করতে পারছে। নারীদের এই ধরণের মিলন গ্রামের একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে তারা একে অপর থেকে কোন কোন বিষয় জেনেও নিতে পারছে।

কাজলী কেন্দ্র বিস্তারে নারীর অংশগ্রহণ কতটা আশার আলো জাগাচ্ছে তা পর্যালোচনা করতে গিয়েই এই নিবন্ধের সূত্রপাত। কেউ কেউ হয়তো বলবেন শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ কি শিক্ষা সম্প্রসারণ নয়? আমি বলবো অবশ্যই সম্প্রসারণ কিন্তু অধিক সম্প্রসারণ হয় নারী যদি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পরিচালনার অংশ হিসেবে কাজ করে। গত দুই/তিন বছরে বাংলাদেশে শিশু শিক্ষার অঙ্গনে কাজলী মডেল একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই মডেলটির বিস্তার ও প্রসারের সিংহভাগ ভূমিকার দাবীদার আমাদের গ্রামীণ দরিদ্রক্লিষ্ট নারী সমাজ। কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একজন উদ্যোক্তা বা অগ্রণী থাকলেও মূল দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষিকা ও শিশুর মায়েরা। কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির বেশির ভাগ সদস্য নারী। এই কেন্দ্রগুলো পরিচালনার জন্য শিক্ষিকা ও মায়েরা প্রতি মাসে আলোচনায় বসেন। কেন্দ্র পরিচালনায় শিক্ষিকার কি কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে আগামীতে কি করলে কেন্দ্রটি ভালো চলবে প্রতি মাসের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করেন তাঁরা। গত মাসে শিশুদের খাবার দিতে কার সমস্যা হয়েছিল, কেন হয়েছিল, আগামীতে কি করলে খাবার দিতে সমস্যা হবে না ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। বিশেষ করে শিশুর খাবার দেয়ার ক্ষেত্রে নারী সমাজ যেভাবে দায়িত্ব পালন করছে তা অতুলনীয়। মাসের প্রথম তারিখ থেকে শিশুর মা আঙুল গুণে মনে রাখেন কবে তাঁর খাবার দেবার দিন। এভাবে মাসের প্রতিটি দিন একজন মায়ের মনের মধ্যে থাকে কেন্দ্রটি। শুধু তাই নয় প্রতিদিন কোন না কোন না কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন। এতে শিশুদের আনন্দ হয়। মায়েরা কেন্দ্র বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন। বাড়িতে গিয়ে অন্য মায়ের সাথে আলাপ করেন। খাবারের কৃতিত্ব পুরোটাই শিশুর মায়ের। মা প্রতিদিনের রান্নার চাল থেকে মুঠো তুলে রেখে মাস শেষে তা রান্না করেই কেন্দ্রে শিশুদের খাবার যোগান দিয়ে থাকেন। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যেখানে খাবার দেয়া হচ্ছে না সেখানে কেন্দ্র ভালো চলছে না। এই জন্যই বলা হচ্ছে খাবারটাই কাজলী কেন্দ্রের প্রাণস্বরূপ। এই প্রাণকে ধরে রাখে নারী।

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে, যে হারে কাজলী মডেল কেন্দ্রের বিস্তার ঘটছে তার ফলে আগামী দশ বছরের মধ্যে আটষট্টি হাজার গ্রামে এই ধরনের কেন্দ্র গড়ে উঠা সম্ভব। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশের মানুষের মানবিক বিকাশের আমূল

www.pathagar.com

পরিবর্তন সম্ভব হবে। এই পরিবর্তন সূচিত হবে শিশু শিক্ষার মাধ্যমে। আজকের শিশু সে আগামীর কর্ণধার। শিক্ষাজীবনের সূচনা যে সৃজনশীল গুণাবলীর বিকাশের সুযোগ তা পেলে ভবিষ্যতে নিশ্চয় সে প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে, একথা বলা যায় নিশ্চয়। আর এর পিছনে যাদের অবদান তাঁরা আর কেউ নয় আমাদের গ্রামীণ জনপদের সাহসী শ্রমজীবী নারী।

কাজলী মডেল কেন্দ্র পরিচালনার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা পড়েছে বিচিত্র সব ঘটনা। একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের। তালার স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা "পরিত্রাণ" কয়েকটি কাজলী মডেল কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। মনোহরপুরে ঋষি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস। পরিত্রাণের উদ্যোগে ঋষি পাড়াতে একটি কাজলী মডেল কেন্দ্র শুরু হলে দেখা দেয় ছাত্রছাত্রী সংকট। পার্শ্ববর্তী মুসলিম পাড়া থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। কেন্দ্র তারা যাত্রা শুরু করে কিন্তু সমস্যা দেখা দিল প্রতিদিন কেন্দ্রের খাবার বিষয়ে। প্রথমে আপত্তি উঠল মুসলিম শিশুর মায়েদের কাছ থেকে। মুসলিম শিশুরা কোন অবস্থাতেই ঋষি সম্প্রদায়ের রান্না করা খাবার খাবেনা বলে জানিয়ে দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কেন্দ্র যখন বন্ধের উপক্রম হয় তখন কেন্দ্রকে সচল রাখার জন্য দুই সম্প্রদায়ের শিশুর মায়ের সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজতে আলোচনায় বসে। অনেক বাদ-বিবাদের পর সিদ্ধান্ত হয় যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মায়েরা খাবার দিলে সকল শিশু তা খাবে, কিন্তু ঋষি সম্প্রদায়ের দেয়া খাবার মুসলিম শিশুরা খাবেনা। তাই ঋষি শিশুর মায়েরা ভাত জাতীয় খাবার না দিয়ে শুকনো খাবার বিশেষ করে মুড়ি-খই-চিড়া জাতীয় খাবার কেন্দ্র পাঠাবে। এসব খাবারে মুসলিম মায়েদের কোন আপত্তি নেই। প্রাথমিকভাবে এরকম একটি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কেন্দ্রটি আবার শুরু হয়। ঘটনাটির এখানেই শেষ নয়। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল সামাজিকভাবে অস্পৃশ্যতা থাকলেও শিশুদের মধ্যে এর বালাই নেই। শিশুরা সকল বাড়ির খাবার খায়। খাবার খেতে শিশুদের সামাজিক অস্পৃশ্যতা স্পর্শ করেনা। এ অবস্থা চলে বেশ কিছুদিন। অবস্থা দেখে শিশুর মায়েদের বোধদয় ঘটে। তারা আবার আলোচনায় বসে এবং পূর্বের সিদ্ধান্ত তুলে নেয়। সিদ্ধান্ত হয় এখন থেকে মুসলিম শিশুদের ঋষি মায়েদের খাবার খেতে আর কোন বাধা নেই। উভয় সম্প্রদায়ের দেয়া খিঁচুড়ি জাতীয় খাবার শিশুরা খাবে এবং পারস্পরিক সৌর্হাদ্যপূর্ণ পরিবেশে খেলতে খেলতে আনন্দের মধ্যে শিখবে। এই ঘটনা থেকে দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে (এক) নিরক্ষরতা সামাজিক বৈষম্যকে লালন করে (দুই) শিক্ষার আলো সমাজকে মুক্তির পথ দেখায়। যে অস্পৃশ্যতা নিরক্ষর নারী সমাজ থেকে উঠেছিল তা আবার কাজলী মডেলের সংস্পর্শে তাদের দ্বারাই দূর হয়েছে। এভাবেই কাজলী মডেল নিরক্ষর অবহেলিত গ্রামীণ নারী সমাজকে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করে শিক্ষা সম্প্রসারণে ভূমিকা রেখে চলেছে। শুধু তা নয় তারা নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষিত হয়েছে। মানবিক বোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে শিশুদের ধর্মের ভয় দেখানো উচিত নয়। যার যার ধর্ম নিয়ে

www.pathagar.com

প্রত্যেক মানুষই মানুষ। এই ধারণা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। নারীরা স্বশিক্ষায় অস্পৃশ্যতার অজ্ঞতা দূর করে দিয়ে সমাজ প্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সমাজ জীবনে শিক্ষার আলো এভাবেই মানুষকে এগিয়ে দেয়া নারীর জ্ঞান এক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রগামী ছিল।

তথ্যপঞ্জি

১. স্বপন কুমার ঢালী, রেজা ইসলাম 'শিক্ষার ভিত্তি' ঢাকা ১৯৯৯।
২. কাজলী মডেল প্রাক-প্রাথমিক পরিচালনা গাইড, রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা।
৩. শিশুর জ্ঞান বিকাশের ধারা, পিঁয়াজো তত্ত্ব-অনুদতফ মুহম্মদ নাজমুল হক, মনিরা জাহান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

অজয় রায় : প্রাবন্ধিক। বিজ্ঞান লেখক। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবদুল মালেক : প্রাবন্ধিক। সহকারী অধ্যাপক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা।

আবদুল মোমেন : লেখক। সাংবাদিক। দৈনিক 'প্রথম আলো'-র চট্টগ্রাম প্রতিনিধি।

কামরুন্নেসা বেগম : প্রাবন্ধিক। গবেষক। প্রাক্তন পরিচালক আইইআর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিমা পাল মজুমদার : প্রাবন্ধিক। গবেষক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

রীতা ভৌমিক : সাহিত্যিক, সাংবাদিক। দৈনিক সমকালে কর্মরত।

মানিক মাহমুদ : প্রাবন্ধিক। গবেষক। দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ কর্মরত।

মাসুদুল হক : কবি। প্রাবন্ধিক। সহযোগী অধ্যাপক, দিনাজপুর সরকারি কলেজ।

মোঃ আবুল বাশার : প্রাবন্ধিক। রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ঢাকা।

শফি আহমেদ : প্রাবন্ধিক। অনুবাদক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

শরিফা খাতুন : প্রাবন্ধিক। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শহিদুল ইসলাম : প্রাবন্ধিক। গবেষক। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।

সাইদুস সাকলায়েন : প্রাবন্ধিক। বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান-এ কর্মরত।

সাইফুজ্জামান রানা : প্রাবন্ধিক। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ-এ কর্মরত।

www.pathagar.com

ISBN 984410570-6

www.pathagar.com